শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিদেশী ভৌতিক কাহিনী

সম্পাদনা :

তুষারকান্তি পাণ্ডে

পরিবেশক :

গ্রন্থনা

৮বি কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ অন্বেষা
৫২/১, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৭শে মার্চ ১৯৬২

মুদ্রাকর ঃ ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী
মহামায়া প্রেস
৩০/১/৬ মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৬

॥ সূচীপত্র ॥

বিদেশী ভৌতিক গল্পের পটভূমিকায়

'Some people believe in God.
But all people believe in ghost.'

ভগবানে বিশ্বাস করেন অনেকেই। তবে ভূতকে ভয় করেন সকলেই। সৃষ্টির আদিকাল হতে ভূতের সাথে ভয়ের এক অনুসঙ্গ রচিত হয়েছে। মানব শিশুর বাল্যের বোধ, বুদ্ধি ও বিকাশের সাথে যা যুগযুগান্তর ধরে অস্থিমজ্জাগত হয়ে আছে তা ভূতের ভয়। অজানিতের আতঙ্ক।

সৃষ্টির আদিকাল হতে মানবমনে ভূত সম্বন্ধে এক বদ্ধমূল আতঙ্কঘন অনির্দেশ্য ভয় মিশ্রিত ধারনা বহমান এবং আজও বর্ত্তমান।

যুগে যুগে ভূতকে কেন্দ্র করে বহু আলোচনা হয়েছে।

এই অজানিত সম্বন্ধে আতঙ্ক অনুভূতি থেকেই ভৌতিক ভীতিরঅনুরণন।

ভূত মানে অতীত। কিন্তু এই প্রাণচঞ্চল সজীব দেহের অবসানেও যে অবিনাশী আত্মার অস্তিত্ব। তাকে কেন্দ্র করেই সকল প্রাচীন সাহিত্যেই ভূতের আবির্ভাব। আমাদের এই আর্যাবর্ত্তের সংস্কৃত ভাষার মানুষদের ন্যায় প্রাচীন মিশরীয়রাও বিশ্বাস করতেন আত্মার বিনাশ নাই। মৃত্যুর পরও আত্মার এই অবিনাশী অস্তিত্ব মানুষকে ভীত করেছে, ভাবিত করেছে। আফ্রিকা, এশিয়া সহ সকল প্রাচীন মহাদেশের লৌকিক ও অলৌকিক উপকথায় আত্মার অবিনশ্বরতার কথা বার বার ধ্বনিত হয়েছে। মৃত্যু লৌকিক জীবনে এক বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী ভয়াবহ পরিনতি আর এই বিয়োগাত্মক পরিণতিকে কেন্দ্র করেই মানব মনে ভগবান ও ভূতের স্থায়ী আসন। তাই যুগে যুগে মানুষ বিশ্বাস করেছে ভগবান আমাদের রক্ষা করেন। আর ভূত আমাদের বিনাশ ঘটায়। ক্ষতি সাধন করে। তাই সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায় আমাদের সংস্কৃত, পালী আর প্রাকৃত ভাষাতেও ভূতের গল্পের অফুরণ ভাণ্ডার।

এছাড়া Tibetology-র সাথে পালি সাহিত্যের যে অঙ্গাজিক সম্পর্ক তাতে লামা শাসিত তিব্বতের জনজীবনে ভূত প্রেত ও আত্মার সাথে মানুষের আত্মীয়তা যেন এক অবিচ্ছেন্ন সম্পর্কে যুক্ত। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের বেতাল পঞ্চবিংশতির নানা গল্পে প্রাচীন ভারতীয় জনজীবনে ভৌতিক মনস্কতার এক উজ্জল ধারা

প্রবাহমান। বেতালপঞ্চবিংশতির পটভূমিকায় সামান্য আয়োজনে অসামান্য ভীতি বিহ্বলতার সার্থক বিন্যাস আভাবিত হয়েছে।

এ সব কিছু সত্ত্বেও একথা বলতেই হয় যে সংস্কৃত সাহিত্যে যে নীতি শিক্ষার প্রবণতা (Didactic tendency) তা সার্থক ভৌতিক কাহিনী রচনায় নিঃসন্দেহে বাধা সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্তৃত ও বিরাট নীতিপরায়ণতার ঊষর মরুপ্রান্তর পার হয়ে খুব বেশী সংখ্যক ভৌতিক কাহিনী পাঠক চিত্তে রোমাঞ্চ ও বিহ্বলতা সৃষ্টি করতে পারেনি।

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে কিংবদন্তীমূলক নীতি আশ্রয়ী যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ ইত্যাদি কোন সময়ই বল্গাহীনভাবে ভীতি রস সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয় নি। এঁরা প্রধানতঃ (Convenient ghost type) কেজো ভূতের নামান্তর।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ছাড়াও বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট ও ইলিয়াড, ওডেসা প্রমুখ মহাকাব্যে দেখি আমাদের রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় নানা অলৌকিক কর্মকাণ্ডের এক ব্যাপক ও বিস্তৃত চারণ ভূমি।

আজ হতে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে রচিত ইলিয়াড, ওডেসি প্রমুখ মহাকাব্য ভূত ও অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ঘটনার বর্ণনায় আকীর্ণ।

বিশ্বের সমস্ত মহাকাব্যেই অতি মানবিক ঘটনা সংস্থাপন মহাকাব্যের মূল সুরের অনুসারী। তাই মহাকাব্যিক আবহাওয়া সৃষ্টিতে অলৌকিক ও অতি মানবিক ঘটনাবলি এক অপরিহার্য অঙ্গ।

রেঁনেসা পূর্ব ইউরোপে যে দীর্ঘ অমানিশার অন্ধকার তা নিশ্চয় ব্লাক আর্ট ও ম্যাজিকের বহু বিস্তৃত এক সকল ব্যবসার অপ্রতিহত প্রসারের যুগ। এযুগে ইউরোপের সকল দেশে খুব একটা সার্থক লিখিত সাহিত্য গড়ে উঠেনি। তবে তৎকালীন জীবনে ও প্রাত্যহিক জীবন চর্চায় কুসংস্কার আর ভূত সংস্কার মানুষের বীভৎস ও বিকৃত জীবনবোধের অভিভূত হয়ে উঠে। ইংলণ্ডে পঞ্চদশ শতকে যে নবজীবনের জলোচ্ছ্বাস তা চসারের লেখার সাহিত্যিক প্রভায় উদ্ভাসিত। মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন তামস রজনীর অবসানে চসারের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। চসারের লেখায় যে (humanism) মানবতাবোধ তা মধ্যযুগীয় অন্ধকারকে ব্যক্ত করে আলোকোজ্জ্বল প্রভাতের রশ্মি আভাকে আভাবিত করে। তাই চসারের **Chauntecleer**-এ যে স্বপ্ন ও সম্ভাবনা তা নিঃসন্দেহে কুসংস্কার ভরা মধ্যযুগীয় জনজীবনের নিখুঁত ছবির এক নিদর্শন। ভাগ্যতাড়িত, মানব মানবীর জীবনে চসারের "O destinee, that mayst not be eschewed" এক অলৌকিক আবহাওয়ার উদ্বোধক।

বিশেষ করে চসারের চটিক্রেয়ারের শুক্রবারের স্বপ্ন, হত্যা বিজড়িত, মৃত্যু-তাড়িত, ভীতি বিহ্বল ভৌতিক পরিবেশের পরিপূরক। কারণ খ্রীষ্টীয় ভাব চেতনায় "শুক্রবার" নিশ্চয় এক ক্রশবিদ্ধ মহামানবের মর্মান্তিক মৃত্যুদিবসকে স্মরণ করায়।

তাই চসারের প্রতিভাধর লেখনী সঞ্চালনে নবযুগের নতুন চেতনার দিগন্ত উন্মোচিত হলেও মধ্য যুগীয় ভৌতিক মনস্কতার প্রভাব অবিসংবাদিত ভাবে সপ্রমাণিত হয়েছে তাঁর নানা লেখায়।

তবে জার্মানী তথা ইউরোপের নানা দেশে মার্টিন লুথারের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডীয় জনজীবনেও ভূত, প্রেত, দৈত্য ও দানোর কুপ্রভাব ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। তবে যুগযুগান্তরের এই সংস্কার আর বিশ্বাস আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধেও যখন লুপ্ত হয় নি তখন পাঁচ শতাধিক বৎসর পূর্বের ধর্ম সংস্কার তাকে কতখানিই বা মুঁছে ফেলতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের আলোয় ও মার্কসীয় দর্শনের প্রভাবে পৃথিবীতে ভৌতিক ও ঐশ্বরিক বিশ্বাস এক যুগান্তকারী (sake) নাড়া খায়। Religion is the opium of human mind. মানব মনে যে ভূতের ভয় তা 'বিশ্বাস' প্রসূত নয়। অনেকেই বিশ্বাস করেন ভূত নেই। কিন্তু ভূত নেই এই বিশ্বাসকে ভীতি বিহ্বল কোন ভৌতিক পরিবেশে আঁকড়ে থাকার জন্য যে সাহস ও স্বচ্ছ চিন্তা থাকা দরকার তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।

চসারের পরবর্ত্তীকালে সেক্সপীয়রের লেখাতে আমরা যে ভৌতিক দৃশ্যপট দেখতে পাই তা তৎকালীন জনমানসের প্রতিচ্ছবি।

সেক্সপিয়রের হ্যামলেট, জুলিয়াস সিজার হতে আরম্ভ করে শেষ দিকের নাটক টেমপেস্টর নানা ঘটনায় যে অলৌকিকতা তা মতান্তরে ভৌতিকতার নামান্তর মাত্র। সেক্সপিয়রের হ্যামলেটের Ghost scene ও ম্যাকবেথের Witchদের আবির্ভাবে স্বর্ণালী (golden age) ইলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের ভৌতিক মনস্কতার নিদারুণ সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়া ডানিয়েল ডিফোর 'মিসেস ভেল' প্রভৃতি গল্প নিছক ভৌতিক গল্পেরই অনুপন্থ অনুরূপ। আর রোমান্টিক যুগের কবিকল্পনায় বিশেষ করে স্কটের লেখায় যে ভৌতিক পরিবেশ ও ঘটনার ঘনঘটা তা সে যুগের চিন্তা ও মানসকে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করে।

ওয়ালটার স্কটের লেখায় সেই ঐতিহাসিক পুরোনো রাজপ্রাসাদের দীর্ঘশ্বাস নিরন্ধ্র জমাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ভৌতিক অনুভূতির শিহরণ জাগায়।

ভিক্টোরিও ইংলণ্ডের চার্লস ডিকেন্স তাঁর ক্রিসমাস ক্যারল ও অন্যান্য লেখায়

যে অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন তা নিঃসন্দেহে ভৌতিক গল্পের লক্ষণাক্রান্ত। এছাড়া হার্ডির লেখাতেও ভৌতিক অস্তিত্ব মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারে। তবে ইংরাজী সাহিত্যে ভৌতিক কাহিনীর ইতিহাসে Walter De LaMare এর স্থান নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চে। কারণ তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'নিশিথের' ন্যায় ভূত হীন ভৌতিক গল্পের সার্থক বিন্যাসে ইংরাজী সাহিত্যকে ধন্য করেছেন।

ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম যুগের আদি কাহিনী বি-উলফ প্রভৃতি গল্পগুলিও নিরঙ্কুশভাবে অতি প্রাকৃত ও অলৌকিক আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবিত।

এধারে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডে তথা ইউরোপে যাদু ও ডাইনিতন্ত্রের ধ্যান ধারণার নানা ছলাকলার প্রকাশ দেখা যায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে লোক জীবন ও সমাজে তন্ত্র, মন্ত্র, ভূত, পেত্নী ইত্যাদির অপ্রতিরোধ্য গতি তৎকালীন সাহিত্যের উপর গভীর ছাপ রেখে গেছে। জর্মানীর ডাইনি তন্ত্র ও ভৌতিক মনস্তত্ত্বার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গেটের ফাউষ্টের Broken Heart. তাই মার্লো হতে সেক্সপিয়র আর চসার হতে চেসটারটন সকলের লেখাতেই অলৌকিক কাহিনীর বিস্তার। মার্লোর ডঃ ফাউসটাসে গেটের ফাউস্টের ন্যায় যা ক্রিয়াশীল তা কবিত্ব ও অলৌকিক পরিবেশ। গথিক উপন্যাসের ক্রমবিকাশেও অলৌকিক বিশ্বাস বেদনা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এধারে রোমান্টিক যুগের কবি কল্পনায় বিশেষকরে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী ও কীটসের লেখায় অতিপ্রাকৃত এক সুষমামণ্ডিত শিল্প সম্ভারে রূপায়িত হয়েছে। বিশেষ করে কবি কীটসের লেখায় মধ্যযুগীয় রোম্যান্টিক কাহিনীতে অলৌকিকতার প্রাদুর্ভাব। Isabella, Eve of St. Agnes, Lamia ইত্যাদি লেখায় অতিপ্রাকৃতের পদধ্বনি শোনা যায়। শেলীর লেখাতেও Witch of Atlas এর অতিপ্রাকৃত চেতনা আমাদের মুগ্ধ করে।

ইংলণ্ডীয় ইংরাজী সাহিত্যের ক্রমবিকাশে লর্ড কিপলিং সাহেবের ভৌতিক তথা অলৌকিক গল্প এক উল্লেখ্য সংযোজন। তাঁর লেখায় ব্যক্তিগত বেদনা বিধৃত যুদ্ধ কাহিনীগুলি ভৌতিক আবহাওয়া ও ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ হলেও বেদনা মণ্ডিত এক শিল্প সৌকর্যের নিদর্শন বহন করে।

কিপলিং সাহেব ভারতবর্ষ ছাড়াও আফ্রিকায় দীর্ঘকাল সময় নায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফলে যুদ্ধে নিহত নিজ পুত্র ও হাজার হাজার নিহত ইংরাজ তরুণের কবরেরপরিদর্শক হিসাবে তিনি জঙ্গলাকীর্ণ অন্ধকার মহাদেশে কয়েক বৎসর

অতিবাহিত করেন। তাই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্জাত বহু কাহিনী অলৌকিক হইয়াও মর্মস্পর্শী ও বিষাদাক্রান্ত বিয়োগবিধুর। ওধারে মার্কিন সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এড্গার এ্যালেনপোর ন্যায় এক সহায়সম্বলহীন রিক্ত বঞ্চিত প্রতিভাধর সাহিত্য সাধকের আবির্ভাব ঘটে। এড্গার অ্যালেনপোর হাতে মার্কিন ইংরাজী সাহিত্যের ছোট গল্পের পাদটিকা রচিত হয়।

প্রতীকধর্মী গল্প লেখার সাথে সাথে লেখক যে রহস্যময় অজানা অচেনা জগৎ ও জীবনের ছবি এঁকেছেন তা অলৌকিক ও এক কুহেলিঘেরা পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম। এডগার অ্যালেনপো তৎকালীন নব গঠিত মার্কিন জীবনের প্রেক্ষাপটে যে অজানিতের ভয় ও আতঙ্কের আস্তারণ বিস্তার করেছেন তা আজকের মার্কিন সাহিত্যেও ক্রিয়াশীল।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইংলণ্ডে যে ছোট গল্পের বিকাশ ও বিবর্ত্তন তা অনেক সময়ই ভৌতিক তথা অলৌকিক কাহিনীকে আশ্রয় করে অগ্রসর হয়। পূর্বেই বলেছি লর্ড কিপলিং তাঁর বহু গল্পেই অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেছেন। এরপর ইংলণ্ডীয় রহস্য গল্পে বিশেষ করে গোয়েন্দা গল্পের যাদুকর স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেক সময়ই ভৌতিক গল্পকে তাঁর অসাধারণ বর্ণন ক্ষমতাও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় বিধৃত করেছেন।

কোনান ডয়েল হতে আগাথা ক্রিষ্টি এবং অ্যালেন পো হতে ফকনার পর্যন্ত সকল সফল কথা শিল্পীই আটল্যাণ্টিকের উভয়তীরের ইংরাজী ভাষাকে ভৌতিক ও রহস্য সাহিত্যে সমৃদ্ধ করেছেন।

এধারে ভিক্টোরিও যুগের বিখ্যাত ভূতুরে গল্প সংগ্রহকারক লর্ড হ্যালিফ্যাক্স আজ হতে প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে অসংখ্য ভৌতিক কাহিনী সংগ্রহ করেন।

লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের ভৌতিক কাহিনীগুলি কতখানি সাহিত্যরস সম্পৃক্ত সে সম্বন্ধে সন্দেহের ও বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এই সব সংগৃহীত গল্পগুলি পাঠককে সম্মোহিত করার এক অনির্দেশ্য গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তাই লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ইংলণ্ডীয় ইংরাজী ভৌতিক গল্পের এক অফুরণ ভাণ্ডারী। হ্যালিফ্যাক্সের লেখা ভৌতিক গল্পগুলির প্রায় সকলগুলিই রগরগে ভৌতিক আবহাওয়া দ্বারা সম্পৃক্ত।

পরবর্ত্তীকালে ইংরাজী গল্পের বিবর্ত্তনে যে মনস্তত্ব ও মননশীলতার অবতারণা তা ওয়ালটার ডিলা মেয়ার, লর্ড কিপলিং, এইচ. জি. ওয়েলস, ও'হেনরী, ফকনার

হেনরী কেন, এইচ এইচ মুনরো, লর্ড ডানসেনি, ব্রামষ্ট্রোকার ও হিচকক্ প্রমুখের লেখায় অনিবার্যভাবে উপস্থিত। ইংলণ্ডের ওয়েস্ট মিনিস্টারের ওয়ার উইক ক্যাসেল ভৌতিক কাণ্ড কারখানার একঐতিহাসিক স্থান। ওয়েস্ট মিনিস্টারের এই ব্লাডি টাওয়ার কে কেন্দ্র করে কত না কাহিনী যুগযুগান্তর ধরে ইংলণ্ডীয় মানুষের মনে ভৌতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। কারণ সীজার টাওয়ারের অন্ধকার নিশ্ছিদ্র কুঠরীর মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর গৃহযুদ্ধের শত সহস্র বন্দীর দীর্ঘশ্বাস যেন আজও হাহাকার করে কোন বিদেহী জগতে অঙ্গুলী নির্দেশ করে।

ঝঞ্জাক্ষুব্ধ বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের ধাক্কায় মানব মন অনেকখানি সংস্কার মুক্ত। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার ও প্রচারের ফলে ভূতের ভয় ক্রমে ক্রমে অপস্রিয়মান ছায়ার মত দূরগামী।

এছাড়া জনশিক্ষার প্রসারে ও গণশিক্ষার প্রশ্রয়ে বিংশ শতাব্দীর মানব মনে এক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন লক্ষণীয়। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে সমস্ত সংস্কার ও আন্দোলনের পরেও যা আজও আমাদের বিজ্ঞান সুবাসিত যুক্তি শুদ্ধ বিশশতকের মানবমনকে আকৃষ্ট করে তা ভৌতিক গল্প। ভৌতিক বিশ্বাস হয়ত সন্দেহের দোলাচল রজ্জুতে দোদুল্যমান। কিন্তু ভৌতিক গল্প বা কাহিনী শোনার প্রবণত আজও এই গ্রহান্তরগামী মানুষের রাজ্যে প্রবলভাবেই বিদ্যমান। ফলে ইংরাজী, ফরাসী, জার্মাণ, স্কানডিনেভিয়ান তথা সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যে ভৌতিক গল্পের জমজমাট বাজার।

এছাড়া সমস্ত ভারতীয় তথা আফ্রো এশিয়ান ও লাতিন আমেরিকান ভাষাতে ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান ও স্প্যানিস ভাষার খ্যাতনামা ভৌতিক গল্পের অনুবাদ এক উল্লেখ্য সংযোজন।

হিচকক্ সিরিজের ভৌতিক গল্পের সংকলনগুলি ও হিচকক্রের ও ব্রামষ্টোকারের ড্রাকুলা সিরিজের 'হরর' চলচ্চিত্রগুলি শুধু ইউরোপ বা আমেরিকার পাঠক ও দর্শককেই আন্দোলিত করে না। এঁদের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা দেশে নানা ভাষার ভিন্ন রুচি ও সংস্কৃতির মানুষের হৃদয়ে।

আজকের দিনের পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে অবসাদ, অবক্ষয় ও হতাশা সঞ্জাত অপচয় তাতে ভৌতিক তথা রহস্য গল্প ও উপন্যাস এক যুগান্তকারী ব্যতিক্রম।

আমাদের দেশে ডাইনি, ডাকিনী ও যোগিনী ইত্যাদি উইচ কাল্টের চর্চা আজও

বিদ্যমান। আদিবাসী সমাজে এদের রোমহর্ষক ক্রিয়াকর্মের অপ্রতিরোধ্য গতি অনেক সময় দৈনিক সংবাদের শিরোনামা অধিকার করে।

ইউরোপ ও ইংলণ্ডে মানবমুখী রেঁনেশা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মোটামুটি ভাবে এক নবচেতনার আলোকে পাশ্চাত্যের আকাশকে স্বর্ণালী করে। তবে তা সত্বেও পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ব্যাপী ডাইনিতন্ত্রের প্রভাব হতে ইউরোপিয় জনসমাজ মুক্তহতে পারেনি। হাজার হাজার নারী ডাইনী অপবাদ নিয়ে মৃত্যুর কোলে চলেপড়েছে। মানুষের দ্বারা মানুষ নিগৃহীত হয়েছে—দগ্ধ হয়েছে। বহু শেতাঙ্গ কুলনারী অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। একমাত্র ১৫২৩ খৃঃ ইউরোপে এক হাজার নারী ডাইনী অপবাদে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে। কথিত আছে যে ১৫৫৫ খৃঃ ফ্রান্সে এক লোরেন উপত্যকায় প্রায় দশ হাজার নারী ডাইনি ঘোষিত হয়ে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ তাই এর প্রতিফলন দেখা গেছে কন্‌টিনেণ্টাল সাহিত্যে।

আর ফরাসী তনযা—বীর বালা জোয়ান অব আর্ক যে মৃত্যু বরণ করল তাও ত সেই Witch Cult-এর পরোক্ষ ফলশ্রুতি। খৃষ্টীয় ধর্মচেতনা তাই প্রায়শ্চিত্ত্য করল তাঁকে সেণ্ট জোয়ানে উত্তরণ ঘটিয়ে।

তাই যুগে যুগে ভূত ও ভৌতিক মনস্কতা আমাদের জীবন ও চিন্তাকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে।

আর এই ভৌতিক চেতনা মৃত্যু চেতনার সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত হয়ে আজও জীবন ও চেতনাকে ব্যপ্ত করছে।

তুষারকান্তি পাণ্ডে

সম্পাদকীয় ঃ

মার্কিন সাহিত্যের এডগার অ্যালেনপো (জন্ম ১৮০৯) থেকে আরম্ভ করে আজকের দিনের শ্রেষ্ঠ বিদেশী লেখকদের মোট ছাব্বিশটি লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে বহু প্রতীক্ষিত শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিদেশী ভৌতিক কাহিনী প্রকাশিত হল।

এডগার অ্যালেন পো ছাড়াও যে সমস্ত খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদের লেখায় এই গ্রন্থটি পুষ্ট তাঁরা হলেন ইংরাজী ছোট গল্পের অন্যতম পথিকৃত লর্ড কিপলিং, মুনরো, এইচ. জি. ওয়েলস্, গোয়েন্দা সম্রাট কোনান ডয়েল, ড্রাকুলা খ্যাত ব্রামষ্টোকার, মার্কিন নোবেল সাহিত্যিক ফকনার, রহস্য সম্রাজ্ঞী আগাথাক্রিষ্টি ও প্রখ্যাত ভৌতিকচিত্র পরিচালক হিচকক্। এ ছাড়াও ফরাসী ছোট গল্পের প্রাণ পুরুষ মোঁপাসার দুটি ভৌতিক গল্পও সংযুক্ত হয়েছে। আর ভিক্টোরিও যুগের প্রখ্যাত ভৌতিক কাহিনী সংগ্রহকারক লর্ড হালিফ্যাক্সেরও দুটি গল্প স্থান পেয়েছে। এছাড়া লর্ড ডান সেনি, লেডি সিনথিয়া অ্যাসকুইস প্রমুখ বহু সার্থক শিল্পীদের লেখাতে এই সংকলন পুষ্ট হওয়ায় আমরা গর্বিত।

এই সংকলনের গল্পগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালক্রম রক্ষা করে সন্নিবিষ্ট করেছি। গল্পের শেষে স্বল্প পরিসরে হলেও সন্নিবিষ্ট গল্পের লেখকগণ সম্বন্ধে ও তাঁদের সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা সংযুক্ত হয়েছে।

গল্পগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচুর বিচার বিবেচনা করে নির্বাচন করা হয়েছে। অধিকাংশ গল্পই লেখকের শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ক গল্পের নিদর্শন হিসাবে গৃহীত হয়েছে। গল্পগুলি প্রখ্যাত ও লেখকগণ খ্যাতনামা। তাই এই অনুবাদ কর্মে পেশাদার অনুবাদক ছাড়াও প্রখ্যাত গল্পকার ও কথা শিল্পীদের সংযুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছি। আমাদের দুর্বল অনুবাদ সাহিত্যের অঙ্গনে এইভাবে খ্যাতনামা সৃজনশীল লেখকগণ কিঞ্চিৎ আগ্রহ দেখালে আমাদের সাহিত্যের এই অবহেলিত দিকটি সমৃদ্ধ হতে পারে। অনুবাদ কর্মে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বিমল মিত্র, কবিতা সিংহ, ডঃ আশা দেবী, অদ্রীশ বর্ধন প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। এ ছাড়াও একাজে বীরু চট্টোপাধ্যায়, অনীশ দেব, পৃথ্বিরাজ সেন প্রমুখের সক্রিয়তা স্মর্তব্য। তাই দিকপাল সাহিত্যসেবী বিমল মিত্র হতে তরুণ উদীয়মান গল্পকার অনীশদেব পর্যন্ত সকলের নিকট আমার ঋন অপরিশোধ্য। এছাড়া গল্পগুলি সংগ্রহে ও রেফারেন্স বই সরবরাহে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর বহু কর্মী বন্ধুর সহযোগিতা পেয়েছি। জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীযুক্ত নচিকেতা ভরদ্বাজ আমাকে শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গল্প সিরিজের গ্রন্থগুলি সম্পাদনে দুষ্প্রাপ্য পুঁথির অন্বেষণে সহযোগিতা করেছেন।

বিনীত :—তুষারকান্তি পাণ্ডে

কালো-বেড়াল

—এডগার অ্যালান পো
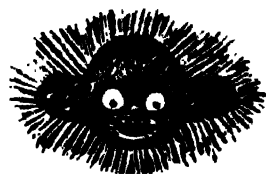
"......বুক চাপা কান্নার মত সেই হাহাকার সেই আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে দিল। বুঝি ছোট্ট একটা ছেলে দম-বন্ধ আর্তনাদে গোঙাচ্ছে।"

যে রহস্যময় কাহিনীটি আমি বলতে চলেছি, হয়তো কেউ তা বিশ্বাস করবে না। আসলে আমি নিজেই সে ঘটনাটা বিশ্বাস করি না, অন্য কেউ তা বিশ্বাস করবে, সেকথা ভাবাই অনুচিত। আমি কিন্তু মানসিক রোগী নই অথবা এ আমার স্বপ্ন নয়। জানিনা, আগামী কাল বেঁচে থাকব কি না, তাই মনের কথা প্রকাশ করে আজই সব বলে গেলাম।

আমার উদ্দেশ্য হল কতকগুলো পারিবারিক ঘটনা সহজ সরল ভাবে আপনাদের কাছে তুলে ধরা। এই ঘটনাগুলিই আমাকে শঙ্কিত শিহরিত করেছে আর শেষ পর্যন্ত অনন্ত যন্ত্রণা এনে দিয়েছে আমার মনে। জানি না সবটুকু সঠিক ভাবে বলতে পারব কি না। তবু সব বলার চেষ্টা করব। আমার কাছে ঘটনাগুলো বীভৎস-ভয়ঙ্কর, অন্যের কাছে হয়তো তা ততখানি সাংঘাতিক বলে মনে হবে না। তারা ভাববে এ শুধু অলৌকিক অস্বাভাবিক কাহিনী। হয়তো কিছুদিন বাদে বুদ্ধিমান শ্রোতার কাছে গল্পের অলৌকিকত্ব ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাঁরা এটাকে অতি সাধারণ কাহিনী হিসেবে গ্রহণ করবেন। আমি যেভাবে উত্তেজিত হয়েছি, হয়তো তাঁরা তা হবেন না। ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু ভাবতে ভাবতে

হয়তো সেইসব পাঠক পাঠিকারা সাধারণ ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা সূত্র সন্ধান করবেন।

তাদের কথা বাদ দিলাম। আমার অদ্ভুত গল্প এবার তাহলে শুরু করি……

ছোটবেলা থেকে আমি ছিলাম শান্ত, সরল, আবেগ-প্রবণ শিশু। মনে ছিল স্নেহের পরশ, তাই সঙ্গী-সাথীরা আমায় নিয়ে মেতে উঠতো অদ্ভুত রঙ্গ-রসিকতায়। পশুপাখী ভালবাসতাম আর মা বাবার প্রশ্রয়ে নানা ধরনের জন্তু জানোয়ার পুষতাম তখন। ওদের খাইয়ে আদর করে ভারী আনন্দ পেতাম আর তাতেই কেটে যেতো আমার বেশীর ভাগ সময়।

বড় হবার পরেও আমার এই সংকোচনশীল মনের কোন পরিবর্তন হয়নি। যাঁরা বিশ্বস্ত কুকুর পোষেণ তাঁরা নিশ্চয় আমার এই আনন্দের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারবেন। যে সমস্ত পাঠকের জীবনে মানুষের সাধারণ সখ্যতা অথবা ক্ষণস্থায়ী আনুগত্যের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁদের কাছে পোষা জন্তুর বুক উজাড় করা ভালবাসা আর নিঃস্বার্থ আত্মদানের মহত্ত্ব অনেকখানি।

তরুণ বয়সেই বিয়ে হয়েছিল আমার। আমার বৌ এই অদ্ভুত মানসিকতাকে সানন্দে মেনে নেয়। সে-ও বেশ কিছু পশুপাখী পুষতে শুরু করে। তখন আমাদের সংগ্রহে ছিল নানারকমের পাখি, সোনালী, রূপোলী মাছ, একটা সুন্দর কুকুর, কতকগুলো ইঁদুর, ছোট্ট একটা বাঁদর আর একটা বেড়াল।

আমাদের বেড়ালটা ছিল বেশ বড়সড়, কুচকুচে কালো আর দারুন চালাক। আমার স্ত্রীর মনের মধ্যে যদিও ছিল না কোন কুসংস্কার, তবুও সে মাঝে মাঝে বলতো, আগেকার দিনে কালো বেড়ালকে ছদ্মবেশী ডাইনী বলে ধরা হতো। তাই বলে যে সে বেড়ালটার সম্পর্কে অন্য কিছু ভাবতো তা নয়, এমন কি এই কাহিনীর অন্য কোন অর্থের জন্য আমি একথা বলছি, তাও নয়। এ ধরণের কথা যে বলা হতো, সেটাই মনে করিয়ে দিলাম আর কি।

আদর করে বেড়ালটার নাম রেখেছিলাম প্লুটো। ও ছিল আমার

সবচেয়ে প্রিয় আর খেলার সঙ্গী। আমার হাতেই ও খেতো। সর্বদা আমার পাশে পাশেই ঘুরতো। রাস্তায় বেরোলে ওকে বাড়ীর মধ্যে রেখে আসা খুবই মুশকিল হত।

ধীরে ধীরে আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। কয়েক বছর কাটল ভালভাবে। বলতে লজ্জা হচ্ছে, যে এরই মধ্যে এক রকমের বদমাইসি অসহিষ্ণুতা আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ালো। আমার স্বভাব চরিত্র বেমালুম পাল্টে গেল, হয়ে গেলাম একটা অমানুষ। আমার মেজাজ হল খিটখিটে, খেয়ালী স্বভাব আর অন্যের অনুভূতির দিকে একেবারেই অমনোযোগী। নিঃসঙ্কোচে স্ত্রীর সঙ্গেও অভদ্র ব্যবহার করতে লাগলাম। তারপর শুরু হল তার দেহের উপর অত্যাচার।

খুব সম্ভব আমার এ পরিবর্তন আমার পোষা জন্তুজানোয়ারগুলোও লক্ষ্য করতে পেরেছিল। আমি কেবল অগ্রাহ্যই করতাম না, কষ্টও দিতাম। কিন্তু এত পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও প্লুটোর সঙ্গে আমার ব্যবহার ছিল ভদ্র। শুধু বেড়ালটা ছাড়া অন্য কেউ যদি হঠাৎ অথবা স্নেহের টানে আমার সামনাসামনি এসে পড়তো তাহলে তার উপর অত্যাচার করতে বাধত না। মদ খাওয়ার ফলে যেমন দিন দিন নেশা বাড়তে থাকে, তেমনি আমার এই ব্যাধি ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। তারপর বার্ধক্যের দরুন প্লুটোও শেষ পর্যন্ত আমার বদমেজাজের পরিচয় পেতে থাকল।

একদিন রাত্রে শহরের এক আড্ডাখানা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে মদ পান করে বাড়ী ঢুকলাম। মনে হল প্লুটো আমাকে ঘেন্না করছে। ওকে খপ করে ধরে ফেললাম। ও ভয় পেয়ে গেল। আমার হাতে কামড়ে একটা ছোট্ট ঘায়ের সৃষ্টি করল। ক্ষণিকের মধ্যে আমি হিংস্র হয়ে উঠলাম, আমার মধ্যের শয়তানী ক্রোধ জেগে উঠল। আমি সব কিছু ভুলে গেলাম। আমার আদিম মানবিক সত্তাটি রক্তমাংসের দেহটাকে পরিত্যাগ করে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। মদের নেশার ঝোঁকে আমার শয়তানীবৃত্তি দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় পাশবিক প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে তুলল। পকেট থেকে ছুরি বের করে চকচকে ধারালো ফলাটা খুলে ফেললাম। তারপর বেচারা বেড়ালটাকে চেপে ধরে ছুরির ডগা দিয়ে ওর একটা চোখ

উপরে তুলে নিলাম। এই নিষ্ঠুর পাশবিক কাজের বর্ণনা দিয়ে এই মুহূর্তে আমি অনুশোচনায় জ্বলে মরছি আর লজ্জিতও কম নয়।

নিদ্রার মধ্যে পাশবিক বৃত্তির উত্তেজনা কিছুটা কমে গেল। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো। মনে পড়ে গেল গতরাত্রের অপরাধের কথা। ফলে ভয় আর দুঃখ জড়ানো এক ধরণের দুর্বলতার সৃষ্টি হল। কিন্তু এটা বিবেকের ওপর প্রভাব বিস্তার করল না। ফলে আবার ঐ একই স্বভাব আমায় ঘিরে ধরল আর মনের মধ্যে অতীত স্মৃতির সবটুকু নিমজ্জিত করলাম।

এর মধ্যে বেড়ালটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল। ওর ঐ শূন্য চক্ষুকোটরটা দেখে আমার ভীষণ খারাপ লাগল। আগের মত সারা বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, আমাকে সর্বদা এড়িয়ে যাচ্ছে। যে পোষা বেড়াল আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত, তার কাছ থেকে এমন ব্যবহার আমার মনকে তিক্ত করে করে তুলল, ভীষণ বিরক্তিকর। ক্রমে একসময় এই এ অনুভূতি আমাকে চূড়ান্ত আর অনিবার্য ভাবেই উচ্ছৃঙ্খল করে তুলল। এই মনোবৃত্তির কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা নেই। ততদিনে আমার বিবেকের অপমৃত্যু সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা জানিনা, কিন্তু একথা জানতাম যে এই আদিম প্রবৃত্তি মানুষের চরিত্রকে একটা বিশেষ রূপ আর গতি দেয়। যাকে আমরা আইন বলি তার প্রয়োজনীয়তা আর পবিত্রতা সম্পর্কে আমাদের বিচার-বুদ্ধি জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও আইন অমান্য করার একটা চিরন্তন কামনা কি আমাদের মধ্যে নেই? আমার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে দেবার জন্যেই বোধ হয় আমার চরিত্রের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা তার চরম রূপ নিয়ে প্রকাশিত হল। খুব সম্ভব, যন্ত্রণা আর পীড়ন সহ্য করার জন্যে বিবেকের অপরিমেয় আগ্রহ, আপন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করার বাসনা, অন্যায়ের জন্যেই অন্যায় কাজ করার প্রবৃত্তি।

আমি তাদেরই বিরুদ্ধে একটার পর একটা অন্যায় করে চললাম, যারা আমার কোন ক্ষতি করেননি। ফলে সর্বদা একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা আমাকে দংশন করতে লাগল। একদিন সকালবেলা খুব ধীরে সুস্থে বেড়ালটার গলায় ফাঁস পড়িয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিলাম। একাজ করার সময় আমার

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল আর বুকটা বেদনায় মোচর দিয়ে উঠছিল। জানতাম, ও আমাকে ভীষণ ভালবাসতো, কখনও আমার ক্ষতি করেনি। তবু ওকে আমি মৃত্যু দিলাম। এ যে সাংঘাতিক পাপ, জানি। চিরকালের জন্য এই পাপ আমার আত্মাকে দায়ী করে রাখবে। বুঝতে পারছিলাম, পরম করুণাময় আর চরম শাস্তিদাতা ঈশ্বরের কিছু করার নেই।

ঐ দিন রাত্রেই আগুনের তাপে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম মশারীটা দাউ দাউ করে জ্বলছে, সারা বাড়ি আগুনের লেলিহান শিখায় আক্রান্ত। আমার স্ত্রী আর বাড়ীর চাকর আমরা খুব কষ্টে, কোন রকমে জ্বলন্ত বাড়ীর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সমস্ত বাড়ীটাই জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। আমার যা কিছু সম্পত্তি ছিল সব পুড়ে গেল। আমি মুষড়ে পড়লাম হতাশায়।

সব কিছুর মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করা বা আমার কোন অন্যায় কাজের মধ্যেই এত বড় ক্ষতি হল, তা ভাববার মত দুর্বলতা আমার ছিল না। তবু আমি সব ঘটনাগুলোই বলছি, কারণ কোনটার সঙ্গে কোন ঘটনার যোগাযোগ থাকলে, তা খুঁজে পেতে কিছুমাত্র অসুবিধা হোক আমি তা চাই না। আগুন লাগার পরদিন আমি গেলাম বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে। সবকটা দেওয়াল ভেঙে পড়েছিল, কেবল একটা চওড়া দেওয়াল ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। ওটা ঘরের মধ্যেকার দেওয়াল আর আমার বিছানার মাথার দিকটার। কিছুদিন আগে ওটা প্লাস্টার করিয়েছিলাম। তাই মনে করলাম, ঐ জন্যই এটা ধসে পড়ে নি। অনেক লোক জড় হয়েছিল ঐ দেওয়ালটার কাছে। তারা কি যেন দেওয়ালে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। ওদের কথাবার্তাও আমি শুনতে পেলাম। কেবল 'অদ্ভুত'; 'অস্বাভাবিক' এই ধরণের কথা শুনতে পেলাম। ওরা কি দেখছিল, জানার ভীষণ আগ্রহ হল। এগিয়ে গেলাম, দেখলাম দেওয়ালের একটা নিখুঁত ভাস্কর্যের নিদর্শন। মূর্তিটা বড়সড় একটা বিড়ালের। সাদা দেওয়ালের গায়ে ওটা দেখতে বাস্তবিকই সুন্দর দেখাচ্ছিল। একটা দড়ি বেড়ালের গলায় জড়ানো।

এটাকে ভৌতিক মূর্তি হিসেবেই ধরলাম। কিন্তু ওটা দেখার পর থেকে আমি ভীষণ ভীত আর বিস্মিত হয়ে পড়লাম। আমি ভাবতে লাগলাম,

বাড়ীর বাইরে বাগানে বেড়ালটাকে ফাঁসী দিয়েছিলাম। আগুন লেগেছে টের পেয়ে বাগানে অনেক লোক হাজির হয়েছিল, হয়তো ওদেরই মধ্যে কেউ একজন আমার ঘুম ভাঙানোর জন্য দড়িটা কেটে বেড়ালটাকে জানালা গলিয়ে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলেছিল। ঐ সময় আগুনে পুড়ে অন্য একটা দেয়াল পড়ে যায় আর সেই চাপে আমার নিজের হাতে বলি দেওয়া বেড়ালটার শরীর এই দেওয়ালে ভাস্কর্যের নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর শরীরের রক্ত মাংসে আগুনের তাপে পুড়ে গিয়ে প্লাস্টারের মত একটা নিখুঁত মূর্তি গড়ে ওঠে।

আমার যুক্তি এই কারণ মেনে নিলেও চিন্তার জগতে এই অস্বাভাবিক ঘটনা একটা বিরাট প্রভাব বিস্তার করল। বেড়ালের মূর্তিটা আমার মনকে বেশ কয়েক মাস ধরে অধিকার করে রইল। এই সময়ের মধ্যে আমার মনে একটি বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি হল, মোটামুটি ভালই। অবশ্য আমার একটু খারাপ লাগছিল, কারণ আজকাল যেসব নোংরা জায়গাগুলোতে আমার যাওয়া-আসা শুরু হয়েছিল সেখানে আগেরটার মত একটা পোষা বেড়ালের খোঁজ করছিলাম।

একদিন একটা বাজে জঘন্য আড্ডায় বসে আছি, এমন সময় একটা কালো বস্তু লক্ষ্য করলাম। ঘরের মধ্যে কেবল একটা জিন বা রামের পিপে ছিল, তার ওপর কালো বস্তুটা। কিন্তু কয়েক মিনিট আগেও পিপেটার ওপর ঐ রকম কালো বস্তু দেখতে পাইনি। খুব মজা বোধ করলাম, পিপেটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ওটার ওপর হাত দিলাম। সত্যিই প্লুটোর মত বড় কালো রঙের বেড়াল। কিন্তু প্লুটোর সঙ্গে এটার এক জায়গায় ব্যতিক্রম। প্লুটোর কোথায় একটাও সাদা লোম ছিল না। কিন্তু এর সারা বুকটাই সাদা লোমে ঢাকা।

ওকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল আর গরগর করতে করতে আমার হাতে গা ঘষলো। মনে হল ওর ওপর যে আমার নজর পড়েছে, তাতেই সন্তুষ্ট। আমি ঠিক এইরকমই একটা বেড়াল চাইছিলাম। তাই ঘরের মালিককে প্রস্তাব দিলাম, বেড়ালটা আমাকে বিক্রি করে দিক।

উনি বললেন, বেড়ালটা ওর নয়। কোথা থেকে যে এসেছে জানে না। আগে কখনো দেখেন নি।

বেড়ালটাকে কিছুক্ষণ আদর করে বাড়ী ফেরার জন্য উঠলাম, দেখি বেড়ালটাও আমার সঙ্গী হয়েছে। আমার পাশে পাশে চলতে লাগল, মাঝে মাঝে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছিলাম। ক্রমে আমার পরিবারের একজন হয়ে উঠল আর স্ত্রীও ওকে যত্ন করতে শুরু করল।

ধীরে ধীরে বেড়ালটার প্রতি আমার স্নেহ কমতে লাগল। যা আশা করেছিলাম ঠিক তার বিপরীত মনোবৃত্তি গড়ে উঠল। তবে কেন বা কখন এরকম হয়ে উঠতে আরম্ভ করল, বলতে পারব না। তবে লক্ষ্য করলাম বেড়ালটা আমার কাছে যতই ঘেঁষত, আমি ততই বিরক্ত হতাম। ক্রমে ক্রমে এই বিরক্তি ঘৃণায় রূপ নিল। কিছুদিন আগের ঘটনা আমার স্মরণে ছিল তাই একটা লজ্জাবোধ অবশ্যই ছিল আমার। তাই বেড়ালটার দেহের উপর অত্যাচার না করে কেবল এড়িয়ে চলতে লাগলাম। ওকে আঘাত করা বা অন্য কোন ভাবে পীড়ন করার প্রবল ইচ্ছাকে আমি প্রাণপণে দমিয়ে রাখলাম। কেটে গেল কয়েক সপ্তাহ। কিন্তু একটু একটু করে ওর উপর অনুচ্চারিত ঘৃণার পরিমাণ ভীষণ বেড়ে গেল। ওকে দেখলেই আমার গা জ্বলে যেতো। আমি ঠিক সংক্রামক রোগের মত ওর কাছ থেকে দূরে দূরে সরে থাকতাম।

তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, একটা বিশেষ ঘটনা আবিষ্কার করে ওকে আমি ঘেন্না করতাম। ওকে নিয়ে আসার পরদিন দেখলাম, প্লুটোর মত ওরও একটা চোখ নেই। খুব সম্ভব ওর চোখ না থাকার দরুণ আমার স্ত্রীর কাছে ও খুব প্রিয় হয়ে উঠল। আমি প্রথমেই বলেছি, কোমল মানবিক বৃত্তিগুলি আমার স্ত্রীর মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে ছিল। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই, এগুলি এককালে আমার মধ্যেও কম ছিল না। বরং এই গুণগুলির জন্যেই আমি বিশেষভাবে চিহ্নিত হতাম আর এগুলিই ছিল অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু গভীর আনন্দোপলব্ধির সহায়ক।

আমি ওকে যতই ঘৃণা করতে লাগলাম, আমার ওপর ওর আকর্ষণ ততই বেড়ে গেল। ও আমার পেছন পেছন নাছোড়বান্দার মত ঘুরতো। ওর এই

পশু-পাণ্ডিত্ব আমি পাঠক-পাঠিকাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমি হয়তো একটা চেয়ারে বসেছি, ও সেই চেয়ারটার তলায় গিয়ে ঢুকবে, লাফ দিয়ে কোলে উঠে আমাকে আদর করবে। হয়তো আমি উঠে দাঁড়ালাম, ও আমার দু পায়ের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরবে নাতো নখ দিয়ে জামাকাপড় আঁকড়ে আমার বুকের ওপর ঝুলে থাকার চেষ্টা করবে। কখনও কখনও মনে হয় একটা ঘুষি মেরে ওকে গুঁড়িয়ে দিই কিন্তু অনেক কষ্টে সে ইচ্ছা দমন করেছি। আগের অপরাধ সংক্রান্ত স্মৃতি রোমান্থন করে কিছুটা সংযম আমার মধ্যে এসেছে। কিন্তু নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি, কেন জানিনা জন্তুটার সম্পর্কে একটা ভীতিও আমাকে পেয়ে বসেছিল।

এই ভয় আমার কোন দৈহিক ক্ষতির আশঙ্কায় নয় কিন্তু সঠিক স্বরূপটি কী তা বুঝিয়েও বলতে পারব না। সত্যি বলতে কি, এই অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও স্বীকার করতে আমার লজ্জা হচ্ছে যে বেড়ালটা আমার মধ্যে যে বিরাট পরিমাণ ভীতির সঞ্চার করেছিল তার কারণ এমন একটা ভিত্তিহীন কাল্পনিক ঘটনা যা অন্যের পক্ষে অনুমান করাই অসম্ভব। আগের বেড়ালটার সঙ্গে এর যে সাদা লোমের পার্থক্য এটা আমার স্ত্রী বারবার বলেছে। এটুকু দৈহিক পার্থক্য এ বেড়ালটার ছিল প্রথম থেকেই কিন্তু বোধ হয় সেটা সাম্প্রতিক কালের মত এত প্রকট হয়ে ওঠেনি। ক্রমে ক্রমে ওটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল আর ওটাকে নিয়েই আমার গড়ে ওঠা কাল্পনিক ভীতিটাকে যুক্তি দিয়ে কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না। চিহ্নটা যেন একটা বিশেষ বস্তুর দ্ব্যর্থহীন প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো। এ কথা ভাবলেই আমার মন ঘৃণা আর শঙ্কায় ভরে উঠছিল আর প্রাণপণ শক্তিতে এদেরকে তাড়াতে চাইছিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্য মন্দ, সেই চিহ্ন তার ইঙ্গিত আমার মনে বিশেষ ভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল, কারণ ইঙ্গিতটা ছিল ফাঁসির দড়ির। অপরাধ আর ভীতির ওপর তার প্রভাব যে কী ভয়ঙ্কর। চরম মানসিক যন্ত্রণা আর মৃত্যুর সঙ্গে তা সম্পূর্ণ সমার্থক।

আজ আমি মানুষের পক্ষে দুর্ভাগ্যের অধিকারী, যা কল্পনার অতীত। আর দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী হল একটা নিষ্ঠুর পশু, যার মত অন্য আর

একটাকে আমি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছি। হায়, ঈশ্বর সৃষ্ট এই যন্ত্রণা মানুষের জীবনে যে কতখানি অসহ্য তা তিনি-ই জানেন। আমি কখনই নিরিবিলিতে থাকতে পারলাম না। দিনের বেলায় সে আমাকে একমুহূর্তও একা থাকতে দিল না। আর রাত্রে দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে বারবার ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। সেই সময় অনুভব করলাম, ঐ ভারী প্রাণীটা আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে আর আর আমার মুখের উপর এসে পড়ছে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস। কিছুতেই এই সাংঘাতিক স্বপ্নের হাত থেকে রেহাই পেলাম না। এ যেন আমার আত্মাকে ভারী পাথরের মত নিঃসঙ্কোচে পিষতে লাগল।

এই অসহ্য মানসিক যন্ত্রণার নিষ্পেষণে আমার মধ্যেকার সদগুণের ক্ষীণতম লক্ষণগুলোও মরে গেল মনে এসে বাসা বাঁধল সবচেয়ে ঘৃণা আর নিষ্ঠুর চিন্তাগুলি। সমগ্র মানব জাতির উপরে আমার বিতৃষ্ণা জন্মাল আর আমার চরিত্রের খেয়ালপনা ভীষণভাবে বেড়ে গেল। এই পরিবর্তনের ফলে দিন দিন ক্রোধ বাড়তে লাগল, কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারলাম না। এই ক্রোধে আক্রান্ত হল আমার সংযতবাক সহিষ্ণু সহধর্মিণী।

একদিন ঘরেরই কোন কাজে আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে পুরোনো বাড়ীর মাটির তলাকার ঘরে গিয়েছিল। পয়সা কড়ি অভাবের জন্য কিছুদিন এই ঘরটা ব্যবহার করছিলাম। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে আমি নামছিলাম তখন বেড়ালটা আমার পায়ে পায়ে জড়িয়ে এমন ভাবে চলছিল যে আমি প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলাম। ফলে আমি আচমকা চটে গেলাম। এতদিন অত্যাচারের হাত থেকে যে ভীতি বাঁচিয়ে রেখেছিল, সেটা ভুলে গিয়ে একটা কুড়ুল তুলে আমি ওকে আঘাত করতে গেলাম। আমার স্ত্রী হঠাৎ আমাকে বাধা দিল। তখন আমার চণ্ডাল মূর্তি. রাগে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। পৈশাচিক তামাসিকতায় আমি বেড়ালটার দিক থেকে হাত ফিরিয়ে কুড়ুলটা দিয়ে আমার স্ত্রীর মাথায় ভীষণ ভাবে আঘাত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃতদেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। একটা কথাও শোনা গেল না।

স্ত্রীকে হত্যা করবার পর তার মৃতদেহটা গুম করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। প্রতিবেশীদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে ঘরের বাইরে লাসটা নিয়ে যাওয়া

অসম্ভব। তাই নানারকম চিন্তা করতে লাগলাম। একবার ভাবলাম কড়ুল দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে পুড়িয়ে ফেলব। আবার ভাবলাম কুঠরীর মেঝে খুঁড়ে তার তলায় মৃতদেহটা গুম করে দেবো। উঠোনের কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেও হয়। আবার ভাবলাম, জিনিষ পত্র প্যাকিং করার মত প্যাকিং করে কুলি দিয়ে বাইরে পাচার করে দিই। কিন্তু কোনটাই পছন্দ হল না। শেষ পর্যন্ত মধ্যযুগীয় মঠাধ্যক্ষরা যে ভাবে তাদের শত্রুদের মৃতদেহকে দেয়ালের মধ্যে নতুন করে ইট গেঁথে লুকিয়ে ফেলত সেই পথ অবলম্বন করা শ্রেয় মনে করলাম।

এ ধরণের কাজের পথে ভূগর্ভস্থ কুঠরী একেবারে উপযুক্ত। এর দেয়ালগুলোর গাঁথনি ছিল একটু আল্‌গা ধরণের আর এর উপর খুব বেশীদিন হয় না মোটামত প্লাস্টার লাগানো হয়েছিল। দেয়ালটা ছিল ড্যাম্পধরা, তাই প্লাস্টারটা তখনও শুকোয় নি। একদিকের দেয়ালে একটা চিমনির মত করা ছিল। ওখানে ইট গেঁথে সমান করে অন্য অন্য দেওয়ালগুলোর মতই করে তোলা হয়েছিল। ঐখানকার ইটগুলো খুলে ওরই মধ্যে মৃতদেহটা রেখে নতুন করে আবার ইটগুলো গেঁথে দিলে যে কারোর সন্দেহ করার ক্ষমতা থাকবে না, তা আমি বুঝতে পারলাম।

অতি সহজেই শাবল দিয়ে দেয়ালের ইটগুলোকে খুলে ফেললাম। তারপর মৃতদেহটাকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে কষ্ট করে দাঁড় করালাম। তারপর ইটগুলো আবার আগের মত গেঁথে ফেললাম। বালি মশলা দিয়ে দেয়ালটা এমনভাবে প্লাস্টার করে দিলাম, বোঝাই যাবে না এটা ভেঙে করা হয়েছে। কাজটায় সফল হওয়ায় আমি খুব খুশী হলাম। নতুন করে গাঁথার কোন চিহ্নই রইল না। মেঝে থেকে ধুলো বালি সরিয়ে পরিষ্কার করে ফেললাম। তারপর কুঠরীর চারদিকে বেশ ভালভাবে নজর দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললাম—'অন্তত এ ক্ষেত্রে আমার পরিশ্রম কাজে লেগেছে।'

যে জানোয়ারটার জন্য এতবড় ঝামেলার মুখোমুখি পড়তে হল, এবার সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে। আগেই স্থির করেছিলাম, ওটাকে আজ মেরেই ফেলব। সঙ্গে সঙ্গে ওটা আমার চোখের সামনে এসে পড়লে ওর মৃত্যু অবধারিত ছিল, কিন্তু আমার ক্রোধের পরিচয় পেয়ে ও কাছে

ঘেঁষতো না। বুঝলাম জন্তুটা রীতিমতো ভয় পেয়েছে। ঐ ঘৃণ্য বেড়ালটাকে ঐ সময় সামনে না পেয়ে খুব আনন্দ হল। মনে হল, একটা ভারী বোঝা আমার বুক থেকে নেমে গেল। রাত্রেও ওটাকে দেখতে পেলাম না। এ বাড়ীতে আসার পর থেকে এই প্রথম রাত ওর থেকে আমি নিস্তার পেলাম। সেই রাত্রে আমি নিশ্চিন্তে আর নির্বিঘ্নে ঘুমোলাম। না, কোনরকম অস্বস্তি হোল না আমার। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করার স্মৃতি অন্তরে থাকা সত্ত্বেও আমি শান্তিতে ঘুমোলাম।

দ্বিতীয় আর তৃতীয় দিন কেটে গেল। কিন্তু ঐ ঘৃণ্য জন্তুটা আমার দৃষ্টিগোচর হল না। মনে হয় বেড়ালটা আমার ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আর বোধ হয় ওকে দেখতে পাবো না। আমি মনে মনে খুব খুশী হলাম। অবশ্য আমার মনকে বার বার দংশন করছিল অন্যায় কাজের স্মৃতিরা, তবে সে দংশন সইবার মত। দু চার জনের প্রশ্নের উত্তর সহজ ভাবেই দিলাম। ঘরের মধ্যে খোঁজাখুজি হল, কিন্তু ফল কিছুই হল না। আমি এটা ভেবে নিশ্চিন্ত হলাম যে, ভবিষ্যতে আমাকে এর জন্য বিপদে পড়তে হবে না।

হত্যাকাণ্ডের চারদিনের দিন কয়েকজন পুলিশ আবার এলো। ওরা চারিদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এই তল্লাসী চলাকালীন আমি একটুও বিরক্ত হলাম না। কারণ আমি জানি, আমার হত্যার নিদর্শন এমন নিখুঁত-ভাবে গোপন করে ফেলেছি, যে কারও ধরবার ক্ষমতা নেই। পুলিশ অফিসারদের তল্লাসীর সময় আমিও ওদের সঙ্গে ছিলাম। এই নিয়ে চারবার মাটির তলাকার কুঠরীতে খোঁজাখুজি হল। চারবারের বার যখন মাটির তলার কামরায় ওরা নেমে এলো তখন আমার হৃৎস্পন্দন সাধারণ ভাবেই হচ্ছে। আমার মাংস পেশীর মধ্যে একটুও কম্পনের সৃষ্টি হল না। আমি বুকের ওপর হাতদুটো জড় করে কুঠরীতে ঘোরাফেরা করছিলাম। পুলিশের লোকেরা কোন কিছু না পেয়ে যখন কুঠরী থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল তখন আমার আনন্দ একেবারে উপচে উঠছিল। জয়ের উল্লাসে আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম, একটা কথা বলার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে উঠলাম

যেটা আমার অপরাধহীনতাকে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে।

ওরা যখন সোপান পার হয়ে ওপরে উঠে আসছিল, তখন আমি বললাম, আপনাদের মন থেকে সন্দেহের শেষ চিহ্নটুকু নির্মূল করেছি বলে আমি যথেষ্ট আনন্দিত। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। আরেকটা কথা, এই বাড়ীটা খুব শক্ত ভিতের ওপর তৈরী। (এই সময় আমি যে পাগলের মত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে আবোল তাবোল কি বলছিলাম, এখন তা আর মনে নেই)।

……এর দেয়ালগুলো ভীষণ মজবুত। একি! আপনারা চলে যাচ্ছেন কেন? এটা কত শক্ত, একবার দেখবেন না—এই কথা বলতে বলতে আমি হাতের লাঠিটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে এমন জায়গা দেখালাম, যার ইটের নীচে আমার স্ত্রীর পচা গলা মৃতদেহ পড়ে আছে।

শয়তানের চরম দণ্ডের হাত থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। লাঠি দিয়ে দেয়ালে ঠোকার শব্দটা বাতাসের বুক থেকে মিলিয়ে যেতে না যেতেই দেয়ালের ভেতর থেকে কি এক শব্দ শোনা গেল। বুক চাপা কান্নার মত সেই হাহাকার আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে দিল। বুঝি ছোট্ট একটি ছেলে দম বন্ধ আর্তনাদে গোঙাচ্ছে। দেয়ালের ভেতর থেকে নির্গত সেই বিস্ময়কর অমানুষিক শব্দটার সাথে ভীতি-বিহ্বল প্রতিশোধের নারকীয় আনন্দ মেশানো ছিল। তীব্র সেই চীৎকার শুনে মনে হচ্ছিল, নরকের জঘন্য শয়তান আর তাদের শাস্তিদাতা বীভৎস দৈত্যেরা বুঝি একই সঙ্গে আর্তনাদ করছে।

সেই মুহূর্তে আমার চিন্তার সমুদ্রে যে আলোড়ন উঠেছিল তা অবর্ণনীয়। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। আমি ওপরের দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে কোনরকমে দাঁড়ালাম। ভয়ে আর বিস্ময়ে হতবাক পুলিশরা নিথর, নিস্পন্দ হয়ে গেল। পর মুহূর্তে দশ বারোটি শক্ত সবল হাতের আক্রমণে হুড়মুড়িয়ে দেয়াল পড়ল ভেঙে। চাপ চাপ রক্তমাখা মৃতদেহটা ভেসে উঠল ওদের চোখের সামনে।

যে জন্তুটার জন্যে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তাকে দেখা গেল চোখের

মণিতে দাউ দাউ আগুন নিয়ে বিকৃত বীভৎস মুখে মৃতদেহের মাথার উপর বসে থাকতে। ওর অনুনাসিক অলৌকিক কণ্ঠস্বর যে আমাকে ফাঁসির মঞ্চে পৌঁছে দিল সেকথা বলাই বাহুল্য।

মৃতদেহটা দেয়ালের মধ্যে গেঁথে ফেলার সময় মনের অজান্তে কখন যে ঐ কালো শয়তানকে জীবন্ত সমাধি দিয়েছিলাম, আমার চেতনায় তা ধরা পড়েনি।

এডগার অ্যালান পো'র জন্ম ১৮০৯ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরে। আধুনিক বুদ্ধিদীপ্ত গোয়েন্দা গল্পের জনক হিসেবে যাঁর স্বীকৃতি সারা পৃথিবীতে। জীবনের প্রথম প্রহর থেকে দারিদ্রের কশাঘাতে জর্জরিত, দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে পো চল্লিশ বছরের স্বল্প স্থায়ী জীবনে রচনা করেছেন অতুলনীয় সাহিত্যের কুহকমায়া। আটচল্লিশটি কবিতায় বিধৃত আধুনিক প্রতীক কাব্যের ভিত্তি, গল্পের মাধ্যমে উচ্চারিত অ্যাবস্ট্রাক্ট্ আর্টের ধারা। এরই ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞান সুবাসিত কল্প কাহিনী এবং গোয়েন্দা গল্পের সম্পূর্ণ নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন।

"কালো বেড়াল" হলো তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌতিক গল্প, যেখানে নারকীয় প্রতিশোধস্পৃহায় শিহরিত কাহিনী অবিশ্বাস্য কৃতিত্বে বিবৃত হয়েছে। পো'র "মার্ডার ইন দি রু মরগ্", 'দি গোল্ড বাগ', 'মিস্ট্রি অব মেরি রোগেট' ইত্যাদি গ্রন্থ তাঁকে মার্কিন সাহিত্যের অগ্রগণ্য লেখকদের অন্যতম করে তোলে। তিনি কাব্যের তাম্বুলরাগে রঞ্জিত করে যে সব কল্পকাহিনী উপহার দিয়েছেন তা আজও অননুকরণীয়। বিজ্ঞান সুবাসিত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পুষ্ট গল্পগুলি ভীতি-বিহ্বল কাহিনী বিন্যাসের আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল ও উপাদেয়। পথিক পর্যী উপন্যাস ছাড়াও গল্প কবিতাও সমালোচনা সাহিত্যের অঙ্গনে লেখকের অবদান অনস্বীকার্য।

দারিদ্রের কশাঘাতে নিষ্পেষিত লেখক ১৮৪৯ সালে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

শার্লক হোমস ও রক্ত চোষা

—স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

"......কিন্তু যন্ত্রণার সচকিত কান্নায়
ফিরে আসে সে।
সে দেখলো, শিশুর মা নিজের ছেলের
গলা কামড়ে ধরেছে তার ঝকঝকে
দাঁতে।"

গত ডাকে এসেছে যে চিঠি, হোমস সেটা সযত্নে পাঠ করলো। তারপর, তার সেই ঠোঁটের শুকনো শব্দে হাসির কাছাকাছি পৌঁছে, চিঠিখানা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

—আমার মনে হয় এর মধ্যে আধুনিকতা, মধ্যযুগীয় মনোভাব আর কঠোর বাস্তবতা এবং বন্য-কল্পনার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। ওয়াটসন, দেখতো কিছু বুঝতে পার কিনা ?

আমি পড়লাম—

৪৬, ওল্ড জিওরি
১৯ শে নভেম্বর
বিষয়—ভ্যাম্পায়ার

মহাশয়,

আমাদের মক্কেল, ফারগুসন এণ্ড মুর হেড, টি ব্রোকার (মিনসিং লেন) এর মিষ্টার ফারগুসন রক্তচোষা সম্পর্কে কিছু অন্বেষণ করেছেন। তিনি এ বিষয়ে আমাদের কিছু প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু আমরা যন্ত্রপাতি নিয়ে

কাজকর্ম করে থাকি, তাই এ ব্যাপারটি আমাদের বিষয়ের মধ্যে পড়ছে না। সুতরাং আমরা মিষ্টার ফারগুসনের কাছে আপনার নাম সুপারিশ করছি। উনি হয়তো আপনার কাছে গিয়ে ওনার জিজ্ঞাস্য বিষয় জানতে চাইবেন। ম্যাটিলডা ব্রিগসের ঘটনায় আপনার অসাধারণ সফলতার কথা আমরা এখনও ভুলে যাই নি।

নমস্কারান্তে—
একান্ত ভবদীয়,
মরিসিম মরিসিম এণ্ড ডড
কোম্পানীর পক্ষে ই. জে. সি.

—ওয়াটসন, কি ভাবছো? ম্যাটিকণ্ডা ব্রিগস এক সুন্দরী তরুণীর নাম? মোটেই তা নয়—হোমস রোমন্থনী সুরে বলে—এটি হল সুমাত্রার দানব ইঁদুরের সঙ্গে যুক্ত এক জাহাজের নাম। যার ভয়াবহতাকে সঠিক উপলব্ধি করার মত প্রস্তুতি এই পৃথিবীর মানুষের ছিল না। কিন্তু রক্তচোষাদের সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি। সত্যি বলতে কি, এটা কি আমাদের অনুসন্ধানের ব্যাপার? তবে অলস মুহূর্তের নিদারুণ যন্ত্রনার চেয়ে যে কোন ব্যস্ততা বোধ হয় কাম্য, তাই না? মনে হচ্ছে, আমরা যেন গ্রীস ভাইদের স্বপ্নালু রূপকথার রাজ্যে ভেসে চলেছি। ওয়াটসন হাতটা বাড়িয়ে—অভিধানখানা একবার দাও তো, দেখি এখানে ভি অক্ষরটি আমাদের জন্যে কোন সংবাদ বহন করছে।

আমি ঝুঁকে তাক থেকে বিরাট অভিধানখানা তুলে নিলুম। হোমস সেটা তার হাঁটুর উপর বসিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে সেখানে লিপিবদ্ধ পুরোনো ঘটনাগুলোর ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো মান্দাক্রান্তা—সুপ্রিয় গতিত। এইসব ঘটনায় ধরা আছে তার দীর্ঘ জীবন সঞ্জাত তথ্যের অফুরন্ত উৎস।

—গ্লোরিয়াস স্কটের সমুদ্র অভিযান, সে পড়তে থাকে, এটা একটা বাজে কাহিনী। ওয়াটসন, আমার স্মৃতির সমুদ্র হাতড়ে তুমি দলিলের ঝিনুক কুড়িয়েছো। তবে এ কাজে তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাতে পারছি

না। ভিক্টর লিনচ নামের জোচ্চোর, বিষাক্ত টিকটিকি, ওহো মনে পড়েছে। স্মরণীয় ঘটনা! সার্কাস নর্তকী ভিক্টোরিয়া, ভ্যাণ্ডার বিল্ট আর ইয়্যাগ ম্যান, ভাইপার ভিগর, জ্যামারস স্মিথের বিস্ময়! হ্যালো! এই তো পেয়েছি! আমার প্রিয় অনুগত সূচীর বুকে কি লেখা আছে শোনো। হাঙ্গেরীতে ভ্যাম্পায়ার ইজম আবার ট্রানসিল ভ্যানিয়ার বুকে রক্তচোষাদের দুরন্ত আনাগোনা।

ব্যস্ততার সঙ্গে হোমস পাতা ওল্টাতে থাকে। তারপর সমকালীন ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয় তার চোখের তারা। তারপর সীমায়িত বিরক্তিতে বইটি ছুঁড়ে দিল একদিকে।

—সব মিথ্যে ওয়াটসন, বাজে ব্যাপার। ভাবতে পারো, কি লিখেছে? চলমান লাস, কবরে পুঁততে হলে নাকি হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কাঠের ছোরা ঢোকাতে হবে! পাগলের পাগলামি আর কি?

—কিন্তু হোমস, আমি বলি, মৃত লোক ছাড়া কি কেউ ভ্যাম্পায়ার হয় না? জীবন্ত মানুষের মধ্যেও এই স্বভাব থাকে? যেমন ধরো, আমি শুনেছি, অনেক সময় বুড়োরা তাদের হারানো যৌবন ফিরে পাওয়ার জন্যে রক্ত পান করে।

—তুমি ঠিকই বলেছো ওয়াটসন। এই ধরণের কিছু কিছু গল্প গাঁথা প্রচলিত আছে বই কি। তবে আমরা কি তার প্রতি মনোযোগ দেখাবো? এই পৃথিবী হলো বিরাট এক রঙ্গশালা। এর রহস্য অন্বেষণ করতে আমাদের সংস্থা মাটির কাছাকাছি থাকতে চায়। তবে বাতাসে না-ই বা ওড়ালে। আমার মনে হয়, মিষ্টার রবার্ট ফারগুসনের সমস্যা নিয়ে আমরা বিশেষ মাথা ঘামাবো না। মনে হচ্ছে এই চিঠিটা তিনি লিখেছেন আর এটা পড়লে আমরা হয়তো বুঝতে পারবো যে কোন ঘটনায় উনি এতখানি চিন্তিত।

এতক্ষণ যে চিঠিখানা তার অগোচরে শুয়েছিল টেবিলে, ব্যস্ত ছিল সে প্রথম চিঠিটি নিয়ে, এখন সেটা তার হাতে উঠে এলো।

পড়তে পড়তে তার ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে কৌতুক ভরা আনন্দের হাল্কা হাসির ফুরফুরে ছোঁয়া। ক্রমশঃ তা মিলিয়ে যায় সুগভীর আকর্ষণ আর মনোযোগে।

পড়া শেষ হলে সে হাতের দু আঙুলের মধ্যে চিঠিটা রেখে কি এক অভাবিত বিস্ময়ে মৌন থাকে ক' মুহূর্ত। তারপর ফিরে আসে বাস্তবতার মধ্যে।

—চিসম্যানস, ল্যাম্বারলি, ওয়াটসন, বলতে পারো জায়গাটা কোথায়?

—এটা হলো সাসেকসে। হর্স হ্যামের দক্ষিণে।

—যাক্ বেশী দূরে নয়। আর চিসম্যানস্।

—হোমস, আমি জায়গাটা জানি। ওখানে আছে শতাব্দীর স্মৃতি বাহিত সুরম্য হর্ম্যের সারি। যারা তাদের বিগত কালের সৃষ্টি কর্তার নাম বহন করছে। ওডলি, হার্ভি, ক্যারিটন—কালের যাত্রায় কোথায় এরা হারিয়ে গেছে। কিন্তু নামগুলো আজও বেঁচে আছে সৌধ সারিতে।

—সংক্ষেপে বলো।

হোমস শীতল কণ্ঠে বলে। এটা হলো তার গর্বিত আত্ম-সম্পৃক্ত স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যখন তার মাথার কোষে কোষে কোষান্তরে কোন নতুন চিন্তার তরঙ্গ দ্রুত নিখুঁতভাবে ঢেউ তোলে, তখন সে কখনও অন্য কাউকে স্বীকৃতি দেয় না।

—আমার মনে হয় কাজ স্নুরু করার আগে চিস্‌ম্যানস্ আর ল্যাম্বারলি সম্পর্কে আরও বেশী করে জানতে হবে। ওয়াটসন, এই হলো রবার্ট ফারগুসনের চিঠি। উনি আবার তোমার পরিচিতি দাবী করেছেন।

—আমাকে উনি চেনেন নাকি!

—পড়লেই সব বুঝতে পারবে।

হোমস আমায় চিঠিটা দিল। খামের উপর ঠিকানা লেখা।

চিঠিতে লেখা—

প্রিয় মিষ্টার হোমস আমার আইন বিশারদের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে আপনাকে এই পত্র লিখছি। কিন্তু ব্যাপারটি এতই সূক্ষ্ম যে আলোচনা করা সহজ নয়। এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, আমার এক বন্ধুর জীবনে। বন্ধুটি বছর পাঁচেক আগে পেরুদেশীয় মেয়েকে বিয়ে করে। মেয়েটি হলো পেরুর এক ব্যবসায়ী কন্যা, যার সঙ্গে বন্ধুর বিয়ে হয়েছিল নাইট্রেটের ব্যবসা বাণিজ্যের সময়। মেয়েটি ছিল অনন্যা রূপবতী। কিন্তু

তার বিদেশী স্বভাব আর অজানা ধর্মের ফলেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গড়ে ওঠে বিচ্ছেদের প্রাচীর। তাই কিছুদিনের মধ্যেই ওদের ভালবাসায় জমে যায় অবিশ্বাস এবং ওরা এই মিলনকে জীবনের মস্তবড় ক্ষতি হিসেবে মনে করতে থাকে। বন্ধুটির মতে, তার স্ত্রীর জীবনে ঘনীভূত আছে এমন কিছু রহস্য যা কোনদিনই উন্মোচিত হবে না। যে পুরুষ তার স্ত্রীকে ভালবাসতে চায় এবং যে স্ত্রী উজাড় করতে চায় নিজের হৃদয়—তাদের কাছে এই বিচ্ছেদ অসহনীয়।

······দেখা হলে এ সম্পর্কে আরো বিশদ তথ্য জানাতে পারবো। চিঠির মাধ্যমে আমি ঘটনা সম্পর্কে একটা সাধারণ পরিচিতি দিতে পারি মাত্র যাতে এ বিষয়ে আপনার কৌতূহল স্তিমিত হয়। মেয়েটির সহজাত কোমলতা ও ভদ্র আচরণের সঙ্গে খাপ খায় না এমন কিছু অদ্ভুত ব্যবহারে আমরা বিস্মিত হয়ে গেছি। আগেই বলে রাখি, আমার বন্ধু দুবার বিয়ে করেছে, প্রথম পক্ষের একটি ছেলে আছে। সে হলো বছর পনেরোর, ভারী সুন্দর চঞ্চল কিশোর। কিন্তু ছোটবেলায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় শারীরিক ভাবে অসুস্থ। বন্ধুর দ্বিতীয়া পত্নী এই ছেলেটিকে একেবারে সহ্য করতে পারে না। এমন কি বার দুয়েক সে ছেলেটিকে প্রচণ্ড মারধোর করেছে। একবার লাঠি দিয়ে তার গায়ে আঘাত করে, এতে ছেলেটির হাতে বেশ লেগেছিল।

······কিন্তু নিজের একবছরের শিশুর প্রতি অভাবিত বিরূপ আচরণের তুলনায় এ এক অকিঞ্চিৎকর ঘটনা। মাসখানেক আগের একটা দিনের কথা মনে পড়ে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে নার্স ছেলেটিকে একলা রেখে চলে যায়। কিন্তু যন্ত্রণার সচকিত কান্নায় ফিরে আসে সে। তারপর নিজের চোখে যা দেখে তাতে যে কোন মানুষ ভয়ে বিস্ময়ে শিউরে উঠবে!

সে দেখলো, শিশুর মা নিজের ছেলের গলা কামড়ে ধরেছে তার ঝকঝকে দাঁতে। ছেলেটির গলায় ছোট্ট ক্ষত দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে। এই ঘটনায় নার্স প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আমার বন্ধুকে ডাকতে যায়। কিন্তু ভদ্রমহিলার অনুরোধে এবং পাঁচ পাউণ্ডের লোভে নীরবতা পালন করে।

এই অদ্ভুত ঘটনার কোন কারণ জানা যায় নি। অবশ্য এরপর এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে নি।

এরপর নার্সের মনে ভয়ার্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তখন থেকেই সে তার মনিবের স্ত্রীকে চোখে চোখে রেখে শিশুটির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। কেনমা বাচ্চাটিকে সে ভীষণ ভালবাসে। নার্সের মনে হয় সে যেমন ভাবে ডাইনী মায়ের উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে তেমন ভাবে সেই মহিলাও দৃষ্টির পরিসীমা বেঁধেছে। শুধু তাই নয়, যখনই সে শিশুটিকে একলা ফেলে কোথাও যেতে বাধ্য হয় তখনই মা বাচ্চাটির কাছে আসার চেষ্টা করে। দিনে রাতে ছেলেটির উপর নিরাপত্তার আবরণ দেয় ঐ স্নেহশীল নার্স এবং নীরব নৈঃশব্দের মধ্যে জননী তাকিয়ে থাকে তার শিশুর দিকে যেন তৃষিতা নেকড়ে মেষ শাবকের জন্যে অপেক্ষারত।

চিঠি পড়ে হয়তো আপনার মনের আকাশে অবিশ্বাসের মেঘ জমা হতে পারে। তাই আমার বিনীত অনুরোধ দয়া করে ব্যাপারটিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করুন। এর সঙ্গে এক অসহায় শিশুর জীবন এবং আর এক সুস্থ মানুষের মানসিক শাস্তি নির্ভর করছে।

অবশেষে একদিন এলো সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত, যখন কোন কিছুই আর স্বামীর কাছ থেকে গোপন রাখা গেল না। নার্সের স্নায়ুকোষ ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত। সে আর বুঝি সহ্য করতে পারে না, তাই আমার বন্ধুকে সে জানালো সবকিছু। সব শুনে আপনার মত আমার বন্ধুটির মনেও অবিশ্বাস জমা হয়েছিল। সে জানে, তার স্ত্রী যথেষ্ট স্নেহশীলা আর আগের পক্ষের ছেলেটির প্রতি জমে থাকা হিংসা ছাড়া তার আর কোন বর্বরতা নেই। তাহলে কেন সে নিজের আদরের ছোট্ট শিশুর রক্ত পান করবে ?

আমার বন্ধু নার্সকে বললো, এ তার স্বপ্নের ভ্রম, অসংলগ্ন মানসিকতার ধূসর প্রতিচ্ছবি। আর ভবিষ্যতে এমন সন্দেহের বীজ উপ্ত হলে তা সহ্য করা হবে না কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাদের কথাবার্তার সময় যন্ত্রণার আকস্মিক কান্না শোনা গেল। আমার বন্ধু আর সেই নার্স সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল বাচ্চার ঘরে। এখন, মিষ্টার হোমস, মানসচোখে কল্পনা

করুন সেই ভয় বিহ্বল ছবি। বন্ধু দেখলো তার স্ত্রী খাটের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছে আর ছোট্ট শিশুর গলায় রক্তের দাগ, উৎসারিত রক্তে চাদর ভিজে গেছে। আতঙ্কের আর্তনাদে বন্ধুটি তার স্ত্রীর মুখ সজোরে ঘোরালো আলোর দিকে, ঠোঁটের চারপাশে তাজা রক্তের বীভৎস আলপনা। এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে, তার স্ত্রী নিজের শিশুর রক্ত পান করেছে! এরপর মহিলাকে তার ঘরে বন্দী করা হয়েছে। এই আশ্চর্য ঘটনার কোন উত্তর মেলেনি। শোকে, দুঃখে বন্ধু আমার অর্ধ উন্মাদ। রক্তপায়ীদের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আমার মত সেও বিশেষ কিছু জানে না। আমার মনে হয় এ যেন বিদেশের বন্য পশু।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বুকে সাসেকসে কেমন করে এ ঘটনা ঘটলো তা ভাবতে অবাক লাগে। আপনার সঙ্গে আলোচনা করলে অনেক কিছু জানতে পারব বলে মনে হয়। আপনি কি আসবেন? এক অসহায় মানুষকে নিদারুন যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাতে আপনি কি আপনার সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন? যদি রাজি থাকেন, তাহলে দয়া করে চিসম্যানস ল্যাম্বারলিতে ফারগুসনের নামে তার পাঠাবেন। আমি দশটার মধ্যেই আপনার ঘরে হাজির হবো।

—আপনার বিশ্বস্ত

রবার্ট ফারগুসন

পুনশ্চ:—আপনার বন্ধু ওয়াটসন যখন ব্ল্যাকহীথের হয়ে রাগবি খেলেছিলেন তখন আমি রীচমণ্ডের থ্রী কোয়ার্টার। এটাই হলো একমাত্র ব্যক্তিগত সখ্যতার উদাহরণ।

—ওনাকে মনে পড়েছে, চিঠিটা নামিয়ে রাখতে রাখতে আমি মন্তব্য করি, বব ফারগুসন রীচমণ্ড দলের সব সেরা থ্রী কোয়ার্টার। সুন্দর স্বভাবের ভদ্রলোক। তাই বন্ধুর দুঃখে কাতর হয়েছেন।

চিন্তাচ্ছন্নতার মধ্যে হোমস আমার দিকে তাকিয়ে তার মাথা নাড়লো।

—ওয়াটসন, মনে হচ্ছে এই ঘটনায় আশ্চর্য সম্ভবনা আছে। ভদ্রলোককে তার করে দাও। —আপনার সমস্যার সমাধান করতে পারলে আনন্দিত হবো।

—তার মানে ?

—আমাদের সংস্থা যে দুর্বল চিত্তের মানুষদের কোন নিরাপদ আশ্রয় নয় সেটা বোঝানোর জন্যে এই তারটা পাঠানো দরকার। আপাততঃ কাল সকাল অব্দি আমাদের চুপচাপ থাকতে হবে।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল দশটায় ফারগুসন এসে প্রবেশ করলো আমাদের ঘরে। ওর চেহারা সম্পর্কে যে ছবি আমার স্মৃতিতে উজ্জল ছিল তা হল দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান এক যুবক! যার চলাফেরার গতিময়তা। কিন্তু এখন দেখছি কাঁধটা ঝুলে গেছে, চেহারটায় সেই জৌলুস আর নেই। যে খেলোয়াড়কে আমি তার জীবনের সেরা দিনে দেখেছি তার এই বিধ্বস্ত পরিণতি দেখাটা সত্যিই দুঃখের। কাঠামো ভেঙে পড়েছে, মাথার চুল উঠে গেছে, কাঠের সেই দৃঢ়তা আর নেই। আমার মনে হল, সেও আমাকে দেখে একই আবেগে ভরে গেছে।

—হ্যালো ওয়াটসন, সে বললো। গলার স্বরে এখনও গভীরতা আর আন্তরিকতার আশ্চর্য অবস্থান। ওল্ড ডিয়ার পার্কে যে মানুষটির সঙ্গে আমি খেলেছিলাম, যাকে আমি সীমানার কাছাকাছি ঠেলে দিই সেই লোকটা অনেক বদলে গেছে কি বলো ? অবশ্য পরিবর্তন আমারও কম হয়নি। তবে গত দু তিন দিনে কেমন যেন বুড়ো হয়ে গেছি। মিঃ হোমস, আপনার টেলিগ্রাম পেলাম। সত্যি এবার বন্ধুর ছদ্মবেশটা খুলে ফেলা যাক।

—সোজাসুজি কথাবার্তা বলাটাই ভাল, হোমস বলল।

—ঠিকই বলেছেন। কিন্তু যে রমণীকে আপনি নিরাপত্তা আর সাহায্য দেবেন তার প্রতি এমন কথা বলাটা কত শক্ত, আশা করি অনুমান করতে পারি। আমি কি করবো ? আমি কি এমন একটা অবিশ্বাস্য গল্প শোনাবো পুলিশকে। ছেলে দুটিকে বাঁচাতে হবে। মিঃ হোমস, এ এক উন্মত্ততা। রক্তের মধ্যে কি যেন আছে। আপনার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এর আগে কখনও কি এমন ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন ? ঈশ্বরের দোহাই, অনুগ্রহ করে আমায় সাহায্য করুন, আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি।

—খুবই স্বাভাবিক মিঃ ফারগুসন। এখন স্থির হয়ে বসে আমার কয়েকটা প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব দিন তো। আমি আপনাকে সুনিশ্চিত করে বলতে পারি যে আমি কখনও হতবাক হই না। তাছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা এই সমস্যার সমাধান পাবো। সবচেয়ে আগে বলুন, আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? আপনার স্ত্রী কি এখনও ছেলেদের কাছে আছেন?

—সে এক শিহরিত দৃশ্য। মিঃ হোমস, ও খুব স্নেহশীলা রমণী। আমাকে সে তার হৃদয়ের কোমল আন্তরিকতা আর প্রগাঢ় সৌন্দর্যে ভালবাসে। যখন এই আতঙ্কিত অবিশ্বাস্য গোপনীয়তার উন্মোচন ঘটলো তখন তার হৃদয় বুঝি বিদীর্ণ হল। সে কোন কথা বললো না। আমার তিরস্কারের জবাব দিলো না। শুধু তার চোখের তারায় ফুটিয়ে রাখলো হতাশ আরণ্যক চাউনি। তারপর সে তার ঘরে ঢুকে ভেতর দিয়ে বন্ধ করে দিল। সেই থেকে সে আমার সাথে দেখা করে নি। বিয়ের আগে থেকেই ডলোরাস নামে একজন পরিচারিকা আছে তার অনেকটা বান্ধবীর মত। সে-ই তার জন্য খাবার নিয়ে যায়।

—তার মানে শিশুটির এখন তেমন কোন ভয় নেই?

—মিসেস ম্যাসন, সেই নার্সটি শপথ করেছে, সে দিনে বা রাতে ছেলেটিকে একলা ফেলে যাবে না। আমি তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু হতভাগ্য জ্যাক সম্পর্কে আমার উদ্বেগের অন্ত নেই। চিঠিতে আপনাকে তো জানিয়েছি যে সে বার দুয়েক আমার স্ত্রীর হাতে মার খেয়েছে।

—ছেলেটি কি আহত হয়েছে?

—না। তবে আমার স্ত্রী তাকে সজোরে আঘাত করে। ঐ ছোট্ট শান্ত পঙ্গু ছেলেটির কাছে এ এক দুঃখজনক ঘটনা।

ফারগুসনের গম্ভীর আচরণের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলো কোমলতা যখন সে তার ছেলের কথা বললো—হোমস, হতভাগ্য ছেলেটির নিদারুণ অবস্থা দেখলে যে কোন পাষাণ হৃদয় গলে যাবে। ছোট বেলায় সে উঁচু

থেকে পড়ে যায়। তাই তার শির দাঁড়া বেঁকে গেছে। কিন্তু তার বিকৃত চেহারার মধ্যে আছে মায়াবী হৃদয়।

গতকালের ডাকে আসা চিঠিটা হাতে নিয়ে হোমস প্রশ্ন করে, মিষ্টার ফারগুসন, আপনার বাড়ীতে আর কে কে আছে ?

—দুটি চাকর তারা নতুন এসেছে। আর আস্তাবল রক্ষক মাইকেল। সে ওখানে শোয়। আমার বউ, আমি, আমার ছেলে জ্যাক, ছোট্ট শিশুটি, ডলোরাস এবং নার্স মিসেস ম্যাসেন।

—আচ্ছা, আপনি কি বিয়ের আগে থেকেই আপনার স্ত্রীকে চিনতেন ?

—হ্যা, কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে।

—ডলোরাস কতদিন আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত ?

—কয়েক বছর ধরে।

—তার মানে আপনার স্ত্রীর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে আপনার চেয়ে বেশী খবর রাখে।

—তা বলতে পারেন।

হোমস কথাটা লিখে রাখলো।

—আমার মনে হয়, সে বললো, ল্যাম্বারলিতে পৌঁছলে বেশী কিছু জানা যেতে পারে। এটি ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের বিষয়। ভদ্রমহিলা যদি তার ঘরে সেচ্ছাবন্দী থাকেন তাহলে আমাদের উপস্থিতিতে তিনি বিরক্ত হবেন না। অবশ্য আমরা সরাইখানাতে থাকবো।

• ফারগুসনের অভিব্যক্তিতে নিশ্চিন্ততার ছাপ দেখা গেল।

—মিষ্টার হোমস, এমনটি আমি আশা করেছিলাম। ভিক্টোরিয়া থেকে দুটোর সময় ট্রেন ছাড়ে। আপনারা সেই ট্রেন ধরতে পারেন।

—অবশ্যই। এখন জমে আছে অলসতা। তাই আমার অবিভাজ্য শক্তি সমর্পন করবো। ওয়াটসন আমাদের সঙ্গে যাবে। কিন্তু কাজ শুরু করার আগে দুটি একটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার হতে চাই। ঐ হতভাগিনী মহিলা আর নিজের শিশু আর আপনার ছোট্ট ছেলেকে আঘাত করেছে—তাই না ?

—হ্যাঁ তাই।

—কিন্তু আঘাতের ধরণ বিভিন্ন, তাই তো? উনি আপনার ছেলেকে মেরেছিল।

—একবার লাঠি দিয়ে আর একবার হাতে।

—উনি কি ওনার এই ব্যবহারের কোন কারণ দেখান ?

—না। শুধু জানিয়েছিল সে জ্যাককে ঘৃণা করে। বারবার সে এ কথাই সে বলে।

—বিমাতাদের মধ্যে এমন ব্যবহার অজানা নয়। একে আশ্চর্য হিংসা বলতে পারি। কিন্তু মহিলা কি স্বভাবতই হিংসুক ?

—হ্যাঁ, সে খুবই ঈর্ষাপরায়না। তার আগ্নেয় কবোষ্ণ ভালবাসার সীমাহীন শক্তিতে গর্বিতা।

—কিন্তু ছেলেটির বয়স তো পনেরো। আর শারীরিকভাবে অক্ষম বলে তার অসাধারণ মানসিক বিকাশ ঘটবে। সে কি এই আঘাতের কোন কারণ দেখিয়েছে ?

—না। সে জানিয়েছে, এর কোন কারণ নেই।

—সাধরণভাবে ওদের সম্পর্ক কেমন ?

—না, ওদের মধ্যে কোন দিনই ভালো সম্পর্ক ছিল না।

—কিন্তু আপনি তো জানালেন যে ছেলেটি খুব দয়ালু ?

—পৃথিবীতে এমন অনুগত ছেলে আর কারো আছে বলে আমার জানা নেই। সে আমাকে খুবই ভালবাসে। আমার কথা আর কাজে তার অগাধ আস্থা।

হোমস আবার এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করলো। কিছুক্ষণ সে হারিয়ে গেল ভাবনার জগতে। আপনার দ্বিতীয় বিয়ের আগে আপনি আর ঐ ছেলেটি সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলেন ?

—নিশ্চয়ই।

—এমন স্নেহপরায়ণ অনুগত ছেলের মনের মধ্যে মায়ের স্মৃতি তো থাকবেই ?

—হ্যাঁ।

—মনে হচ্ছে ছেলেটি খুবই আকর্ষণীয়। এইসব ঘটনা সম্পর্কে আর

একটি কথা জানবো, ছোট্ট শিশুর ওপর অভাবিত আক্রমণ আর আপনার ছেলের নির্যাতনের ঘটনা দুটি কি একই সঙ্গে ঘটেছিল।

—প্রথমবার তাই হয়েছে। মনে হল যেন কি এক রহস্যময় ঘোরে আচ্ছন্ন থেকে আমার স্ত্রী দুই অসহায় বাচ্চার ওপর তার উষ্মা দেখিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বারের ঘটনাটা অন্যরকম। সে ক্ষেত্রে জ্যাককেই কষ্ট করতে হলো। শিশুটি সম্পর্কে মিসেস ম্যাসনের কোন অভিযোগ ছিল না।

—এই ব্যাপারটাই ঘটনাটাকে জটিল করে দিয়েছে।

—কিছুই তো বুঝলাম না মিষ্টার হোমস।

না বোঝারই কথা। অপেক্ষা না করলে কি সব জানা যায়। মিষ্টার ফারগুসন, আগে থাকতেই উতলা হবেন না। যদিও মানুষের মন স্বভাবতই দুর্বল। আমার মনে হয় এখানে উপস্থিত আপনার পুরনো বন্ধু, আমার বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির প্রতি ব্যতিক্রম কটাক্ষ করবে। যাইহোক, বর্তমানে শুধু এটুকু বলতে পারছি যে আমার কাছে আপনার সমস্যা সমাধানহীন বলে মনে হচ্ছে না। দুটো নাগাদ আমরা ভিক্টোরিয়াতে পৌঁছে যাবো।

বিবর্ণ কুয়াশাচ্ছন্ন নভেম্বরের আসন্ন প্রায় সন্ধ্যায় আমরা ল্যাম্বারলির চেকারসে জিনিসপত্র রেখে সাসেকসের দীর্ঘ প্রসারিত গলি পার হয়ে অবশেষে পৌঁছে গেলাম বিচ্ছিন্ন এক সুপ্রাচীন বাংলোতে যেখানে ফারগুসন থাকেন। এটি হল এক বিরাট প্রাচীন অট্টালিকা। যার কেন্দ্রে প্রাচীনতার ছাপ, চারপাশে নবীনতার আভাস। শীর্ষমুখী টিউডর চিমনীতে, হরস্যাম পাথর কেটে তৈরী উঁচু কানোওয়ালা খাঁজকাটা ছাদে লুকিয়ে আছে নতুনত্ব। সিঁড়িগুলো বাঁকানো। যে প্রাচীন টালি দিয়ে ছাদটি তৈরী তার ওপর সুন্দর নক্সা কাটা। সিলিং এর নীচে ওক কাঠের বীম, উঁচুনীচু মেঝে তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগে মিলিয়ে গেছে। বাড়ীটির প্রতিটি অংশে বয়েস আর ধ্বংসের চিহ্ন মাখা।

ফারগুসন যে ঘরে ঢুকলেন সেটি হল বড় আকারের মাঝের ঘর। এখানে রয়েছে পুরোনো আমলের অগ্নিধারক, যার পটভূমিতে ১৬৭০ সালের চিহ্নমাখা লোহার পর্দা, যেখানে জ্বলছে উদ্ভাসিত অগ্নিশিখা।

ঘরটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে নিস্তব্ধতা। আর্ধেক প্যানেল করা দেওয়াল-গুলিতে সপ্তদশ শতাব্দীর কোন আদি চাষীর বসবাসের চিহ্ন রয়েছে। তলার দিকে সুনির্বাচিত আধুনিক তেল রঙের সুদৃশ্য অলংকরণ। ওপরে হলুদ প্লাসটারের ওকের স্থান যেখানে ঝুলছে ল্যাটিন আমেরিকার বাসন-আর অস্ত্র-শস্ত্রের সুন্দর প্রদর্শনী। অবশ্যই এগুলো উচ্চ তলার আসীন পেরুবাসীনী মহিলার বয়ে আনা জিনিস। হোমস দাঁড়ালো, তার জিজ্ঞাসু অতলান্ত থেকে উৎসারিত দ্রুত অনুসন্ধিৎসায় সেগুলি পরীক্ষা করলো ঈষৎ যত্নে। তারপর চোখের তারায় চিন্তা নিয়ে ফিরে এলো।

—হ্যালো, সে চেঁচিয়ে উঠে, হ্যালো!

এককোনে পড়ে থাকা বাস্কেটে শুয়ে আছে একটা স্প্যানিয়েল। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার প্রভুর কাছে এলো। ওর পেছনের পা দুটি ঠিকমত পড়ছে না আর লেজটি মেঝের সঙ্গে ঠেকেছে। কুকুরটা ফারগুসনের কাছে এসে দাঁড়ায়।

—মিঃ হোমস, কি ব্যাপার?

—কুকুরটার কি হয়েছে?

—বুঝতে পারছি না। ডাক্তার বলছে, এক ধরণের প্যারালিসেস্—স্পাইনাল মেনিনজাইটিস্। এখন সে সেরে উঠেছে। তাই না কারলো?

কুণ্ডলী পাকানো লেজের সঞ্চালনে প্রকাশ পেল তার সম্মতির মৃদু শিহরণ। কুকুরটির শোকার্ত চোখ দুটি আমাদের সকলের মুখের উপর পড়লো। সে বুঝেছে যে আমরা এখন তার কথাই আলোচনা করছি।

—ব্যাপারটা কি হঠাৎ হলো?

—এক রাতের ঘটনা।

—কতদিন আগে?

—মাস চারেক হবে।

—খুবই উল্লেখযোগ্য।

—মিঃ হোমস, এর মধ্যে কিসের সন্ধান পেলেন?

—যে সিদ্ধান্ত আমি ইতিমধ্যে করেছি তার স্বপক্ষে কিছু তথ্য পেয়ে গেলাম।

—ঈশ্বরের দোহাই। বলুন কি আবিষ্কার করেছেন। যেটা আপনার কাছে শুধু এক বুদ্ধির ধাঁধা সেটাই আমার কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন। আমার স্ত্রী এক খুনীতে পরিণত হতে চলেছে। আমার ছোট্ট শিশুটি ধারাবাহিক বিপদের মধ্যে বাস করছে। মিঃ হোমস, আমার সঙ্গে খেলা করবেন না। ঘটনাটি দারুন গুরুত্বপূর্ণ।

রাগবি থ্রি কোয়ার্টার খেলোয়াড়টির সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো। হোমস তার পিঠে হাত রেখে কোন মতে শান্ত করলো তাকে।

—মিঃ ফারগুসন, আমার মনে হচ্ছে, এই সমস্যার সমাধান যাই হোক না কেন, সেটা আপনাকে ব্যথা দেবে। আমার দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না, তবে এই মুহূর্তে আমি আর কোন কিছুই বলতে পারছি না। কিন্তু এই বাড়ী থেকে চলে যাবার আগে আপনাকে সুনির্দিষ্ট মতামত জানিয়ে যাবে।

—ভগবানের আশীর্বাদে তাই যেন হয়! যদি আপনি অনুমতি করেন তাহলে একবার ওপরে উঠে আমার স্ত্রীর ঘরটা দেখে আসবো। দেখি এর মধ্যে আর কোন রূপান্তর ঘটলো কিনা।

ফারগুসন কিছুক্ষনের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। হোমস আবার কৌতূহলের সঙ্গে দেওয়ালে টাঙানো জিনিসগুলো দেখতে লাগলো। যখন আমাদের বন্ধুটি ফিরে এলো তখন তার মুখের ভঙ্গিমা দেখে বোঝা গেল যে এ-ব্যাপারে কোন উন্নতি হয় নি। তার সঙ্গে ছিল এক দীর্ঘাঙ্গী একটু রোগা বাদামী মুখের মেয়ে।

ফারগুসন বললো—ডলোরাস, চা তৈরী? দেখো তো আমার স্ত্রীর আর কিছু লাগবে কি না?

কর্তার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে মেয়েটি জবাব দেয়—ও খুব অসুস্থ। ও কিছুই খাচ্ছে না। মনে হয় একজন ডাক্তার ডাকা দরকার। ডাক্তার ছাড়া আমি ওর কাছে একলা থাকতে পারছি না।

চোখে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে ফারগুসন আমার দিকে তাকালো।

—আমি যদি তোমার কাছে আসতে পারি তাহলে ধন্য হবো।

—ডলোরাস, তোমার মিসট্রেস কি ডক্টর ওয়াটসনের সঙ্গে দেখা করবে?

—আমি ওনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। এর জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই।

—তাহলে এখুনি যাওয়াই উচিত।

আমি মেয়েটিকে অনুসরণ করলাম। সে সুদৃঢ় আবেগ বদ্ধ থেকে সিড়ি পার হয়ে প্রাচীন করিডরে এসে থামলো। এর শেষে রয়েছে লোহার তালা ঝোলানো শক্ত দরজা। সেটা দেখে আমার মনে হল যদি ফারগুসন জোর করে তার স্ত্রীকে দেখার চেষ্টা করে তাহলে সেও ব্যর্থ হবে। মেয়েটি তার পকেট থেকে বের করলো একটা চাবি। ওকের ভারি দরজায় শব্দ উঠলো যেন। আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। মেয়েটি ঢুকলো। দরজায় তালা লাগালো।

বিছানায় শায়িতা যে মহিলা তিনি যে জ্বরেতে আচ্ছন্ন তা বোঝা গেল। এখন তার চেতনা অর্ধেক নিভে গেছে। কিন্তু আমি যেই ঢুকলাম সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজোড়া ভয় বিহ্বল সুন্দর চোখ তুলে আমার দিকে চাইলেন। মনে হলো আমাকে চিনতে না পেরে একটু আশ্বস্ত হলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসলেন।

আমি সান্ত্বনাসূচক কথা বলতে বলতে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। নাড়ীর গতি অনুভব করলাম। দুটোই খুব উঁচু। মনে হলো মানসিক আর স্নায়বিক উত্তেজনায় তার এই রোগের সৃষ্টি। শরীরের কোন ব্যাধি নেই।

মেয়েটি ফিসফিস করে বলে—ও এই অবস্থায় দু দুটো দিন পড়ে আছে। মনে হচ্ছে এবার মরে যাবে।

মহিলা তাঁর আরক্তিম রূপোসী মুখ তুলে আমার দিকে চাইলেন।

—আমার স্বামী কোথায়?

—সে নিচে আছে। আর আপনাকে দেখতে চাইছে।

—না, কখনো না। ওর মুখ আমি আর কখনও দেখবো না। তারপর আচ্ছন্নতার মধ্যে উনি ভুল বকতে থাকেন—শয়তান! জীবন্ত শয়তান! এই শয়তানটাকে নিয়ে আমি কি করবো।

—আমি কি কোন ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

—না। কেউ আমায় সাহায্য করতে পারে না। ব্যাপারটা শেষ

হয়ে গেছে। সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি এখন কি করবো? সব যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

মহিলা নিশ্চয় কোন অদ্ভুত কল্পনায় মগ্ন আছেন। নাহলে বব ফারগুসনের মত ভদ্রলোক কি শয়তান হতে পারে।

—ম্যাডাম, আপনার স্বামী আপনাকে খুব ভালবাসে। এই সব ঘটনায় সে আন্তরিক দুঃখিত।

মহিলা আবার তাঁর গৌরবান্বিত চোখ মেলে তাকালেন।

—না। সে আমায় বিশ্বাস করবে না। আমার ব্যথা সে বুঝবে না।

—আপনি ওর সঙ্গে দেখা করবেন না? আমি জানতে চাই।

—না, না। ঐ ভয়ঙ্কর শব্দগুলো আমি যে মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি না। ওর মুখ আমি আর কখনো দেখবো না। দয়া করে আমাকে একলা থাকতে দিন। আপনি আমার কোন উপকার করতে পারবেন না। আমার স্বামীকে একটা কথা জানাবেন আমার বাচ্চাকে আমি চাই। তার ওপর আমার অধিকার আছে। এটাই আমার একটি মাত্র কথা।

তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ডুবে গেলেন নিঃস্তব্ধতায়।

আমি সিঁড়ি বেয়ে নীচে এলাম। দেখি আগুনের ধারে ফারগুসন, আর হোমস এখনও বসে আছে। ফারগুসন শান্তভাবে আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনলো। কি করে আমি শিশুটিকে বিপদের মুখে ফেলি? কে জানে, কোন, অদ্ভুত আবেগের তাড়নায় সে এই দাবি করছে! আমি কি করে ভুলবো, সেই অভাবিত দৃশ্যটি! ওর ঠোঁটের কোণে লেগেছিল নিজের শিশুর রক্ত। মিসেস ম্যাসনের কাছে শিশুটি নিরাপদে আছে, ওখানেই ও থাকবে।

এই সুপ্রাচীন অট্টালিকার একমাত্র আধুনিক নিদর্শন স্বরূপ ঢুকলো একটি মেয়ে। সঙ্গে চায়ের ট্রে। যখন সে চা ঢালছিল তখন ফাঁকা দরজা ঠেলে এলো এক কিশোর। ছেলেটির চেহারার সহজ সরল আকর্ষণ আছে। বিবর্ণ মুখের সাদা চুলের ছেলে, উত্তেজনায় ভরপুর হালকা নীলাভ চোখ দুটি জ্বলে উঠলো আবেগের তাৎক্ষনিক শিখায় যখন সে তার বাবার দিকে

তাকালো। সে ছুটে এসে কোমল মেয়ের মত বাবার গলা জড়িয়ে ধরলো তার দু হাতে।

—বাবা, সে বললো, আমি তো জানতাম না যে তুমি এত তাড়াতাড়ি আসবে। তোমাকে দেখে কি ভীষণ ভালো লাগছে!

ফারগুসন ধীরে ধীরে নিজেকে ছেলের আলিঙ্গন হতে মুক্ত করলো। এর মধ্যে লুকিয়ে ছিল সামান্য বিরক্তি।

তারপর ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—আমি তাড়াতাড়ি এসেছি কারণ আমার দুই বন্ধু মিঃ হোমস আর ডাক্তার ওয়াটসন আজ সন্ধ্যাটা এখানে কাটাবে।

—ইনি কি সেই নাম করা গোয়েন্দা শার্লক হোমস?

—বাঃ, তুই ঠিক ধরেছিস তো।

ছেলেটি আমাদের দিকে তাকালো তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে।

তার চাউনিতে আন্তরিকতার ছাপ নেই।

—মিঃ ফারগুসন আপনার ছোট শিশুর খবর কি, হোমস বলে, ওর সঙ্গে তো আমরা এখনও পরিচিত হলাম না।

ফারগুসন বললো—মিসেস ম্যাসনকে বলো তো জ্যাক, শিশুটিকে এখানে আনতে।

ছেলেটি একটু কুঁজো হয়ে অদ্ভুত ভাবে হেঁটে চলে গেল। যা আমার ডাক্তারের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলো না। আমি বুঝতে পারলাম যে সে মেরুদণ্ডের দুর্বলতায় ভুগছে।

একটু পরেই সে ফিরে এলো। তার সঙ্গে এলো লম্বা গম্ভীর মহিলা। তার হাতে এক ফুটফুটে শিশু। ঘন চোখ, মাথায় একরাশ সোনালী চুলের বন্যা, স্যাকসন আর ল্যাটিন চেহারার সুন্দর মিলন। ফারগুসন যে তার শিশুর প্রতি কতটা স্নেহশীল তা বোঝা গেল যখন সে শান্তভাবে ছেলেটিকে দু হাতে তুলে ধরলো।

—ভাবতো, পৃথিবীতে এমন কেউ কি আছে, যে একে আঘাত দিতে পারে। শিশুটির গলার কোমল চামড়ায় জেগে থাকা ছোট্ট কুৎসিত লাল গর্তের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ফারগুসন বলে।

সহসা আমি দেখলাম হোমস তার নিজস্ব তীক্ষ্ণতায় মগ্ন। তার মুখ যেন প্রাচীন হাতির দাঁতে খোদাই করা এবং চোখ দুটি ক্ষণকাল স্থাপিত হলো বাবা আর ছেলের ওপর। তারপর তা ঘরের অন্যদিকে অবস্থিত বস্তুর প্রতি আবদ্ধ হল কৌতুহলী অনুসন্ধিৎসায়।

তার দৃষ্টির রেখা ধরে আমি শুধু অনুভব করলাম যে সে এখন বাতায়ন পথে তাকিয়ে আছে বাইরের বিষাদ ঘন উদ্যানের দিকে। বাইরের দিকের জানলা অর্ধেক খোলা। তাই হোমসের দৃষ্টির সীমানা আড়াল হয়ে গেছে। কিন্তু হোমস যে কোথায় তার কেন্দ্রীভূত মনোযোগ স্থাপন করেছে, ঠিক বোঝা গেল না। তারপর সে মৃদু হাসল। তার দৃষ্টি বাচ্চার ওপর ফিরিয়ে আনলো। নিরীক্ষণ করলো গলায় দাগ। কোন কথা বললো না। অবশেষে শিশুটির ছোট্ট হাতের মুঠি ধরে বিদায় জানালো।

—ছোট্ট বন্ধু, গুড বাই, তোমার জীবন শুরু হয়েছে কি অদ্ভুত ভাবে! নার্স, আমি আপনার সঙ্গে আড়ালে দু একটি কথা বলতে চাই।

হোমস নার্সকে একপাশে ডেকে নিয়ে তার সঙ্গে কি সব কথা বললো। আমার কানে ভেসে এলো শেষের দু একটি শব্দ—আমার মনে হয় আপনার চিন্তার অবসান ঘটতে বেশী দেরী হবে না।

ভদ্রমহিলা যাকে মনে হয় কাঠিন্য আর নৈঃশব্দের প্রতিমূর্তি, বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে গেল।

—মিসেস ম্যাসনকে কেমন দেখলে? হোমসের প্রশ্ন।

—বাইরে থেকে বন্ধুত্বের নির্দশনে বোঝা না গেলেও আসলে সোনায় তৈরী মন তার। বাচ্চটিকে খুব ভালবাসে।

—জ্যাক, তুমি একে পছন্দ করো? হোমস সহসা জ্যাকের দিকে ঘুরে দেখলো।

জ্যাকের অভিব্যক্তিতে ভরা চলমান মুখে বিরক্তির ছায়া। সে মাথা নাড়লো।

—নিজের পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে জ্যাকের নিজস্ব মতামত আছে। ছেলের কাঁধে হাত রেখে ফারগুসন বলে—সৌভাগ্য বশতঃ আমি তার পছন্দের তালিকায় পড়েছি।

এই কথায় ছেলেটি লজ্জা পেয়ে তার বাবার বুকে মাথা ঘষতে লাগলো। ফারগুসন শান্ত ভাবে ছেলেটিকে তুলে ধরলো।

—যাও জ্যাক, তোমার ঘরে যাও। সে বললো। তারপর জ্যাক অদৃশ্য না হওয়া অবধি তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

—মিঃ হোমস, জ্যাক চলে যাবার পর ফারগুসন বলতে থাকে, আমার মনে হচ্ছে এ বাপারে মিছিমিছি আপনাকে এতদূর টেনে এনেছি। সহানুভূতি ছাড়া আপনি কি-ই বা দিতে পারেন? ব্যাপারটি এত সূক্ষ্ম আর জটিল যে সহজে এর সমাধান করা সম্ভব নয়।

রহস্যের হাসি হেসে হোমস বলে—ব্যাপারটা যে সূক্ষ্ম তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর জটিলতা সম্পর্কে আমি এখনও সুনিশ্চিত নই। তাছাড়া এটাকে বুদ্ধির লড়াই বলা যেতে পারে। এর আগে অনেকবার এমন ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করেছি। আর সত্যি বলতে কি বেকার স্ট্রীটের বাড়ীতে বসেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন দরকার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা।

ফারগুসন দুহাতে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো ঈশ্বরের দোহাই হোমস, যদি সত্যিই আপনি কোন কিছু বুঝতে পেরে থাকেন, অনুগ্রহ করে আমাকে জানান। আমাকে সন্দেহের মধ্যে রাখবেন না। আমি কি করবো? কার কাছে যাবো?

—অবশ্যই। সব জানাবো আমি। তার আগে আর কিছুক্ষণ আমাকে আমার পথে চলতে দিন। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী কি আমার সাথে দেখা করবেন।

—যদিও সে অসুস্থ, কিন্তু তার ভদ্রতা সীমাহীন।

—ঠিক আছে, শুধুমাত্র তাঁর সামনেই সমস্যা সমাধান হতে পারে। চলুন, ওনার কাছে যাওয়া যাক।

—সে তো আমার মুখ দেখবে না। ফারগুসন চীৎকার করে বলে।

—উনি সকলের কথাই শুনবেন। হোমস বলল।

তারপর এক টুকরো কাগজে কি সব লিখলো যেন। আমাকে বললো—ওয়াটসন, তুমি তো একবার ভেতরে ঢুকেছিলে। দয়া করে ভদ্রমহিলাকে এই চিঠিটা দিয়ে আসবে?

আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ডলোরাসকে চিঠিটা দিলাম। সে সন্তর্পণে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। এক মুহূর্ত বাদে ভেতর থেকে ভেসে এলো আনন্দ আর বিস্ময়ভরা সচকিত কান্নার শব্দ, ডলোরাস বেরিয়ে আসে—ও সকলের সঙ্গে দেখা করবে। সকলের কথা শুনবে।

আমার ডাকে উঠে এলো ফারগুসন আর হোমস। আমরা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ফারগুসন গোটা দুই পদক্ষেপ ফেলে এগিয়ে গেল স্ত্রীর দিকে। মহিলা বিছানাতে উঠে বসেছেন। কিন্তু স্বামীকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে হাত তুলে বিরক্তি জানালেন। ফারগুসন আরাম কেদারায় বসলো। হোমস বসলো পাশে। মহিলা হোমসের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিস্তীর্ণ বিমুগ্ধতার দৃষ্টিতে।

—আমার মনে হয় ডলোরাসকে আমরা হয়তো কাজে লাগাতে পারি। আশা করি, ম্যাডাম এতে আপনার কোন আপত্তি নেই। হোমস বললো, মিঃ ফারগুসন, আপনি তো জানেন যে আমাকে নানা কাজে দারুন ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই সহজ সংক্ষিপ্ত পথে আমি এ রহস্যের সমাধান করবো। জানেন তো সবচেয়ে দ্রুত অপারেশনই সবচেয়ে কম যন্ত্রণা দেয়। প্রথমেই বলে রাখি, আপনার স্ত্রী অত্যন্ত ভাল স্নেহশীল মহিলা। কিন্তু তাঁর প্রতি আপনি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন।

একথা শুনে ফারগুসন লাফিয়ে ওঠেন।

—আমার দোষ কোথায়, অনুগ্রহ করে যদি বলেন তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

—অবশ্যই বলবো। কিন্তু তা শুনে আপনার মনে আঘাত লাগতে পারে।

—আমার স্ত্রীর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে যে কোন যন্ত্রণা সহ্য কবতে রাজি আছি আমি। এর তুলনায় পৃথিবীর আর সব কিছু নেহাত মূল্যহীন বলে মনে হয়।

—তাহলে শুনুন আমার চিন্তাধারা, যা আমি বেকার স্ট্রীটে বসে বসে ভেবেছিলাম। রক্তচোষার ঘটনা নেহাতই এক ঘটনা। ইংলণ্ডের ইতিহাসে

এর কোন স্থান নেই। অথচ আপনার চোখের দেখায় কোন ভুল ছিল না। আপনি দেখেছিলেন যে আপনার স্ত্রী শিশুর খাটের পাশে বসে আছে, তার ঠোঁটে রক্তের দাগ!

—হ্যাঁ, দেখেছিলাম।

—কিন্তু কখনও কি আপনার মনে হয় নি যে অন্য কোন কারণে এই রক্তচোষা হয়েছিল? ইংলণ্ডের ইতিহাসে আমরা এমন এক রাণীর কথা জানি যিনি রক্ত চুষে নিজের শরীর থেকে বিষ বের করেন।

—বিষ!

—দক্ষিণ আমেরিকান পরিবার—আমার মনে হল যে দেওয়ালে আছে ধনুক কিন্তু তীরগুলি নেই। অন্য কোন বিষও হতে পারে কিন্তু একটা ঘটনার ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে গেল। যদি শিশুটির দেহে কুংরার জাতীয় মারাত্মক বিষ মাখা তীরের আঘাত লাগে তাহলে সে আর বাঁচবে না। বাঁচতে পারে যদি সঙ্গে সঙ্গে রক্ত চুষে বের করা হয়।

…ঐ কুকুরটার ওপর প্রথম বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। দেখা হল বিষ কাজ করছে কি না। এবার আপনি হয়তো সবকিছু পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। আপনার স্ত্রী এমন আঘাতের ভয় করেছিলেন। সত্যি যখন ছোট্ট শিশুর উপর আঘাত করা হল তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না, রক্ত চুষে বিষ বের করে শিশুটাকে বাঁচালেন। কিন্তু যে এই কাজ করেছে সে জ্যাকি সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেন নি। আপনার বুক ভেঙে যেত তাহলে।

—জ্যাকি!

—আপনি যখন ছোট্ট শিশুটিকে দু হাতে ধরে আদর করছিলেন তখন আমি দেখছিলাম জানলার দিকে যেখানে খড়খড়ির আড়ালে জ্যাকি দাঁড়িয়েছিল। কাঁচের সর্সিতে তার মুখের স্বচ্ছ প্রতিফলন পড়েছিল। সেখানে যে মারাত্মক বিতৃষ্ণা আর ঘৃণার ছায়া ছিল যা কদাচিৎ দেখা যায় মানুষের মুখে।

—হায় ঈশ্বর! আমার জ্যাকি!

—আপনাকে এই চরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে মিঃ ফারগুসন।

এ এক বিকৃত ভালবাসার নিদর্শন। এর অন্তরালে আছে আপনার প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ আর তার মৃত মায়ের প্রতি গভীর অনুভূতি, যা তাকে এই ঘৃণ্য কাজে প্রবৃত্ত করিয়েছে। নিজের দুর্বলতার সঙ্গে ফুটফুটে বাচ্চার সুন্দর চেহারার তুলনা করে জ্যাকির আত্মা ঘৃণায় ভরে ওঠে।

—হে ভগবান! এ যে অবিশ্বাস্য!

—ম্যাডাম, আমি সব ঠিক মত বলছি তো?

ভদ্রমহিলা বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

এবার তিনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—বব, কি করে এ কথা তোমাকে বলবো বলো। আমি জানি, এতে তুমি কতখানি আঘাত পেয়েছো। আমি ভেবেছিলাম, অন্য কারো মুখ থেকে অপ্রিয় সত্য কথা প্রকাশিত হতো! যখন এই ভদ্রলোক তাঁর আশ্চর্য যাতুক্ষমতায় সবকিছু জানতে পেরে আমায় চিঠি দিলেন তখন মন আনন্দে ভরে গেল।

চেয়ার থেকে উঠে হোমস বলে—মাষ্টার জ্যাকিকে বছরখানেক দূরে কোথাও সরিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু ম্যাডাম, একটা ব্যাপারে সন্দেহের মেঘ যে কাটছে না। মাষ্টার জ্যাকির ওপর আপনার আক্রমণের কারণ বুঝতে পারি। মায়ের ধৈর্যের শেষ আছে তো? কিন্তু গত তুদিন ধরে কি করে বাচ্চাকে একলা ছাড়লেন? ভয় করেনি আপনার?

—মিসেস ম্যাসনকে সব বলেছিলাম আমি।

—ঠিক এমনটি অনুমান করেছি।

ফারগুসন বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো, কাঁপছে সে, হাত তুটি প্রসারিত, কান্নার আওয়াজ।

—চল হে ওয়াটসন, এটাই বোধ হয় বিদায় নেওয়ার উপযুক্ত সময়। বাকি ব্যাপারটা ওরাই ঠিক করুক, কি বলো?

এই ঘটনা সম্পর্কে আর একটি ছোট্ট বক্তব্য আছে। প্রথম চিঠির উত্তরে হোমস একখানি চিঠি লিখেছিল। সেটি এই রকম—

বেকার স্ট্রীট
২১শে নভেম্বর

বিষয়—**ভ্যাম্পায়ার**।

মহাশয়,

আপনার ১৯ তারিখের চিঠির উত্তরে লিখছি যে আমি আপনার মক্কেল মি ফারগুসনের সমস্যার সমাধান করেছি। আপনার সুপারিশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

ইতি
একান্ত ভবদীয়
শার্লক হোমস।

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল : জন্ম ১৮৫৯-এডিনবার্গে। **শার্লক হোমসের** এই শতাব্দীর সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্র হিসেবে আজও পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে গোয়েন্দা ঈর্ষিত আসনে আসীন। তার অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তায় হারিয়ে গেছে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল যিনি অসাধারণ সফলতায় এমন এক কালোত্তীর্ণ চরিত্রের জন্ম দিয়েছেন। কপর্দকহীন তরুণ ডাক্তারের অবসর বিনোদন থেকে লেখা গোয়েন্দা গল্প যে এককালে তাঁকে পৃথিবী জোড়া খ্যাতির মুকুট এনে দেবে কে জানত।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধির স্বর্ণচ্ছটায় বিশ্লেষণের মায়াবী আকর্ষণে এবং চরিত্রের জীবন্ত অস্তিত্বে শার্লক বুঝি চলমান এক শিহরণ। শার্লক হোমস তাঁর স্রষ্টা পুরুষ ডঃ কোনান ডয়েল হতেও অনেক নামী ও দামী মানুষ। জীবনে মাত্র একবার এই সুচতুর গোয়েন্দা তার ২২১ বি বেকার স্ট্রীটের বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছিল ভৌতিক রহস্যের সমাধান করতে। তাই 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব দি সাসেক্স ভ্যাম্পায়ার' আজ এক ইতিহাস হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রায় দুষ্প্রাপ্য এই অতুলনীয় গল্পটি আমাদের সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করছি।

অনধিকার

—সাকি (এইচ এইচ মুনরো)

সে হাসি প্রচণ্ড ভয়ের হাসি .....
 সে হাসি আতঙ্কের .....।

তিনজন শিকার সন্ধানী সেরাত্রে যাত্রা করলো। কার্পাথিয়ানসের পূর্বদিকের কোথাও একটা জঙ্গল! একটা লোক শীতের একরাত্রি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে আর কান পেতে কি যেন শুনছে।...... সম্ভবত বনের ভিতর থেকে কোন জানোয়ার এসে ওর রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে এসে কখন দাঁড়ায় তারই প্রতীক্ষা! এই প্রতীক্ষা যার জন্য, সে তো এখনও এসে পৌঁছুল না! কেসেমক্রে? উলরিচ ভন গ্র্যাডউইজ সেই অন্ধকার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো কোন পশুর উদ্দেশ্যে নয়। ও ঘুরছিলো মনুষ্যরূপী শত্রুর জন্য।...জঙ্গলটা গ্র্যাডউইজের... এটা বেশ বিস্তৃতও ছিল! যদিও জঙ্গলটা সুটিং করবার মত এমন আহামরি কিছু ছিল না তবুও এটা ঈর্ষাকাতর হয়েই অন্যান্যদের অধিকার করবার বা দখল করবার হাত থেকেই পাহারা দিতে হোত। ওর পিতামহের আমলের একজন বিখ্যাত আইনবিদ প্রতিবেশীদের এবং সরিকদের জবরদখলের হাত থেকে খুব জোর কেড়ে নিয়ে নিয়েছিলেন। এবং ফলে সরিকদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই একটা বিরোধ ছিল! সম্পর্কের তিক্ততা কিছুতেই যায়নি! যখন উলরিচ পরিবারের হর্তাকর্তাবিধাতা হোল তখন পারিবারিক দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হোল। যাকে উলরিচ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশী ঘৃণা করতে শুরু করলো তার নাম Georg Znaeym। দ্বন্দ্ব উত্তরাধিকার সূত্রে সমস্ত কিছুর মধ্যেই জড়িয়ে পড়লো।

ঘোড়ার চড়া থেকে সুরু করে সব কিছুর মধ্যে! যদি ব্যক্তিগত ইচ্ছে অনিচ্ছের দ্বন্দ্বটা কাটানো যেত তবে হয় তো এই পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটতে পারতো। যেমন একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের বিপদ কামনা করে, একজন শত্রু অন্যজনের রক্তের জন্য তৃষ্ণার্ত থাকে। ঠিক তেমনি এই উত্তুরে হাওয়ায় পূর্ণ শীতের রাত্রে উলরিচ চারপেয়ে জন্তু নয় ওর বাউণ্ডারীতে কোন চোর চোট্টা তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ছোট ছোট হরিণগুলো সাধারণত শীতকালের এই হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়াতে জঙ্গলের মধ্যে কোথাও আশ্রয় নিয়ে থাকে কিন্তু আজ রাত্রে বড় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে! উলরিচের মনে হচ্ছে যে কোন অবাঞ্ছিতের আগমন ঘটেছে বনে!......এই আবহাওয়াতে একজনই আসতে পারে এখানে—Georg Znaeym—ও যদি আসে তবে একেবারে কাঠে কাঠে বাধবে। কেউই সাক্ষী নেই।...উলরিচ এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছিল!...এগোতে এগোতে একটা বড় ঝোঁপ পার হয়ে যে লোকটার মুখোমুখি পড়ে গেল এই লোকটিই সে খুঁজছিল!

কিছুক্ষণ গভীর স্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে এই দুই শত্রু পরস্পরের মধ্যে দিয়ে কাটালো! প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল! প্রত্যেকেরই অন্তরে তীব্র ঘৃণা একজন অন্যজনকে খুন করার অদম্যস্পৃহা! কিন্তু আমরা তো প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোক নই তাই একজন মানুষ হঠাৎ কোন কথা না বলে একজনকে হত্যা করতে পারে না। স্নায়ুতে সেই জোর সে পায় না! কিন্তু তা সত্ত্বেও হিংস্রতার একটা ভয়ংকর রূপ দুজনের মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠলো! এমন সময় ঝড়ের মধ্যে একটা গাছে হঠাৎ বাজ পড়ে ওদের উপর পড়লো।......কিসের থেকে কি হয়ে গেল! উলরিচ পড়ে গেল একটা হাত অসাড় হয়ে ওর দেহের নীচে পড়লো! আর অপরজন অসহায়ভাবে একটা ঝোপের কাছে গিয়ে পড়ে রইল। ওর পায়ের ভারী বুটটা ওর পা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে! তবে ওদের ফ্রাকচার সাংঘাতিক না হলেও এমন কিছু কম নয় এবং এর ফলে ওরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে নড়তে পারবে কিনা সন্দেহ! উলরিচের গায়ের ওপর গাছের ছোট ছোট ডালগুলো ঝাপটা দিচ্ছিল

আর ও একটা হাত দিয়ে ওগুলোকে সরাবার চেষ্টা করছিল। গিওর্গ হাত দিয়ে চোখ থেকে রক্তের ফোঁটাগুলো মুছে নিয়ে এই বিপর্যয়টা দেখবার চেষ্টা করছিল। Georg Znaeym (গিওর্গ নেইম) ওর এত কাছে যে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়! অন্য সময় হলে হয়তো দুজনে চুলোচুলি বেধে যেত। এখন অবশ্য আলাদা কথা! ওদের চারিদিকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ডালের সব টুকরো পড়েছিল!

নিজের জীবন বেঁচে যাবার জন্য উলরিচ বিড়বিড় করে কাকে যেন ধন্যবাদ দিচ্ছিল! গিওর্গ হাত দিয়ে অবিরাম রক্তস্রাব ঠেকাতে ঠেকাতে মৃদু তিক্ত হাসি হেসে বললো ?

"ও তুমি তাহলে মরনি। তবে তুমি যাই ভাবনা কেন তুমি ইরা পড়ে গেছ কি আশ্চর্য ব্যাপার উলরিচ ভন গ্রাডউইচ তার চুরি করা বনে বন্ধ হয়ে আটকে পড়ে আছে। এইটেই তোমার পক্ষে উপযুক্ত বিচার।" উলরিচ হিংস্রভাবে হেসে বললো।

আমি তো আমার নিজের বনের মধ্যে আটকা পড়েছি। কিন্তু আমার লোকজনরা যখন আমাকে মুক্ত করতে এখানে আসবে তারা দেখবে যে তাদের প্রতিবেশী চুরি করতে এসে অপরের বনে আটকে পড়ে আছে। ছিঃ লজ্জাতে তো মাথা ঢাকাবার জায়গা পাবে না!"

গিওর্গ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিল :

"তুমি কি নিশ্চিন্ত যে তোমার লোকজনেরা তোমাকে মুক্ত করতে আসবে? আমি কিন্তু একা আসিনি। পিছনে আমার লোকজনেরা আসছে। আমার লোকজনেরা যখন আমায় মুক্ত করে দেবে তখন এই ডাল, গাছের গুঁড়িগুলো তোমার উপর নিক্ষেপ করে যাওয়া তাদের পক্ষে খুব কঠিন হবে না! এবং যখন তোমার লোকজনেরা তোমায় উদ্ধার করবে তখন তুমি মৃত। অবশ্য আমার দিক থেকে তোমার পরিবারকে সান্ত্বনা শোকবার্তা যাকে বল তা' অবশ্যই পাঠাবো।"

উলরিচ ভয়ংকর ক্ষিপ্ত হয়ে বললো : এটা একটা ভাল কথা বলেছো! আমার লোকজনদের দশমিনিটের মধ্যে এখানে আসবার জন্য আদেশ দেওয়া আছে। তার মধ্যে সাত মিনিট অলরেডী কেটে গেছে। যখন

তারা এসে আপনাকে উদ্ধার করবে তখন তোমার এই কথাটা মনে রাখবো। যেহেতু তুমি আমার জমিতে এসে দেহ রেখেছ তার জন্যেই যে তোমার পরিবারকে শোকবার্তা পাঠাতে হবে এমন কথা আমি চিন্তা করিনি।"

এইভাবে দুজন দুজনকে যতদূর সম্ভব তিক্ত ভাষায় বার্তালাপ চালিয়ে যেতে লাগলো। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে পরাজিত করবার জন্য উন্মুখ। কারণ প্রত্যেকেই জানে যে তাদের লোকজন এই অন্ধকারে তাদের খুঁজে পেতে বেশ বেগ পাবে। শুধু সময় ক্ষেপণ আর কি! কোন দল আগে এসে পৌঁছবে কেই বা বলতে পারে!

দুজনে দুজনকে গাছের তলা থেকে মুক্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে। উলরিচ তার একটা হাত দিয়েই কোটের পকেট থেকে মদের বোতলটা বের করবার চেষ্টা করছিল। মদের বোতলটা বের করা হয়ে গেলে তখন আবার বোতলের মুখ খোলাটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পর তাও খোলা গেল যা হোক করে। প্রচণ্ড হাড়কাঁপানো শীত, ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ায় মাঝে মাঝে অল্প অল্প বরফ পড়ছে। মদ আহত মানুষকে গরম করে তুলবে এতো স্বাভাবিক! উলরিচ স্বয়ং করুণার চোখে যেখানে ওর শত্রু গিওর্গ আছে সেদিকটাতে তাকালো। মুখের কথাতে ঝাঁঝ স্বাদ ছিল না। গিওর্গকে উলরিচ বললো।

'হাতটা বাড়াতে পারবে নাকি? তাহলে মদটা খেয়ে দেখতে পার। মদটা ভাল। শরীরকে বেশ গরম করবে। আরামও কিছুটা পেতে পার। নাও পান কর না হয়। আজ রাতে যদি না আবার আমাদের যে কোন একজন মারা যায়! তাহলে তো এসব হবে না!'

গিওর্গ বললো 'হাত বাড়াতে পারবো না। আমার চোখের ওপর রক্ত জমে জমে সাদা হয়ে গেছে। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না প্রায়। আর তাছাড়া শত্রুর সঙ্গে মদ্যপান করি না।'

উলরিচ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তার মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। ও ওই মানুষটাকে দেখলো ব্যাথার সঙ্গে, বিপর্যয়ের সাঙ্গ যুদ্ধ করে চলেছে! ব্যাথা বেদনায় উলরিচও বিপর্যস্ত ছিল। ও গিওর্গকে ডেকে বললো, 'শোন, তোমার লোক প্রথমে এলে তুমি যা খুশী

কোর তবে আমি আমার মত পাল্টেছি। আমার লোক যদি প্রথমে আসে তাহলে তারা আপনাকে প্রথমে রক্ষা করবে কারণ আপনি আমার অতিথি। জান আমরা সারা জীবন এই বন নিয়ে মূর্খের মত ঝগড়া করে এসেছি। আমাদের ঝগড়ার চোটে এই বনের হাওয়া পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এরা আমাদের দ্বন্দ্বকে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারছে না। সেইজন্যই বোধ হয় এদের ক্রোধের তলাতেই আজ আমরা চাপা পড়েছি। আমার আজ মনে হচ্ছে যে পৃথিবীতে এছাড়াও আরও ভাল জিনিস আছে। এই বাউণ্ডারীর বাইরেও আরও বড় জগৎ আছে। আমাদের এই পুরনো চিন্তাকে যদি ধ্বংস করে ফেল তবে আমি তোমায় আমার বন্ধু করে নেব।'

গিওর্গ লেইম এতক্ষণ ধরে চুপ করে ছিল যে উলরিচ ভেবেছিল ও বুঝি ব্যাথার চোটে অজ্ঞান হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পরে গিওর্গ গলা ঝাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করলো, 'দেখ সারা জীবন আমরা পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করে এসেছি। আজ হঠাৎ যদি আমরা বন্ধু হয়ে যাই তবে লোকে কি তা বিশ্বাস করবে। আজ রাতে যদি হঠাৎ আমরা পরস্পরের অত্যন্ত কাছে চলে আসি এই দ্বন্দ্বকে ঘুচিয়ে তাহলেও লোকে বিশ্বাস করবে না। তবে আমি বিশ্বাস করি যে লোকেরা শান্তি পাবে। আমরা যদি কাউকে আমাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে ডাকি তাহলে তারা সানন্দে আসবে। কিন্তু আমাদের দ্বন্দ্বের মধ্যে আমি অবাঞ্ছিত কাউকে চাই না। এই শহরে এমন কেউ নেই যে আমরা নিজেদের ভেতর শান্তি স্থাপন করলে বাধা দেবে। আমি যদিও সর্বদা তোমায় ঘৃণা করে এসেছি কিন্তু তুমি যখন আমায় ড্রিংক দিতে চাইলে তখনই আমি আমার মন পাল্টে ফেলেছি। ...উলরিচ ডন গ্র্যাডউইচ আমি আপনার বন্ধু হব।'

সেই ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ বনে ওরা দুজনেই চুপ করে ছিল। সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবর্তনে দুজনেরই মন আনন্দে উদ্বেলিত আর ঝোড়ো হাওয়ার আন্দোলনে গাছগুলোও আন্দোলিত হয়ে চলেছিল। টপ...টপ...করে জল ঝরে পড়ছিল। প্রত্যেকেই মনে মনে চাইছিল যে তারপর লোকজনই সর্ব প্রথম আসুক এবং সেই তার শত্রুকে সম্মান দেখাক। অনেকক্ষণ স্তব্ধতা ভঙ্গ করলো।

'এস সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে চিৎকার করি।' গিওর্গ বললো, 'সে চীৎকার বেশীদূর যাবে না এই গাছ-গাছড়ার বাধা ভেঙ্গে। সম্ভাবনা কম তবু সেটা চেষ্টা করা যেতে পারে।'

শিকারীরা যে জাতীয় চীৎকার করে সেইভাবে ওরা দুজনে চেঁচালো! কানপেতে শুনে যখন কোন প্রত্যুত্তর পেল না তখন কয়েক মিনিট অন্তর চীৎকার করতে লাগলো আর মাঝে মাঝে কান পেতে শুনতে লাগলো কিছু শোনা যায় কি না। কিন্তু সবটাই ব্যর্থ হল।

গিওর্গ হতাশ সুরে বললো, 'শুধুমাত্র বাতাসের শব্দ ছাড়া তো কিছুই শোনা যাচ্ছে না।'

হঠাৎ উলরিচ আনন্দে চীৎকার করে উঠলো. 'আমি কতগুলো ফিলার দেখতে পাচ্ছি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসছে।'

ওরা আরও জোরে চীৎকার করে উঠলো যাতে ওরা শুনতে পায়।

উলরিচ বললো, 'ওরা যেন থেমে গেল। মনে হয় আমাদের ডাক শুনতে পেয়েছে।'

গিওর্গ প্রশ্ন করলো, 'ওরা কয়জন?'

উলরিচ জবাব দিল, 'ঠিক পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি না। তবে নয়-দশজন হবে।'

গিওর্গ বললো, 'তাহলে ওরা তোমার লোক। আমার লোকজনের সংখ্যা সাতজন।'

উলরিচ আনন্দের সঙ্গে বললো, 'ওরা খুব জোরে জোরে ছুটে আসছে। বাঃ! বাঃ! দৌড়! তাড়াতাড়ি দৌড়।' অতঃপর গিওর্গ বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, 'ওরা কি তোমার লোকজন? কি হলো কথা বলছো না কেন?'

উলরিচ চুপ করে রইলো।

গিওর্গ জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার লোকজন নয়?'

উলরিচ হেসে বললো, 'না।'

সে হাসি প্রচণ্ড ভয়ের হাসি···সে হাসি আতঙ্কের হাসি।

গিওর্গ দেখতে চেষ্টা করতে করতে বললো, 'তাহলে ওরা কারা?'

উলরিচ জবাব দিল, 'নেকড়ের দল······!'

এইচ. এইচ. মুনরো : বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে এমন সাহিত্যিক খুব কম জন্মেছেন যিনি রহস্য সাহিত্যকে ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন ; এইচ. এইচ. মুনরো, যিনি **সাকি** ছদ্মনামে অধিক জনপ্রিয়, তিনি হলেন সেই বিরলতম সাহিত্য স্রষ্টাদের একজন। কর্মজীবনে ইনি ছিলেন সাংবাদিক। সাহিত্য জীবনের শুরু 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গেজেট' পত্রিকায় রাজনৈতিক ব্যঙ্গ রচনার মাধ্যমে। তারপর যোগ দেন 'মর্ণিং পোস্ট' সংবাদপত্রে। এই সময়ে তিনি বেশ কয়েকটি বিখ্যাত ছোট গল্প রচনা করেন যা ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়। সারা জীবনে সাকি অসংখ্য ছোট গল্প এবং দি আন্‌বিয়ারেবল ব্যাসিংটন নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। ১৯১০ সালে মাত্র ৮৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশক হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যের ছোট গল্পের উজ্জ্বল পথ পরিক্রমায় সাকি নিঃসন্দেহে পথিকৃতের ভূমিকায় আসীন এক বিরল প্রতিভা। ইংরাজী সাহিত্যের রুডিয়ার্ড কিপলিং, চেস্টারটন, আগাথাক্রিষ্টি প্রমুখ লেখকদের সমগোত্রীয় হয়েও সাকি এক স্বতন্ত্রভঙ্গীর লেখক।

দি ইণ্টারলোপারস হলো তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আতঙ্ক ঘন ভৌতিক কাহিনী যেখানে ভয়াল তন্ময়তা শিল্প সমৃদ্ধ সুষমায় মণ্ডিত হয়েছে।

অধঃপতিত

—অ্যামব্রস বায়ার্স

... ঘারটা বিভৎসভাবে ঘুরে গেছে......সাংঘাতিক যন্ত্রণায় মোচর খাচ্ছে এ ধরণের অদ্ভূতদৃশ্য আমি কখনও দেখিনি . . . .

স্বপ্নালোকিত কক্ষ! একটা মোমবাতি জ্বলছে টিমটিম করে। তার আলোতে ঘরের মধ্যের আবহাওয়া কেমন একটা অশরীরীর রূপ পেয়েছে মনে হচ্ছে!

একটা শক্ত টেবিলে মোমবাতিটা বসানো ছিল। একটা মানুষ সেই স্বপ্নালোকে একটা কিছু পড়ছে বসে বসে। বইটা একটা পুরোনো হিসাব শাস্ত্রের বই। বইটির লেখা মাঝে মাঝে সম্ভবত বোঝা যাচ্ছিল না সেই স্বপ্নালোকে।

ঐ লোকটি মাঝে মাঝে বইটাকে মোমবাতির খুব কাছে ধরে দেখছিল বইটার লেখা পরিষ্কার করে বোঝার জন্য।

ঐ সময় বইয়ের ছায়া সমস্ত ঘরটাকে গ্রাস করে নিচ্ছিল। ঘরের লোকজনের দেহ···মুখ···আবার সবকিছুই ছায়ার আড়ালে পড়ে যাচ্ছিল। কারণ ঐ লোকটা ছাড়াও ঘরের মধ্যে আরও আটজন লোক ছিল। ঘরটার পরিসর খুব বেশী ছিল না। যে আটজন লোক ছিল, তাদের মধ্যে সাতজন রুক্ষ দেওয়ালের বিপরীতে বসেছিল। ওরা সবাই নিশ্চুপ হয়ে ছিল। তাদের মধ্যে যে কেউ ঐখানে বসে অষ্টমজনকে অর্থাৎ টেবিলে শোয়ানো আছে তাকে অনায়াসেই ছুঁতে পারে।

অষ্টম জনটি মৃত···

যে লোকটা বইটা পড়ছিল সেছিল একজন করোনার অর্থাৎ অপঘাত জনিত মৃত্যুর তদন্তকারী বিচারক বিশেষ।

করোনার তার পাঠ শেষ করে বইটাকে বুক পকেটে রেখে দিলেন। এই সময় হঠাৎ দরজা খুলে একজন যুবক ভেতরে ঢুকলো। যে ছেলেটি ঢুকলো সে স্থানীয় ছেলেই ছিল। কারণ পোশাক-আশাক শহরের অধিবাসীদের মতই। অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে, কাপড়ে বেশ ময়লা ধুলো ইত্যাদি লেগে আছে, দেখলেই বোঝা যায়। আর সত্যি বিচার বিভাগীয় তদন্তে যোগদান করতেই এসেছে। করোনার তাকে আসার সম্মতি জ্ঞাপন করলো। উপস্থিত কেউই তাকে দেখে কোন অভিবাদন করলো না।

যুবকটি মৃদু হেসে বললো—আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। আমি ঠিক আপনাদের এড়াতে চলে যাইনি। আসলে আমি গিয়েছিলাম আমার সংবাদপত্রে আমার ধারণার কথা জানাতে এবং আমি ফিরেও এসেছি সেই কথাই বর্ণনা করতে।

করোনার হাসলেন—তুমি তোমার যে ধারণার কথা বা তোমার মত সংবাদপত্রে দিয়ে এসেছো তার সঙ্গে সম্ভবত এখানে জানানো মতবাদের অমিল হবে।

যুবক একটু ক্রুদ্ধ হল বলে মনে হয়। কারণ ওর গলাতে উষ্মার স্বরেই তার প্রকাশ ঘটলো।

—আপনারা যা খুশী ভাবতে পারেন। কিন্তু আমি যে মত পাঠিয়েছি অবশ্য তার একটা কপি আমার কাছে আছে। কারণ আমি যা বলবো তা গল্পের মত অবিশ্বাস্য। তাই এটা ঠিক সংবাদ হিসেবে লেখা হয়নি। আর এটা আমার প্রামাণিক সাক্ষ্য হিসেবেও কাজে লাগবে।

—তুমি বলতে চাও এটা অবিশ্বাস্য? যুবককে প্রশ্ন করা হোল।

—আপনাদের কাজে তা লাগতে পারে। কিন্তু আমি যে কোন দিব্যি গেলে বলতে প্রস্তুত আছি যে এটা সত্য।

করোনার কিছুক্ষণের জন্য মেঝের দিকে চোখ রেখে চুপ করে রইলেন। উনি কিছু ভাবছিলেন।

অল্প পরে চোখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন—বেশ, আমরা তোমার ক্ষেত্রে বিচারের সাক্ষ্য পুনর্বার নিচ্ছি।

সবাই প্রস্তুত হলো।

সাক্ষীর শপথ বাক্য পড়িয়ে সাক্ষী নেওয়া শুরু হলো।

করোনার বললেন—তোমার নাম কি ?

সাক্ষী – উইলিয়াম হারকার।

করোনার - বয়স ?

সাক্ষী —সাতাশ।

করোনার – তুমি এই মৃত হাগ মরগ্যানকে চিনতে ?

সাক্ষী – হ্যাঁ।

করোনার—যখন লোকটার মৃত্যু হয় তখন তুমি এর সাথে ছিলে ?

সাক্ষী – এর কাছে ছিলাম।

করোনার—তোমার সম্মুখে ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল ?

সাক্ষী আমি ওকে ওরই জায়গায় ঘুরে বেড়াতে দেখতাম। মাঝে মাঝে বন্দুক দিয়ে পাখী শিকার করতো, আবার কখনো বা মাছ ধরতো। আসলে আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল ওকে ভালভাবে লক্ষ্য করা। ওর অদ্ভুত ধরনের জীবন যাত্রাকে লক্ষ্য করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আবার মনে হতো, একটা টাইপ চরিত্র হিসেবে অনায়াসে গল্পে আসতে পারে। আমি আবার মাঝে মাঝে গল্প টল্প লিখি কিনা !

করোনার—আমিও মাঝে মাঝে গল্প পড়ি।

সাক্ষী—ধন্যবাদ।

করোনার—অন্যান্য গল্প পড়ি আপনার টাকায়। অন্যান্য জুরীর দল হেসে উঠলেন।

করোনার বললেন—এই মানুষটির মৃত্যু সম্বন্ধে যা জানো বল। যদি তোমার বিশেষ কিছু বলার থাকে তুমি তা বলতে পারো।

সাক্ষী ইঙ্গিতটা বুঝলো। অতঃপর তার লেখা কপিটি আলোর সামনে তুলে ধরে তার প্রয়োজনীয় পাতাটি খুঁজতে লাগলো।

অবশেষে পাতাটি পেয়ে সেখান থেকে পড়তে লাগলো—

···যখন আমরা বাড়ী থেকে বের হলাম তখনও সূর্য পূর্ণরূপে ওঠেনি। আমাদের প্রত্যেকের হাতেই একটা শটগান ছিল আর একটা কুকুর। আমরা তিতির খুঁজছিলাম। মরগ্যান বলেছিল যে, ও একটা ভাল জায়গা খুঁজে রেখেছে শৈলশ্রেণীর নীচে। সে জায়গা নাকি আমাদের পক্ষে একেবারে আদর্শ···অতঃপর আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম।···

আমরা যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম তার অন্য একটা তুলনামূলকভাবে সমতল ছিল। আমরা এগিয়ে চললাম। মরগ্যান আমার থেকে কিছুটা এগিয়ে ছিল।···

হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনলাম···আওয়াজ ঠিক নয়, আসলে একটা হট্টগোল বা চীৎকার···এই জাতীয় একটা কিছু শুনতে পেলাম। ঝোপের মধ্যে জন্তুদের গর্জন আর ঝটপটানির শব্দ।

আমি বিস্ময়ে চমকে বললাম—বোধ হয় হরিণ, বন্দুকটা আনলে হতো।

মরগ্যান কিছু বললো না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উৎসটা দেখতে লাগলো। বন্দুকের লক খুলে তাক করে ধরে রইলো। ওকে অল্প অল্প উত্তেজিত হতে দেখে আমি একটু অবাকই হচ্ছিলাম। কারণ এসব ব্যাপার মরগ্যানের ধৈর্যের খ্যাতি সুবিদিত ছিলো। হঠাৎ কোন যদি বিপদ আপদ দেখা দিতো তাহলে ও খুবই শান্ত থাকতে পারতো।

আমি জোর দিয়ে বললাম—চলে আসুন। তিতির মারা বন্দুক দিয়ে কি আপনি হরিণ মারবেন?

কিন্তু মরগ্যান কোন উত্তর করলো না। কিন্তু মরগ্যানের দৃষ্টি দেখে আমার বেশ অবাকই লাগছিল। দৃষ্টিটা খুব তীব্রও ছিল।

তক্ষুনি আমি একটা বিপদের গন্ধ পেলাম। বিপদের গন্ধ পেয়ে মরগ্যানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঝোপটা ততক্ষণে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মরগ্যান সেইভাবেই দাঁড়িয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার? কি আছে ওখানে?

ও উত্তর করলো—ওসব ফালতু ব্যাপার।

মরগ্যান যেন কাঁপছিলো মনে হলো, গলার স্বরটা কেমন যেন খসখসে।

মরগ্যান আমার দিক থেকে মুখ ফেরালো না। গলার স্বরটা বেশ অস্বাভাবিক বলে মনে হলো।

আমি কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে, যে জায়গাটাতে গোলমাল হচ্ছিল সেই জায়গার কাছে একটা উন্মত্ত দাপট··· যেন ঝড় চলেছে ঐটুকু জায়গার মধ্যে। আমি সেই পরিবেশ বা অবস্থার কথা বর্ণনা করে বোঝাতে পারবো না···সে এক ভয়ংকর উন্মত্ততা···ঝোপ-ঝাড়, জমি সমস্ত কিছুই যেন প্রবল ঝড়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রবল চাপে তাদের যেন বেঁকিয়ে দেওয়া হচ্ছে···এমনভাবে পড়ে যাচ্ছে যেন আর জীবনগুলো উঠবে কিনা সন্দেহ···ক্রমশঃ এই উন্মত্ততা আমাদের পানে আসতে আরম্ভ করলো।

আমি সত্যি কথা বলতে কি প্রবল আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার ভয় পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত অনুভূতি চলে গেল। যাইহোক, ঝোপঝাড়ের 'কারণহীন গতি' আমাদের সবাইকে খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে ফেলে ছিল।

আমার সঙ্গী ক্রমশঃ ভীত হয়ে পড়েছিল পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। হঠাৎ বন্দুকটা তুলে নিয়েই ঐদিক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন।

···আর্তচীৎকার শোনা গেল!

বন্দুকের ধোঁয়া মিলিয়ে না যেতেই একটা বন্য চীৎকার···যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল···।

মরগ্যান লাফ দিয়ে সরে গেল বন্দুক ফেলে দিয়ে। তারপর তাকে আর স্পষ্ট দেখা গেল না। আমি কিন্তু বোঝাবার আগেই সেই ধোঁয়ার মধ্যে কোন অজানা জিনিস আমাকে অত্যন্ত হিংস্রভাবে মাটিতে ফেলে দিল। মনে হল যেন কোন নরম জিনিস আমার দিকে ছোঁড়া হয়েছিল।

···কিছুটা দূরে···মোটামুটি বিশ তিরিশ গজ হবে। আমার বন্ধু একটা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে···ঘাড়টা বীভৎসভাবে ঘুরে গেছে···মাথায় টুপী নেই···চুলগুলো এলোমেলো···সমস্ত শরীরটা যেন সাংঘাতিক যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে···একটা হাততো দেখতেই পাচ্ছিলাম না, অপর হাতটাও যেন মনে হচ্ছিল ওপরে তোলা কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।

না! ···এই ধরনের অদ্ভুত দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি···অত্যন্ত আশ্চর্যের

সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে আমি ওর শরীরের পুরোটা দেখতে পাচ্ছি না।··· আংশিক দৃশ্যমান···বর্ণনা করে সমস্ত দৃশ্য আমার পক্ষে সম্ভব হবে না··· যাইহোক ও আবার পাক খেয়ে যেতে ওর শরীরের পূর্ণ অংশ দৃষ্টিগোচর হলো।

সমস্ত ঘটনাটাই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে গিয়েছিল। আমার মনে হয় সেই সময়ে মরগ্যান ভেবেছিল যে কোন শক্তিশালী কুস্তিবাজ তাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে আমি মরগ্যান ছাড়া কাউকেই দেখতে পাচ্ছিলাম না, তাও মরগ্যানকে পুরোপুরি সর্বদা দেখতে পাচ্ছিলাম না।

তবে আমি তার গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম···যে মরগ্যানকে কব্জা করছিল তার গর্জন···সে কি ভয়ঙ্কর শব্দ···কোন মানুষের গলাতে যে ঐ-রকম বীভৎস শব্দ বের হতে পারে না, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

মুহূর্তের মধ্যে আমি খুবই অস্থির হয়ে পড়ছিলাম, কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দ্রুত আমার বন্ধুর সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেলাম। কিন্তু আমি পৌঁছোনোর আগেই মরগ্যান শান্ত হয়ে শুয়েছিল।

মরগ্যান মারা গেছে···

আমার চোখের সামনে যা ঘটে গেছে সবই লিপিবদ্ধ করেছি। আমি কিছুই অর্থ বুঝিনি...নিজেই যখন এই রকম অবাস্তব জিনিস বিশ্বাস করতে পারছি না তখন তা অপর লোকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হবে তা নিঃসন্দেহে।

তবে যা ঘটনা ঘটেছিল তার মধ্যে কোন কিছু কিন্তু বাদ না দিয়েই আমি জানালাম। এখন এই অবাস্তব ঘটনা কতটা বিশ্বাস হবে তা যে বিশ্বাস করবে তার ওপর নির্ভর করছে।

...করোনার তার আসন থেকে উঠে মৃত লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে। দেহের উপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিলেন। সমস্ত শরীরটা হলুদ হয়ে গেছে। ···অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে সমস্ত শরীরটা ফ্যাকাসে মেরে গেছে...বুক হাত দেখে মনে হচ্ছিল যে মেরে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

মাথার উপরে একটা সিল্কের রুমাল বাঁধা ছিল। করোনার সেটাও খুলে ফেললেন। কয়েকজন জুরি ভালভাবে দেখবার জন্য উঁকি মারতে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। ·· রুমালটা খুলে নেওয়ার ফলে গলাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল হারকার সে দৃশ্য সহ্য করতে পারলো না···ছুটে জানালার কাছে চলে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লো·· তারপর নিজেকে সামলাতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গেল।

করোনার মৃতমানুষটার গলার উপর আবার রুমালটা চাপা দিয়ে দিলো।

অতঃপর করোনার ঘরের একটা কোনেতে কিছু জামাকাপড় বের করে নিয়ে এলেন। তারপর সেগুলো একে একে বিছিয়ে দিলেন সামনে। সমস্ত জামাকাপড়েই রক্তের দাগ...রক্তে ভেজা।

এবার করোনার বললেন—ভদ্রমহোদয়গণ,·· আমাদের আর কোন সাক্ষী নেই, অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। আপনাদের কাজ আপনারা এবার করুন। নিজেদের ভেতরে যদি কিছু আলাপ আলোচনার থাকে তবে বাইরে গিয়ে তা করে আসুন। তারপর আপনাদের মত পেশ করুন।

জুরিদের সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—করোনার, আমার একটা প্রশ্ন আছে।

করোনার—বলুন কি জানতে চান?

জুরীদের সভাপতি—আপনার সাক্ষী কোন মানসিক চিকিৎসালয় থেকে এসেছে এবং কেমন করে?

করোনার খুব শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—মিঃ হারকার কোন মানসিক চিকিৎসালয় থেকে আপনি এসেছেন?

হারকার লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে গেল, কিছুই বললো না।

সাতজন জুরী গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যখন তারা ঘর থেকে আমাকে অপমান করা শেষ হয়ে থাকে তাহলে আমি কি চলে যেতে পারি?

করোনার—হ্যাঁ।

যেতে যেতে থমকে গেল দরজাতে হাত দিয়ে, নিজের আত্মসম্মানবোধ হারকারের অত্যন্ত প্রবল ছিল। দাঁড়িয়ে পড়ে করোনারকে প্রশ্ন করলো—

যে বইটা আপনারা পড়েছিলেন আমার সাক্ষী দেবার সময়, আমার মনে হয় সেটা মরগ্যানের ডায়েরী। কারন আপনারা এটি পড়তে খুব উৎসুক ছিলেন। তাই আমার একথা মনে হয়েছে। আমি কি ডায়েরীটা দেখতে পারি ?

করোনার বললেন—এ বইটা কোন কাজে লাগবে না আপনার এবং এ ব্যাপারে কিছুই আলোকপাত করবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে মৃত ব্যক্তির সবকিছুই এনট্রি করা হয়ে গেছে। এখন এগুলো দেওয়া সম্ভব নয়।

হারকার কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল। সে বেরিয়ে যাবার পর জুরীদের দল আবার ঘরের মধ্যে এসে বসলো। জুরীদের সভাপতি মোমবাতির কাছে গিয়ে বসলো' বুক পকেট থেকে পেনসিল কাগজ বের করে তাদের সম্মিলিত মত স্ব রায় লিখতে শুরু করলেন। লেখা শেষ করে সবাইকে দিয়ে সেটা সই করে নেওয়া হলো।

আমরা জুরীরা সমবেতভাবে এই মত সাব্যস্ত করছি যে, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হিংস্র পাহাড়ী সিংহের আক্রমনে। আমরা সকলেই এ বিষয়ে একমত।

······মরগ্যানের ডায়েরীতে কিছু কিছু আকর্ষণীয় লেখা ছিল যার বৈজ্ঞানিক মূল্য কিছু থাকলেও থাকতে পারে। তার দেহের অনুসন্ধানের সময় এই ডায়েরীটা পাওয়া যায়। করোনার সেটা জুরীদের সামনে উপস্থাপিত করেন নি। কারণ, সম্ভবতঃ উনি মনে করেছিলেন যে এটা জুরীদের খুব কাজে আসবে না। যাই হোক, ডায়েরীর ওপরের পাতাটা ছিঁড়ে গেছে, এলে দিনক্ষণের হিসেব হয়তো বা পাওয়া যাবে না। কিন্তু ডায়েরীর অংশ গুলো সহজেই উদ্ধার করা যায়।

—তীব্র গর্জন করে অর্ধবৃত্তাকারে খানিকক্ষণ ঘুরে সে দৌড়াতে চাইলো তারপর দ্রুত ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। আমার প্রথমে মনে হতো যে ও পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু বাড়ী ফিরে আমার মনে হলো, শাস্তির ভয়ের জন্য এই রকম ঘটেছে।

······একজন কুকুর কি নাক দিয়ে দেখতে পায়?

······বসে বসে আকাশের তারা দেখছিলাম রাত্রে। ওটা প্রতিদিনই ওঠে বাড়ীর পূর্বদিকে। আমার আকাশের তারা দেখতে খুব ভাল লাগতো। বসে বসে দেখছি ·····হঠাৎ আমার সামনে দিয়ে কি একটা যেন চলে গেল,······তারাগুলো হঠাৎ ঢাকা পড়ে গেল। ·····ওগুলো যদি কাছাকাছি থাকতো তাহালে হয়তো আউটলাইনটা বোঝা যেতো। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।···আশ্চর্য! আমার খুবই আতংক লাগলো ব্যাপারটা দেখে!

এরপরের কয়েক হপ্তার পাতা নেই। ছেঁড়া।

সেপ্টেম্বর: ২৭

······আবার ওর উপস্থিতির অনুভূতি বোধ করলাম···প্রতিদিনই করি। আমি প্রতিদিনই ওকে বন্দুক হাতে লক্ষ্য করি। সকালবেলা তাজা পায়ের ছাপ দেখতে পাই।···আমি ঘুমোতে পারি না···ভয়ানক আতঙ্কে ভুগছি। এরকম যদি অনবরত ঘটতে থাকে....আমি পাগল হয়ে যাব। আর এ যদি আমার মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনা হয় তাহলে ধরতে হবে যে আমি পাগল হয়ে গেছি।

অক্টোবর: ৩রা

আমি যাব না কিছুতেই যাব না···এটা আমার বাড়ী···ও আমায় তাড়াতে চাইছে···আমি কাপুরুষ নই। যে কাপুরুষ ঈশ্বর তাকে ঘৃণা করে।

অক্টোবর: ৫ই

আমি এখানে একা থাকতে পারছি না···আমি হারকারকে এখানে

ডেকে পাঠিয়েছি, আমার সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে যাবার জন্য। তার মাথাটা তো পরিষ্কার। সে অন্ততঃ বলতে পারবে যে আমি পাগল হয়ে গেছি না পাগল হব!

অক্টোবর : ৭ই

আমি সেই রহস্য-সমাধান করে ফেলেছি। ওটা আমার কাছে গতরাত্রে এসেছিল। নিজেকে প্রকাশ করেই এসেছিল…কি সোজা… কিন্তু কি ভয়ঙ্কর রকম সোজা।

……শব্দ শুনেও অনেক সময় আমরা শব্দ বুঝতে পারি না। এমন অনেক কম্পাঙ্কের শব্দ আছে যা মানুষের কানে ধরা পড়ে না। কোন মিউজিক্যাল নোটেশন আসে না। ব্যাপারটা বুঝলাম যে আমি বসে বসে কতকগুলো "ব্ল্যাঙ্কবডিকে" লক্ষ্য করে চলে ছিলাম।…ওরা গান গাইছিল। কিচমিচ করে চলে ছিল। হঠাৎ ওরা একসঙ্গে উড়ে চলে গেল…আশ্চর্য। ওরা তো একে অন্যকে দেখতে পাচ্ছিল না কি করে গেল একসঙ্গে! নিশ্চয়ই কোন রকমের অদৃশ্য সংকেত ওদের ভেতরে আছে! আরও লক্ষ্য করলাম একই সঙ্গে অপর দিকের পাহাড় থেকে একদল তিতির পাখী চলে গেল ··

আমার মাথায় খেলে গেল যে অভিজ্ঞ মাঝি অনেক মাইল দূরে থেকেও জলের তলায় কোথায় তিমি আছে তার অস্তিত্ব টের পায়।

সুতরাং যেমন শব্দের মধ্যে আছে তেমনি রংয়ের মধ্যেও আছে Colour spectrum "বর্ণালী"-এর প্রত্যেকের মধ্যেই বৈজ্ঞানিকেরা অ্যাকটিনিক রশ্মি বলে একরকম রশ্মির অবস্থিতি নির্ধারণ করতে পারে। এই একরকমের রশ্মি যা Integral colour 'অদৃশ্য আলোক কণা আলোর মধ্যে গঠন করে এবং আমাদের সাধারণ চোখে অদৃশ্য থাকে ··'

এবং আমি পাগল নই ··এমন রং আছে যা সাদা চোখে দেখতে পাইনা · ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, যা আমায় এত আতঙ্কিত করে তুলেছে… আমায় ভাবিয়ে তুলেছে, তা এই রংয়েরই সৃষ্টি।

এখানেই মরগ্যানের ডায়েরী শেষ।

আধুনিক কালের রহস্য সাহিত্যিকদের মধ্যে **অ্যামবোর্স বিয়ার্স** বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছেন। সারা জীবনে তিনি বিভিন্ন ধাঁচের অসংখ্য রহস্য এবং রোমাঞ্চ গল্প লিখে পাঠক চিত্তকে বার বার সচকিত করেছেন। তাঁর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট হল কর্মময় ও সক্রিয় লিপি কুশলতা। যার সাহায্যে তিনি পাঠক চিত্তকে শেষ অব্দি আকর্ষণ করে রাখেন।

সমকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্য কাহিনীর সম্পাদক এবং বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক অ্যালফ্রেড হিচককের প্রায় সবকটি সংকলনে অ্যামবোর্স বিয়ার্সের গল্প স্থান পেয়েছে।

বর্তমান সংকলনে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই রহস্য সাহিত্যিকের যে গল্পটি সংকলিত হলো তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রহস্যময় জগৎ সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা। এখানেই অ্যামবোর্স বিয়ার্সের বৈশিষ্ট্য। ভূত তাঁর গল্পে বিজ্ঞানসুবাসিত এক অনির্দেশ্য রহস্যের ছায়াঘেরা পরিমণ্ডলের আতঙ্কঘন জীবন্ত এক অস্তিত্ব।

শরৎকালীন ক্রিকেট

—লর্ড ডান্‌সেনি

…অর্থাৎ প্রেতাত্মারা ওকে সম্মানিত অতিথি করে নিয়েছেন।
"না তিনি বলেন, তিনি ভুতদের খেলা দেখতে যান, ওর স্ত্রীর বারণ শোনেন না।"

আমি একদিন রাতে একদা বিখ্যাত ক্রিকেট মাঠে লং ব্যারোর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। গরমের সময় এখনও এখানে ক্রিকেট খেলা হয়, তবে এখন হেমন্ত কাল, তাও আবার রাতের বেলা। জায়গাটা জনশূন্য, শুধু ধূসর কুয়াশা মাঠের একপাশে উইলো গাছের তলায় ঘন অন্ধকারের রহস্য বাড়িয়েছিল, বাড়িয়েছিল হয়ত একটু বেশী করে। কারণ সারা গ্রীষ্মের কর্মক্লান্ত মুখর ব্যস্ত সমস্ত এই মাঠে আজ হেমন্তের নিরব, নিভৃত নিস্তব্ধতা তুলনায় যেন একটু বেশী। গাড়ীর হেডলাইটে দেখতে পেলাম একজন বৃদ্ধ একটা কাঠের বেঞ্চে মাঠের ধারে বসে আছেন। নদীর বুক থেকে উঠে আসা বাতাস শুকনো পাতাগুলোকে নিয়ে খেলা করছে। ঐ জায়গায় বৃদ্ধের উপস্থিতি শূন্যতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল, গাড়ীটা ওকে অতিক্রম করার পর বৃদ্ধ হাততালি দিতে লাগলেন, যেন তিনি শূন্য মাঠের কোন অদৃশ্য খেলাকে উৎসাহিত করছেন।

আমি পরের দিন আমার এক বন্ধুকে কথাটা বললাম, যে লং ব্যারোর কাছাকাছি থাকে।

'ওই, ও বোধহয় বৃদ্ধ মডগার' সে বলল 'সে ঐ মাঠে কাজ করত' রিটায়ার্ড করার পর সে ওখানেই একটা কুঁড়েতে থাকে।'

ওখানে কি করছিল? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সেটাই সমস্যা, এই বয়সে ঠাণ্ডায় কেউ বেরোয়? কিন্তু ওকে বারণ করলে শোনে না।'

'একজন বৃদ্ধ যদি তাতে আনন্দ পান তাহলে আর কি করা যায়।'

'সমস্যাটা অন্য জায়গায়' বৃদ্ধ ভাবেন ওখানে রোজ রাতে খেলা হয়। উনি দেখতে যান।'

'কে খেলে বলে ওর মনে হয়?'

ডব্লিউ বি গ্রেস গান সে উত্তর দিল এইরকম আরো নামকরা খেলোয়াড় ওদের সবাইকে উনি ওখানে খেলতে দেখেছেন। ওদের সবাই মারা গেছেন। আমরা ওকে রাত্রে যাতে না বেরোতে পারে তার ব্যবস্থা করছি।

'উনি কি পছন্দ করবেন?'

'না তিনি বলেন তিনি ভূতেদের খেলা দেখতে যান, ওর স্ত্রীর বারণ শোনেন না।' তিনি খেলার খুঁটিনাটি বর্ণনা দেন, স্কোর কত হল তাও বলেন, ওর ডাক্তার বারন করেছে ওখানে যেতে।'

আমি আর বৃদ্ধকে দেখবো ভাবিনি।

সপ্তাহ খানেক পরে যখন হেমন্তের শীতের কামড়টা আরও একটু বেড়েছিল, আমি আবার রাত্রে ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, বৃদ্ধ ঠিক সেদিনের মত বসে কিছু দেখছেন, বাতাসে শুকনো পাতা উড়ছে! কুয়াশাও ছিল। তাহলে ওরা ওকে আটকে রাখতে পারেনি।

পরেরদিন আমার সেই বন্ধু যার নাম মিডলী তার বাড়ীতে গেলাম, এবং আমার পূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা বললাম।

'চা খেতে খেতে বলা যাবে বোস' মিডলী বলল।

ও বলতে আরম্ভ করল ওকে মানসিক হাসপাতালে নেওয়া গেল না, কারণ ওখানে ভর্তি করার জন্য দুজন ডাক্তারের সার্টিফিকেট দরকার হয়।

আর একজন ডাক্তার যখন আনা হল, উনি আর ভূতের কথা বললেন না। সুতরাং ওকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো সম্ভব হল না।'

একটু থেমে আবার বলল ;

মানসিক হাসপাতালে যাওয়ার অনিচ্ছা নয় বৃদ্ধ ভূতেদের খেলা ছেড়ে কোথাও যাবেন না। তিনি ঐ মাঠে প্রায় পঞ্চাশ বছর কাজ করেছেন, তার আগে ওখানে খেলতেন, তিনি ঐ মাঠ ছেড়ে কিছুতেই যাবেন না।'

'ওকে বোঝানো যেতে পারে' আমি বললাম, আমি চেষ্টা করব, তিনি নিশ্চয়ই ঠাণ্ডায় জমে মারা যেতে চান না।'

'মানুষ মরতে পারে কিন্তু তার পেশাকে ছাড়তে পারে না। অনেক বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, ওতে কোন লাভ হয়নি।'

'তবুও আমি চেষ্টা করব' আমি বললাম,

আমি পরের দিন সূর্য ডোবার ঘণ্টা দুয়েক পরে বাসে করে লং ব্যারোতে গেলাম প্রত্যাশামত তিনি তাঁর বেঞ্চটাতে বসে মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, পাতলা কুয়াশা উইলো গাছের নীচে ঘন হতে শুরু করেছিল।

আমি বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধের পাশে বসে পড়লাম। তিনি তাড়াতাড়ি চারিদিকটা দেখে নিলেন ওঁর কথা অন্য কেউ শুনতে পাবে না এ ব্যাপারে যখন নিশ্চিত হলেন তখন মুখ তুললেন।

'ওরা এই ব্যাট করতে নামছে' তিনি বললেন বাঁদিকে গান ডানদিকের উনি হলেন ডব্লিউ জি।

'হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি' উত্তর দিলাম,

'তুমি ওদের চেন ? জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ।

'হ্যাঁ'

'ওরা মাঝে মাঝেই এখানে খেলে'

'ওদের মাঝে মাঝেই দেখতে পান ? জিজ্ঞেস করলাম।

'যখন ওরা খেলেন।'

'এই কুয়াশা আর ঠাণ্ডায় বসে থাকা ভাল ?

'ওরা যে দিনের বেলায় খেলেন না।'

'আপনার ঠাণ্ডা লাগছে না?'

'না আমি গরম কাপড় চোপড় পরেছি, তাছাড়া খেলা খুব উত্তেজনাকর না হলে আমি দুঘণ্টার বেশী থাকি না'

তিনি কথা থামিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে হাততালি দিলেন। আমি দেখলাম উনি বেশ ভারী ওভার কোট চাপিয়েছেন, ওরা যতটা ভয় করে; ততটা নয়, দু ঘণ্টা বাইরে থাকলে বেশী কিছু ক্ষতি হবেনা। আমি পুরো সময়টা ওঁর সাথে কাটালাম, খেলাটা খুব ভাল হল, উত্তেজনাময়। ডব্লিউ জি জিতলেন, বৃদ্ধ আমাকে খেলার সমস্ত খুঁটিনাটি বর্ণনা দিলেন। আমার মধ্যেও রেডিও শোনার উত্তেজনা এসে গেছল। পরের দিন মিডলীকে বললাম বৃদ্ধের বিশেষ কিছু হবে না, অন্তত শীত না পড়া পর্যন্ত তোমরা বৃদ্ধকে বিরক্ত করো না। শীত পড়া পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বৃদ্ধ শীতের আগেই মারা গেলেন।

মিসেস মডগার আমাদের ঘটনাটা শোনালেন। দু সপ্তাহ পরেই বৃদ্ধের নব্বইতম জন্মদিন পালন করা হল। ঐদিন সন্ধ্যাবেলা তারা ঘরে বসে খাবার খাচ্ছিলেন এবং মদ্য পান করছিলেন। আস্তে আস্তে কুয়াশা জমতে শুরু করছিল। বৃদ্ধ খেতে খেতে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। তারপর হঠাৎ বললেন ওরা অর্থাৎ প্রেতাত্মারা ওকে সম্মানিত সদস্য করে নিয়েছেন' কারণ তিনি নব্বই বছরে পৌঁছে গেছেন তিনি লং ব্যারোব রাতের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সঙ্গী হয়েযাবেন। মডগার আরও বলেছিলেন এটা খুব সম্মানের ব্যাপার কারণ তিনি হচ্ছেন একমাত্র জীবন্ত লোক যাকে রাতের ক্রিকেট খেলোয়াড়রা নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। এবং ওরা আজ রাতে খেলবেন, ডঃ ডব্লিউ জি গ্রেস নিজে তাঁকে আমন্ত্রণ করেছেন। মডগার এই কথা বলার পর মাঠের দিকে রওনা দিলেন, সেদিন তিনি কোন গরম কাপড় ও পরে গেলেন না, তার স্ত্রী তাঁকে বাধা দিতে পারেনি।

তারপর মিসেস মডগার বললেন 'তিনি পুরোন ব্যাট নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মাঠে গিয়ে পীচের একদিক ঝুঁকে ব্যাট চালাতে লাগলেন।

'তিনি দৌড়াচ্ছিলেন? মিডলী জিজ্ঞেস করল, 'না তিনি বাউণ্ডারী করছিলেন মনে হল, তার অন্য প্রান্তের খেলোয়াড় সে যেই হোন না কেন

তিনিও বাউণ্ডারী করছিলেন শুধু। আমার তাই মনে হল, আমি ওখানে সমস্তক্ষণ ছিলাম এবং ওকে বাড়ী যাওয়ার জন্য বলছিলাম উনি আমার কথা শুনেননি, তারপর মিনিটকুড়ি পরে তিনি বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই আর জোরে মেরে বাউণ্ডারী করতে পারছিলেন না, তাই তিনি দৌড়ে রান করতে লাগলেন, আমি ওকে থামাতে পারালাম না। কিছুক্ষণ পরে তিনি তার টুপিটা খুলে মাথা নীচু করে যেন অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। মনে হল তিনি সেঞ্চুরী করেছেন, তারপরেই ঘটনাটা ঘটল। তিনি আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লেন। ঐ বয়সের লোক এত দৌড়াদৌড়ি করতে পারে। আমি দৌড়ে গিয়ে দেখলাম তার নিশ্বাস পড়ছে না ’

আমরা বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। কিন্তু বৃদ্ধের মুখে একটা আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন !

‘আর ওকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না।’ তিনি এবার লং ব্যারোতে ডঃ গ্রেস বা যে কোন লোকের সাথে মনের আনন্দে খেলতে পারবেন।

লর্ড ডান সেনি আধুনিক ভূতের গল্পের লেখক হিসাবে যে খ্যাতি ও যশ অর্জন করেছেন তা যে কোন সাহিত্যিকের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। লেখকের গল্প মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, ঘটনার ঘনঘটায় ও ভাস্বর কারুকার্যে অদ্বিতীয়। তাই লেখক তার গল্পের গঠন ও বুননে তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসরণ না করে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তার ভৌতিক কাহিনী গতানুগতিক অলৌকিক কাহিনীর ভীতি বিহ্বল বর্ণনাকে অতিক্রম করে মানব মনের শান্ত এক ছায়াঘন স্তরে ভীতি, কৌতূহল ও কৌতুক মিশ্রিত এক অস্বাদ্য রস সৃষ্টিতে সক্ষম। লর্ড ডান সেনির গল্পে ভূত কেবল অশরীরী আতঙ্ক নয় এখানে ভূত ছায়া ছায়া এক রক্ত মাংসের প্রাণচঞ্চল উপস্থিতি। এক অবিশ্বাস্য সংবেদনশীল রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

অশরীরী

—রুডইয়ার্ড কিপলিঙ

'...অনুভব করলাম, কে যেন আমার ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করে, বারান্দায় তার ভারী নিঃশ্বাসের আওয়াজ আসে।'

'ইমরে সাহেব' হারিয়ে গেছে।

একদিন কাউকে কোন কিছু না জানিয়ে, খুব সম্ভব কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত, যৌবন ও জীবনের শুরুতে হঠাৎ পৃথিবী থেকে হাওয়া হয়ে গেল। অর্থাৎ যে ছোট্ট ভারতীয় শহরে সে চাকরী করতো সেখানে আর তাকে দেখা গেল না।

নিরুদ্দেশ হওয়ার আগের দিন সে বেঁচে ছিল, ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলে ছিল, কিন্তু পরের দিন সকালে সে উধাও। চারদিক খোঁজ করা হলো, কিন্তু তার দেখা মিললো না। লোকটা বাড়ীতে নেই, সময় মত অফিসে যায় নি, এবং তার কুকুরেটানা গাড়ী রাস্তায় নেই।

এই সমস্ত কারণে এবং যেহেতু তার অনুপস্থিতি অতি অল্প মাত্রায় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনার ক্ষতি করাচ্ছে তাই এই সাম্রাজ্যে অতি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের জন্য থেমে ইমরে সাহেবের কি হয়েছে, তাই নিয়ে অনুসন্ধান চললো। কুয়োয় লোক নামলো, পুকুরে জাল ফেললো,

বারোশোমাইল দূরের বন্দরে এবং স্টেশনে স্টেশনে টেলিগ্রাম পাঠানো হলো। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ। লোকটা হারিয়ে গেছে।

তারপর ভারতীয় সাম্রাজ্যের কাজ আর বন্ধ রইলো না এবং দিনে দিনে ইমলে সাহেবের ব্যাপারটা রহস্য পূর্ণ গল্পে পরিণত হলো। লোকে কলারের টেবিলে বসে এ সম্বন্ধে আলোচনা করে, তারপর একসময় ভুলে যায়। ইমরে সাহেবের বন্দুক, ঘোড়া ও গাড়ী সবচেয়ে বেশী দামে বিক্রি করা হলো। ওর উর্ধতন অফিসার ইমরে সাহেবের মাকে অবিশ্বাস্য একটা চিঠি লিখলেন—ইমরে নিরুদ্দেশ, তার বাংলোটা শূন্য পড়ে আছে।

তিন চারটে মাস খুব গরমের মধ্যে কেটে গেল। তারপর আমার বন্ধু পুলিস অফিসার স্ট্রিকল্যাণ্ড গেটিভ জমিদারের কাছে ইমরের বাংলোটা ভাড়া নিল। ওর জীবন ধারণের ধারাটা অদ্ভুত ধরণের বলে লোকে বলাবলি করতো। স্ট্রিকল্যাণ্ডের বাড়ীতে সর্বদা খাবার জিনিষ থাকতো কিন্তু খাওয়া দাওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে সাইডবোর্ড থেকে ইচ্ছে মত তুলে খেতো, অভ্যাসটা মানুষের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর।

আমার বন্ধুর গেরস্থালী বলতে—ছটা রাইফেল, তিনটে শটগান, ঘোড়ায় চড়ার পাঁচটা রেকাব এবং অনেকগুলো মাহশীর মাছ ধরার ছিপ, শ্যালমন মাছ ধরার জন্য সবচেয়ে বড় যে ছিপ ব্যবহার করা হয় তার চেয়েও বড়। বাংলোর অর্ধেক জায়গা এই সাজ সরঞ্জামগুলো অধিকার করে ছিল। আর বাকী জায়গায় থাকতো স্ট্রিকল্যাণ্ড ও তার কুকুর টিয়েটজেনস।

টিয়েটজেনসের বিশাল চেহারা, দুটো মানুষ খায়, কুকুরটা সেই পরিমান খাবার খায়। ওর জন্ম রামপুরে। কুকুরটা তার নিজের ভাষায় মনিবের সঙ্গে কথা বলে এবং বাইরে ঘুরতে ঘুরতে হার ম্যাজেষ্টি ভারত সম্রাজ্ঞীর অশান্তি আনতে পারে এমন সন্দেহজনক কিছু দেখলেই প্রভুর কাছে খবর দেয়। ফলে ঝামেলা হয় এবং নেটিভদের ফাইন বা কয়েদের শাস্তি হয়।

স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস, টিয়েটজেনস এক পরিচিত প্রেতাত্মা এবং

কাউকে ঘৃণা ও ভয় করলে সে যে সম্মান পায়, কুকুরটা নেটিভদের কাছ থেকে সেই সম্মান পেতো। বাংলোর একটা ঘর, বিছানা, কম্বল, জল, খাওয়া পাত্র কুকুরটাকে দেওয়া হয়েছে।

স্ট্রিকল্যাণ্ডের ঘরে রাতে কেউ ঢুকলে, কুকুরটা তাকে ফেলে দিয়ে চেঁচাতো এবং যতক্ষণ না কেউ আলো আনে ততক্ষণ একনাগাড়ে চেঁচাতো। একবার ও প্রভুর প্রাণ বাঁচিয়ে ছিল। স্ট্রিকল্যাণ্ড স্থানীয় কোন মার্ডারের খোঁজে ফ্রন্টিয়ারে গিয়েছিল। লোকটাকে আন্দামানে পাঠানোর সুযোগ খুঁজছিল স্ট্রিকল্যাণ্ড। লোকটাও তাকে আরও দূরে পাঠাবে বলে জেদ ধরে। তাই ভোররাতের অন্ধকারে দাঁতের মধ্যে একটা ছোরা চেপে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে সাহেবের তাঁবুতে ঢুকেছিল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের কাছে ধরা পড়ে যায় এবং আইনের চোখে অপরাধী প্রমাণ হওয়ায় লোকটার শাস্তি স্বরূপ ফাঁসি হয়। সেদিন থেকে টিয়েটজেনস গলায় রূপোর কলার পরে থাকে এবং তার কম্বলে একটা মোনাগ্রামের ছাপ দেওয়া হয়েছে। কম্বলটা ডবল বুনেটে কাশ্মীরী পশম দিয়ে তৈরী। যাই হোক, আদুরে কুকুর তোল্ট।

টিয়েটজেনস কোনমতেই স্ট্রিকল্যাণ্ডের কাছ থেকে দূরে থাকতে চায় না। একবার তার প্রভুর জ্বর হয়। কি করে প্রভুকে সাহায্য করবে তা সে জানেনা, অথচ অন্য কেউ করে দিলে, তাতেও আপত্তি। অবশেষে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডাক্তার ম্যাজরনট বেগতিক দেখে বন্দুকের বাঁট দিয়ে কুকুরটার মাথায় মারে, ফলে ও অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর ডাক্তার স্ট্রিকল্যাণ্ডকে কুইনিন ইনজেকশন দিতে পারে।

স্ট্রিকল্যাণ্ড ইমরে সাহেবের বাংলো ভাড়া নেওয়ার কিছুদিন পরেই আমাকে একটা কাজে ঐ স্টেশনে যেতে হয়। কোন ক্লাবে জায়গা না পেয়ে আমি ওর বাংলোয় যাই।

নতুন রং করা বাংলো, স্ট্রিকল্যাণ্ড ভাড়া দেওয়ার সময় বাড়িওয়ালা রং করে দিয়েছে। 'আটটা ঘর, ছাদটা খড় দিয়ে ছাওয়া, যাতে বৃষ্টিতে জল না পড়ে এবং ছাদে ঠিক নীচে সীলিং ক্লথ, চুনকাম করা ছাদের মতই দেখতে। ভারতীয় বাংলোগুলো কিভাবে তৈরী জানা না থাকলে ভাবা

যায় না যে ঐ সীলিং ক্লথের খানিকটা ওপরে তিন কোণা খড়ের ছাওয়া ছাদের অন্ধকার পরিবেশে, যেখানে ইঁদুর, বাদুড় পিঁপড়ে প্রভৃতির বাসস্থান।

আমাকে দেখে টিয়েটজেনস একটা আওয়াজ করে, যেন সেণ্টপলস গির্জার ঘণ্টাধ্বনি, কাঁধে থাবা রেখে জানালো—আমাকে দেখে ও খুশী। স্ট্রিকল্যাণ্ড খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের কাজে চলে গেল।

চারিদিকে বর্ষাকালের বিশ্রী ভ্যাপসা গরম। একটুও হাওয়ার লেশ নেই, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বর্শার মত মাটিতে পড়ছে। যেখানে জল ছিটকে উঠছে সেখানটা নীল কুয়াশার মত দেখাচ্ছে। জলের মধ্যে চুপ করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে বাঁশঝাড়, আতাগাছ, পয়েনসেটিভা আর আমগাছগুলো। বাগানের বেড়ার ঝোপ থেকে ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে।

আলো নিভে আসার একটু আগে আমি পেছনের বারান্দায় বসে আছি, কানে ভেসে আসছে জলের শব্দ নীরবে ঘামাচি মারছি। টিয়েটজেনস আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, ওর আজ মেজাজটা বিগড়ে আছে। চা খাবার সময় ওকে একটা বিস্কুট দিলাম। পেছনে ঘরগুলোতে আলো নেই। ভেতরের ঘরে স্ট্রিকল্যাণ্ডের রেকাব আর বন্দুকে তেলের গন্ধ, ঢুকতে ইচ্ছা করছে না।

অন্ধকারের মধ্যে আমার চাকর সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর গায়ের মসলিন জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে লেগে আছে জানালো, কে একজন ভদ্রলোক এসেছেন, মনে হয় কারো সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। ওকে আলো আনতে বলে আমি ড্রইং রুমে ঢুকলাম।

মনে হয় জানালার বাইরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আলো আনতে দেখা গেল, কেউ কোথাও নেই, কেবল মাটিতে বৃষ্টির ফোঁটা আর সোঁদা গন্ধ। এর মধ্যেই টিয়েটজেনস বৃষ্টির মধ্যে বাইরে চলে গেছে, কিছুতেই আসবেনা। অনেক কষ্টে চিনি লাগানো বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে ওকে ভেতরে আনা হলো।

স্ট্রিকল্যাণ্ড বাড়ী ফিরে এলো, জলে ভিজে একেবারে চান করে উঠেছে। জানতে চাইলো কেউ এসেছিল কিনা।

আমি জানালাম যে কেউ এসেছে বলে ভুল খবর দিয়ে আমার চাকর আমাকে ড্রইংরুমে ডেকে আনে কিংবা কোন লোকের হয়তো স্ট্রিকল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে এসে পরে আর সাহসে না কুলোনোয় পালিয়ে গেছে।

স্ট্রিকল্যাণ্ড এ প্রসঙ্গে আর কোনো সাড়া না দিয়ে ডিনারের অর্ডার দিল।

রাত নটা, আমরা শুতে গেলাম। টিয়েটজেনস টেবিলের নীচে শুয়েছিল। স্ট্রিকল্যাণ্ডকে নিজের ঘরে ঢুকতে দেখে ও উঠে বারান্দায় শুতে গেলো। প্রভুর ঘরের পাশেই ওর সাজানো গোছানো ঘর, কিন্তু কুকুরটা তার নির্দিষ্ট ঘরে না গিয়ে বারান্দায় শুয়ে গেলো। এ ব্যাপার দেখে আমি অবাক হলাম। কারো বিয়ে করা বউ যদি বৃষ্টির মধ্যে ঘর ছেড়ে বারান্দায় শুতে যেতো, তাহলেও আমি এতটা অবাক হতাম না। কিন্তু টিয়েটজেনস কুকুর এবং প্রাণী হিসেবে নিশ্চয়ই মেয়েমানুষের থেকে সেরা।

আমি মনে করেছিলাম, স্ট্রিকল্যাণ্ড কুকুরটাকে চাবুক মারবে। কিন্তু স্ট্রিকল্যাণ্ড হাসলো পারিবারিক ট্রাজেডির কথা বলার সময় লোকে যেমন অদ্ভুত হাসি হাসে, ঠিক সেইভাবে হেসে বললো—এখানে আসার পর থেকে ও বাইরেশুচ্ছে, আপত্তি করোনা, যেতে দাও।

যেহেতু ওটি স্ট্রিকল্যাণ্ডের কুকুর, তাই এ নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না। তবে এই রকম অবহেলা পেয়ে বন্ধুর মনের অবস্থাটা অনুমানে বুঝলাম টিয়েটজেনস বারান্দায় আবার জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ঝোড়ো হাওয়ায় ঢেউয়ের উপর ঢেউ এসে খড়ে ছাওয়া ছাদে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। কাঠের দরজায় ডিম ছুঁড়ে মারলে হলুদ কুসুম যেমন ছিটকে যায়, ঠিক তেমনি ভাবে বিদ্যুৎ ছিটকে পড়ছে আকাশের গায়ে। তবে বিদ্যুতের আলো হলুদ নয়, হাল্কা নীল। জানলার বাঁশের পাতার তৈরী মেরাপের বাইরে কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখে

ঘুম নেই, পিঠের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। পাগুলো দড়ির মত টান টান।

বজ্রের শব্দে মাঝে মাঝে আমার চোখ বুজে আসছে কিন্তু মনে হয় আমার নাম ধরে কে যেন ডাকছে. কিন্তু তার গলার স্বর ফিসফিস আওয়াজের মত, অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। একসময় বজ্রবিদ্যুৎ থেমে গিয়ে আকাশে চাঁদ ওঠে। টিয়েটজেনস চাঁদের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে গর্জন করে।

অনুভব করলাম, কে যেন আমার ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করে, বাড়ীর মধ্যে হেঁটে বেড়ায়, বারান্দায় তার ভারী নিঃশ্বাসের আওয়াজ আসে। ঠিক যখন আমার ঘুম ভেঙে আসছে আমি ছাদে কিংবা দরজায় কারো ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনতে পাই।

মনের সন্দেহ দূর করার জন্য আমি ছুটে গেলান স্ট্রিকল্যাণ্ডের ঘরে। জানতে চাইলাম, সে আমাকে ডাকছিল কিনা। অর্ধেক পোষাক পরা অবস্থায় পাইপ মুখে দিয়ে ষ্ট্রিকল্যাণ্ড বিছানায় শুয়ে আছে।

—আমি জানতাম, তুমি আসবে, ষ্ট্রিকল্যাণ্ড বললেন। আমি কি আজকাল বাড়ীর এদিক ওদিক ঘুরে বেডাচ্ছি।

আমি উত্তরে বললাম—হ্যাঁ, স্টিকল্যাণ্ড কখনও ড্রইংরুমে, কখনও স্মোকিংরুমে, কখনও বা অন্যত্র রাত দুপুরে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার বন্ধু হেসে উঠলো এবং আমাকে শুতে যেতে বললো।

ফিরে এলাম নিজের ঘরে, সকাল পর্যন্ত ঘুমোলাম। কিন্তু স্বপ্নে ও জাগরণের মধ্যে আমার বার বার মনে হয়েছে যেন কে আমাকে ডাকছে, তার খুব প্রয়োজন আমাকে, যেন কার প্রয়োজন না মিটিয়ে আমি অবিচার করছি। কিন্তু লোকটা কে, সে কি চায়, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। কিন্তু ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে, ফিস ফিস করতে করতে দরজার কড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে লুকিয়ে ঘরে যেতে যেতে সেই ছাড়া শরীরী যেন আমার আলস্য বা শৈথিল্যের জন্যে অনুযোগ জানাচ্ছে এবং আধো ঘুম, আধো জাগরণের ভৌতিক—।

মধ্যে শুনতে পাচ্ছি বাগানের বৃষ্টির শব্দ ও বারান্দায় টিয়েটজেনসের চাপা গর্জন।

ঐ ভুতুড়ে বাংলোয় আমি দুদিন ছিলাম। আমার বন্ধু প্রত্যহ অফিসে চলে যেতো। ঐ বাংলোতে আট দশ ঘণ্টা টিয়েটজেনসের সঙ্গে সময় কাটাতে হতো। আলো যতক্ষণ থাকতো ততক্ষণ ভালো, শান্তিতেই কাটাতাম। কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেলেই বারান্দায় বেরিয়ে আসতাম। দুজনে জড়াজড়ি করে বসে থাকতাম।

আপাত দৃষ্টিতে দেখলে, বাংলোতে আমরা দুজন ছাড়া কেউ নেই। কিন্তু সারাদিন এক অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করলাম, যার সঙ্গে আমি ঝামেলা করতে চাই না। আমি সেই প্রেতচ্ছায়াকে কোনদিন চোখে দেখিনি কিন্তু সে চলে যাওয়ার পর ঘরের পর্দায় কাঁপন আমার নজর এড়াতো না। সে চেয়ার থেকে গেলে বাঁশের চেয়ারের বিশ্রী আওয়াজ কানে আসতো। ড্রইং রুমে বই আনতে ঢুকলে, আমি কতক্ষণে বেরুবো সেই আশায় কেউ বারান্দায় অপেক্ষা করছে। গোধূলি রহস্য আরও বাড়িয়ে দেয়।

কুকুর টিয়েটজেনস লোম খাড়া করে অন্ধকার ঘরের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আমার চোখে অদৃশ্য কোন ছায়া মানুষের গতিবিধি অনুসরণ করে। আমার চাকর এসে আলো জ্বাললে তবে টিয়েট-জেনস আমাকে অনুসরণ করে ঘরে ঢোকে। কিন্তু তখনও সে সতর্ক হয়ে থাকতো এবং তার দৃষ্টি থাকতো আমার পেছনে অদৃশ্য কোন ছায়া মানুষের দিকে। কুকুর সঙ্গী হিসেবে আনন্দদায়ক, এ ধারনাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে।

অবশেষে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো। স্ট্রিকল্যাণ্ডকে সম্ভব মত ঠাণ্ডা মেজাজে বোঝালাম যে যদিও তার আতিথেয়তা আমার পছন্দ, তার বন্দুক ও মাছ ধরা ছিপগুলোও আমার পছন্দ, তবুও এই বাং-লোর পরিবেশ আমার ভালো লাগছে না এবং সেই কারনেই আমি এখন ক্লাবেই থাকবো।

স্ট্রিকল্যাণ্ড ক্লান্ত হাসি হেসে বললো—এখানেই থাকো। কি

ব্যাপার, দেখাই যাক না। এই বাংলোয় আসার পর থেকে ব্যাপারটা আমার নজরে পড়ছে। টিয়েটজেনস আমাকে ছেড়ে গেছে, তুমিও যেতে চাও? এর আগে আমি একটা বিধর্মী দেবমূর্তির ব্যাপারে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় বার সেরকম অভিজ্ঞতা অর্জনের ইচ্ছে আমার নেই। সাধারণ লোকে যেভাবে ডিনার খায়, সে তেমনি স্বাভাবিক ভাবে ঝামেলায় পড়ে।

ডিনারের পরে ওকে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে বললাম যে যদিও আমি ওকে খুবই পছন্দ করি এবং দিনের বেলা ওর সঙ্গে দেখা হলে যদিও আমি খুবই খুশী হবো ; ওর বাংলোয় রাত কাটা-বার এতটুকুও ইচ্ছে আমার নেই। এই সময় টিয়েটজেনস ভূতের ভয়ে বারান্দায় চলে গেছে।

—খুবই স্বাভাবিক' ছাদের দিকে তাকিয়ে স্ট্রিকল্যাণ্ড বলে। ঐ দেখো, দেয়াল ও ছাদের নীচে সীলিং ক্লথের মধ্যে বাদামী রঙের দুটো সাপের লেজ দেখা যাচ্ছে। ল্যাম্পের আলোয় সাপ দু'টার বিরাট ছায়া, সাপ দেখলে আমার ভয় ও ঘেন্না হয়। কারণ সাপের চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, ওরা মানুষের ধ্বংসের রহস্য জানে এবং নন্দন কানন থেকে যখন আদম বেরিয়ে আসে, তখন শয়তান মানুষের উদ্দেশ্যে যে ঘৃণা অনুভব করেছিল, সাপের চোখে সেই একই দৃষ্টি। এছাড়া সাপ কামড়ালে মৃত্যু অবধারিত।

—ছাদটা নতুন করে ছাওয়া দরকার। আমি বললাম, মাছধরা ছিপটা দিয়ে ওদের টেনে নামাচ্ছি। না না, ওতে হবে না, ওরা ছাদের বীমে লুকিয়ে পড়বে। আমি ছাদে উঠে ওদের খুঁচিয়ে নামাচ্ছি। তুমি রড হাতে তৈরী থাকো, নামলেই পিঠে মারবে।

মালীর ব্যবহৃত মইটা বারান্দায় ছিল। সেটা টেনে নিয়ে এসে ঘরের দেওয়ালে লাগালো স্ট্রিকল্যাণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে সাপের লেজগুলো গুটিয়ে গেল, আর দেখা গেল না। চটের মত সীলিং ক্লথের আড়ালে ওদের দীঘল শরীরের খস্ খস্ শব্দ শুনতে পাওয়া গেল।

সে ল্যাম্প হাতে মই বেয়ে উঠতে থাকে। আমি ওকে সীলিং ক্লথ ও ছাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাপ খোঁজার বিপদ এবং সীলিং ক্লথ ছিঁড়ে বাড়ীওয়ালার সম্পত্তি নষ্ট করার অযৌক্তিকতা বোঝাবার চেষ্টা করি।

—ননসেন্স। স্ট্রিকল্যাণ্ড বলে। ইটগুলো সাপের পক্ষে এখন ভীষণ ঠাণ্ডা, ওরা গরম খুঁজছে। ঘরটা গরম। তাই ওরা কাপড়ের আড়ালে দেওয়ালের ধারে লুকোবে।

স্ট্রিকল্যাণ্ড দেয়ালের কার্নিস থেকে সীলিং ক্লথ ছেঁড়ে। তার সেই ফাঁক দিয়ে ছাদের বীমগুলের মধ্যে চোখ রাখে। হাতে রড নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে আমি অপেক্ষা করছি, কেননা বলা যায় না, কখন ছাদ থেকে কি আমার মাথার ওপরে নামবে।

—হুঁ, ছাদে স্ট্রিকল্যাণ্ডের ভারী কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ছাদ আর সীলিং কলমের মাঝখানে আর একটা ঘরের মত জায়গা আছে। সেখানে উঁকি মেরে স্ট্রীকল্যাণ্ড চেঁচিয়ে ওঠে—বাই জোভ এখানে কে যেন রয়েছে।

সাপ? আমি নীচ থেকে প্রশ্ন করি।

- না, মৃতদেহ। ছিপটা দাও তো, খুটিয়ে দেখি ওটা ছাদের বড় বীমায়ে পড়ে আছে।

আমি কথামত ছিপ তুলে দিই।

—পেঁচার বাসা, সাপের আড্ডা, ছিপ দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে স্ট্রিকল্যাণ্ড বলে, যে কেউ হওনা কেন, বেরিয়ে এসো। হ্যাঁ, মাথাটা বেরিয়েছে, এবার নীচে পড়েছে।

ঘরের ঠিক মাঝখানের সীলিং ক্লথটা ভারী কিছু পড়ার দরুন ঝুলে পড়ায় আমি তাড়াতাড়ি ল্যাম্পটা সরিয়ে নিলাম। সীলিং ক্লথ আর্তচীৎকার করে দেয়াল থেকে আলগা হয়ে এলো, ফাটলো, দুললো, ফাঁক হয়ে গেল। তারপর টেবিলের ওপর একটা কিছু এসে পড়লো, আমার ঐ দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না।

ষ্ট্রিকল্যাণ্ড মই থেকে নেমে এলো, আমার পাশে দাঁড়ালো। সে একটাও কথা না বলে টেবিল ক্লথটা তুলে লাশটা চাপা দিলো।

খুব সম্ভব, আমার বন্ধু ইমরের মৃতদেহ। লাশ ঢাকা টেবিল ক্লথটা ততক্ষণে একটু নড়ে ওঠায় লক্ষ্য করলো এক সাপ বেরিয়ে আসছে, ষ্ট্রিকল্যাণ্ড তার ছিপের বাঁট দিয়ে সাপটাকে আঘাত করতেই ওর ছিপটি ভেঙ্গে গেল। আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল, আমি কিছু বললাম না। যাই হোক, কাপড়ের নীচে আর কোন জীবনের অস্তিত্ব নেই।

—সত্যিই কি ইমরে?

আমি প্রমাণ করলাম।

—হ্যাঁ, ইমরে। ওর গলাটা এককান থেকে অন্য কান পর্যন্ত দুফাঁক করে কাটা।

তারপর আমরা একসঙ্গে বলে উঠি—তাই ওর প্রেতাত্মা ফিসফিস করে সারা ঘরে ঘুরে বেড়াতো।

কুকুর টিয়েটজেস্‌ন ততক্ষণে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ঘরে চলে এসেছে। সীলিং ক্লথ ছিঁড়ে টেবিল পর্যন্ত ঝুলছে, ঘরে একটুও পা রাখার জায়গা নেই। কুকুরটা বসে পড়েছে।

ব্যাপারটা বেগতিক। কেউ মরার জন্যে বাংলোর ছাদে ওঠে না এবং নিজেকে সীলিং ক্লথ দিয়ে চেপে রাখে না, তাহলে এখন প্রশ্ন হলো—কে ইমরেকে খুন করলো?

ষ্ট্রিকল্যাণ্ড যখন এই বাংলো ভাড়া নেয়; তখন ইমরের চাকর-বাকরদেরও নিয়েছে। ইমরে নির্দোষ, ঝুট ঝামেলায় থাকতো না, তাই না? যদি সব চাকর গুলোকে একসঙ্গে ডেকে জবাবদিহি করি, তাহলে সবাই ভিড় করে আর্যদের ঢঙে রাশি রাশি মিথ্যে কথা বলবে। আবার একজন একজন করে ডাকলে ওরা ছুটে গিয়ে বন্ধুদের জানাবে।

বাইরে কাশির শব্দ, স্ট্রিকল্যাণ্ডের দেহরক্ষী বাহাদুর খানের ঘুম ভেঙেছে।

—ভেতরে এসো। খুব গরম, তাই না?

বাহাদুর খান মুসলমান দেহরক্ষী; ছ'ফুট লম্বা, মাথায় তার সবুজ পাগড়ী।

—বাহাদুর খান, কাল আমি শিকারে যাবো। স্ট্রীকল্যাণ্ড বলে, ঐ ছোট্ট রাইফেল আর গুলির কেসটা নিয়ে এসো।

৩৬০ এক্সপ্রেস রাইফেলের ব্রীচে গুলি ভরলো স্ট্রীকল্যাণ্ড। তারপর বাহাদুর খানের দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করলো—বাহাদুর খান, ইমরে সাহেব হঠাৎ ইউরোপে চলে গেছেন, তাই না?

—হঁ্যা সাহেব, লোকমুখে শুনেছি।

—উনি ফিরলে তুমি আবার ওঁর কাছে চাকরী করবে, বুঝেছো?

—নিশ্চয়ই। উনি আমাদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করতেন, সাহেব।

—কিন্তু বাহাদুর খান, ইমরে সাহেব হঠাৎ ইউরোপে চলে গেলেন, ব্যাপারটা কিরকম আশ্চর্য নয়?

– সাহেব, সাদা মানুষদের নিয়ম কানুন আমরা কি বুঝি?

—খুব কম বোঝ। তবে শীগগিরই আরও বুঝবে। ইমরে সাহেব, তাঁর দীর্ঘ যাত্রা সমাপ্ত করে এসে পাশের ঘরে ওঁর চাকরের জন্য অপেক্ষা করছেন।

স্ট্রীকল্যাণ্ডের লোডেড রাইফেলের নল বাহাদুর খানের প্রশস্ত বুকের মুখোমুখি। তার হাতে ল্যাম্প, পেছনে রাইফেল দিয়ে খোঁচাচ্ছে। দুজনে পাশের ঘরে ঢুকলো। ছাদের ছেঁড়া সীলিং ক্লথ, মেঝেয় আধমরা সাপ ও সব শেষে ছাইয়ের মত সাদা মুখের টেবিল ক্লথে মোড়া ইমরের লাশটা লক্ষ্য করলো বাহাদুর।

—দেখতে পেয়েছো? প্রশ্ন করলো স্ট্রীকল্যাণ্ড।

—হঁ্যা, দেখেছি। আমি এখন সাদা মানুষের হাতে পড়েছি, কিছু করার নেই। হুজুর কি করতে চান?

—আমার ইচ্ছে, তোমাকে এক মাসের মধ্যে ফাঁসিতে ঝোলাবো, বুঝেছো ?

—আমার অপরাধ, ইমরে সাহেবকে খুন করেছি বলে ? না, সাহেব, লক্ষ্য করুন, ইমরে সাহেব আমার চার বছরের ছেলেটাকে নজর দিয়েছিলেন। দশ দিনের জ্বরে ভুগে বাছা আমার মারা যায়।

—ইমরে সাহেব কি বলেছিলেন ?

উনি ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে করতে বললেন, ছেলেটা খুব সুন্দর। ওঁর ডাকিনী বিদ্যার প্রবাহে ছেলেটা জ্বরে ভুগে মারা গেল। যখন রাতে সাহেব ঘুমিয়েছিলেন, আমি তখন তাঁকে খুন করি।

তারপর কুকুরটার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে—শয়তানের অনুচররাই শুধু জানতে পারে, আমি কি করেছি।

—তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়, তবে দড়ি দিয়ে বাঁশের সঙ্গে লাশটা বেঁধে রাখেনি বলে তুমি এখন দড়িতে ঝুলবে, আর্দালি।

—তাহলে আমার ফাঁসি হবে ?

—সূর্য যেমন পূর্ব দিকে ওঠে, জল যেমন গড়িয়ে যায়, দুটোই সত্যি, তেমনই—

—না, সাহেব, দেখুন আমি মরেই গেছি !

বাহাদুর পা তুলে দেখলো। আধমরা সাপটা ওর পায়ের কড়ে আঙুল কামড়ে ধরে আছে—মরণ কাপড়।

—সাহেব, জমিদার বংশে আমার জন্ম। আমি ফাঁসিতে ঝুলবো, লোকে আমাকে দেখে হাসবে, এটা আমার পক্ষে লজ্জাকর। তাই আমি এইভাবে আত্মহত্যা করছি। ভুলে যাবেন না, সাহেবের সার্টগুলো সব গুণে রাখা হয়েছে এবং তাঁর বেসিনে একটু করে সাবান রাখা আছে।

—ইমরে সাহেব, তাঁর ডাকিনী বিদ্যার প্রবাহে আমার ছেলেকে খুন করেছিল। তাই আমিও তাঁকে খুন করেছি। এতে অন্যায় কি আছে ? তোমরা আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাইছো কেন ?

—আমি আমার সম্মান রাখতে পেরেছি এবং আমি মরে যাচ্ছি।

এক ঘণ্টার মধ্যে সাপের বিষ ছড়িয়ে পড়লো বাহাদুর খানের রক্তে এবং সে মারা গেল।

পুলিশ তার ও ইমরে সাহেবের লাশটা নিয়ে চলে গেল।

—একেই বলে উনবিংশ শতাব্দী। স্টীকল্যাণ্ড মুখ খোলে।

—ইমরে ভুল করেছিল, আমি তার প্রশ্নের জবাব দিই। প্রাচ্যের চিন্তাধারা না বোঝা এবং ঋতু পরিবর্তনের জন্যে বাচ্ছাছেলের জ্বর হওয়ার ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগের ফল। চার বছর ধরে ওর কাছে বাহাদুর খান চাকুরী করেছে।

হরিণ শিকারী কুকুর টিয়েটজেনস এবার শান্ত, সে নিজের ঘরে ফিরে এসেছে, নিজের কম্বলের নীচের বিছানায় শুয়ে পড়েছে। পাশের শূন্য ঘরে ছিঁড়ে পড়া সীলিং ক্লথটা টেবিল ক্লথের উপর নুয়ে পড়েছে।

আমার চাকরও চার বছর আমার কাছে কাজ করেছে। সে এখন আমার বুট খুলছে

তুমি কি এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু বুঝে ছিলে? সে অশরীরী আত্মা গোধূলি আলোয় সুবিচারের আশায় বাংলোয় ঘুরে বেড়াতো—

—চুপ করুন সাহেব, বুটটা আমাকে খুলতে দিন।

বিশ্বসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য রুডইয়ার্ড কিপলিং ১৯০৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন বৃটিশ, দীর্ঘসাহিত্য জীবনে নানা ধরনের কবিতা, উপন্যাস ও বিভিন্ন ধরনের রম্য রচনা, শিকার কাহিনী, ভৌতিক গল্প, শিশুদের উপযোগী ব্যালার্ড ইত্যাদি রচনা করেছেন। তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ কেটেছে আমাদের ভারতবর্ষে এবং বেশ কিছু দিন তিনি ছিলেন কলকাতা শহরের বাসিন্দা। আফ্রিকায় নানা সামরিক পদেও ব্রত ছিলেন দীর্ঘকাল।

তাই অনিবার্যভাবে তাঁর লেখনীতে সে যুগের বৃটিশ নাগরিক ও তাঁদের বিচিত্র সুন্দর জীবনের প্রতি ছবি দেখা যায়। এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত অশরীরী গল্পের মধ্যে কিপলিং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীর মধ্যে কিভাবে ভৌতিক তন্ময়তা জন্ম নিয়েছে তার বিশদ ছবি এঁকেছেন। লেখাটিকে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভৌতিক গল্প বলা যেতে পারে।

রুডিয়ার্ড কিপলিং উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে আধুনিক ছোট গল্পের বিশেষ করে ভৌতিক কাহিনীর এক উজ্জ্বল ধারা সৃষ্টি করেন। তাঁর ব্যক্তিগত বেদনা বিদ্ধ্ত যুদ্ধ কাহিনীগুলিও বিশ্বসাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ।

ভূতের গল্প

—হেনরী কেন

...সে মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এসেছে এবং সে যে পোষাকেই মারা গিয়েছিল সেই পোষাকেই ফিরে এসেছে।

আমি ভূত ফূত বিশ্বাস করি না।...

হ্যাঁ যতই বলুন ভূত বলে কিছু নেই একথা আমি অনবরত বলবো। কারণ ভূতের ব্যাপারে আমার মন কিছুতেই সেই একঘেয়ে ব্যাখ্যা মেনে নিতে রাজি নয়। আমি চাই অন্য কোন ব্যাখ্যা। যা অন্ততঃ কিছুটা যুক্তিসঙ্গত।

হ্যালোসিনেসন...অপরাধ প্রবনতাবোধ...যা খুশী ব্যাখ্যা দিলেই তো হয় না।

ওঃ হো! আমার পরিচয়টা বোধ হয় দেওয়া হয়ে উঠেনি। আমি মনস্তাত্বিক নই।

আপনারা আমাকে কি মনস্তাত্বিক ভাবছেন?

না, না। ভুল করছেন। আমি নিতান্তই একজন বেসরকারী গোয়েন্দা। তাই যুক্তি ছাড়া কিছুতেই ঐসব, যাকে বলে অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের গল্প মাথাতেও ঢোকে না। অনেকে হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন না।

কি আর করা যাবে।

তবু একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ঘটনার শুরু হয়েছিল কোন উজ্জ্বল শীতে, বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে।

আমার সেক্রেটারী যেই মিস সিলভিয়াট্রয়কে আমার কাছে নিয়ে এল সেই থেকে এই ঘটনার সূত্রপাত।

„মিস সিলভিয়াট্রয় !" সেক্রেটারী পরিচয় দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমার জবাব—আমি পিটার চেম্বার্স। বসুন। মুখ তুলে মেয়েটাকে দেখলাম। ত্রিশ বছরের একটি সুন্দরী মহিলা বলা যায়। গাঢ় রংয়ের বাদামী চোখ, লাল চুলে এক অপূর্ব সৌন্দর্য উদ্ভাসিত। কেবলমাত্র ওর অভিব্যাক্তিতে কোথায় যেন খুঁত আছে। মুখে যে ভঙ্গিমা তাতে মনে হয় ওর ওপর কোন কিছু ভর করেছে।

চোখ দুটো সুদূরে বিলীন। ও যেন আর ওর সত্তার মধ্যে নেই।

ওকে আবার বললাম—কি হলো, বসুন !

মেয়েটি বসলো—অশেষ ধন্যবাদ। ওর কণ্ঠস্বর বেশ সুরেলা, অনেকটা পেশাদারী গায়িকার মত। মেয়েটির গায়ে একটা লাল উলের কোট, হাতে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ।

মেয়েটি চামড়ার ব্যাগ খুলে তিনটে একশো ডলারের নোট আমার টেবিলের উপর রাখলো।

আমি হতভম্ব হলেও তা স্পর্শ করলাম না।

মেয়েটি ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করলো--কি, এতে হবে না ?

—ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। আমি ওকে জানালাম।

মেয়েটি শুধালো—তাহলে এমনভাবে এর দিকে চেয়ে আছেন কেন ?

আমি ওকে জানালাম—টাকাটা বেশী হল কি কম হল, সেটার চাইতেও যেটা বড় প্রশ্ন তা হল আপনি কেন হঠাৎ আমাকে টাকা দিচ্ছেন।

—কেন, আপনার দক্ষিণা। মেয়েটি যেন বিস্মিতা।

আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—দক্ষিণা কি লোকে শুধু শুধু নেয় ? কাজ করে তবে তা নেয়। আমার কাজটা কি তাইতো এখনও জানলাম না।

মেয়েটির জবাব—ভূতের সঙ্গে থাকা।

আমি বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম—কি বললেন ?

মেয়েটি এবার প্রায় ভেঙ্গে পড়লো—বিশ্বাস করুন মিঃ চেম্বার্স, একটা ভূত—নিঃসন্দেহে ভূত। সে একজনকে হত্যা করেছে অন্য দুজনকে খুঁজছে খুন করবে বলে।

আমি সিগারেট ধরিয়ে বললাম—আপনি ভুল লোকের কাছে এসেছেন মিস ট্রয়। ভূতের সমস্যা আমার আওতায় পড়ে না। আপনি পুলিশের কাছে যান না। পুলিশ এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করবে।

মিস ট্রয় জবাব দিলেন—পুলিশের কাছে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—কেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

মেয়েটি জবাব দিল—কারণ আমি যদি পুলিশকে জানাই তাহলে পুরো ঘটনা আমাকে তাদের জানাতে হবে। কারণ আমি...আর... আমার দুভাই খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে যেতে পারি।

কিছুক্ষণ বিরতি। আমি ধূমপানে ব্যাপৃত থাকলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি বললাম—আপনি কি আমাকে গল্পটি বলতে ইচ্ছুক?

মেয়েটি বললো, হ্যাঁ আপনাকে বলবো।

আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম—আমাকে বললে আপনাদের অভিযুক্ত...

মেয়েটি বাধা দিয়ে বললো—না, না। আমি বলবো অন্ততঃ একটা কিছু করা দরকার...আমার আশা ··আপনি আমায় সাহায্য করবেন। কিন্তু যদি পুলিশে প্রকাশ করেন তবে আমি তা সরাসরি অস্বীকার করবো। আমি অস্বীকার করলে কারও ক্ষমতা হবে না আমাদের অভিযুক্ত করার।

ক্রমশঃ ব্যাপারটার ভেতরে রহস্যের আমেজ পাচ্ছিলাম। সুতরাং এটা আমার বিভাগের মধ্যেই পড়ে গেল। মিস ট্রয়কে বললাম, ঠিক আছে শোনা যাক আপনার কাহিনী।

মেয়েটি সুরু করলো, আজ থেকে একবছর আগের কথা, যখন থেকে এই রহস্যের সূত্রপাত। আমাদের পরিবারের লোক সংখ্যা চারজন। আমার তিনভাই আর আমি নিজে। আমার বড় ভাই

অ্যাডামের বয়স সবচেয়ে বেশী। ও মারা যায় পঞ্চাশ বছরে। যোসেফের বয়েস ছিল ছত্রিশ।

—ছিল বলছেন কেন ? মাঝে বাধা দিয়ে বললাম।

মেয়েটি বললো—যোসেফ ছত্রিশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করে। মনে হয় আত্মহত্যা করেছিল হপ্তা তিনেক আগে।

আমি বললাম—আমি দুঃখিত।

মেয়েটি গল্পে ফিরে এল। পরের ভাই সিমনের বত্রিশ বছর বয়েস, তারপর আমি! আমার বয়স্ উনত্রিশ। অ্যাডামের লক্ষ্য ছিল টাকা আয় করার দিকেই। সে বিয়ে করেনি। টাকাই ওর ধ্যান জ্ঞান। এদিকে আমাদের অন্যান্যদের মধ্যে অর্থের অভাব ছিল। যোসেফ জুতোর দোকানের সেলসম্যান। সিমন ওষুধের দোকানে কেরাণী গিরি করতো, আর আমি নাইট ক্লাবে প্রদর্শনী দেখাতাম। বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী ম্যাজিক, হিপনোটিজম, ভেনটিকুইলোজিম্ ...এই ধরনের ব্যাপার দেখাই আর কি!

আমি প্রশ্ন করলাম—অ্যাডাম কি করতো ?

ট্রয় বলতে লাগলো—অ্যাডাম শেয়ার মার্কেটে ব্রোকারি করতো। পয়সাও প্রচুর করেছিল; তবে আমাদের ভয়ঙ্কর বিপদ না হলে কখনও সাহায্য করতো না। বদলে উপদেশ বা সমালোচনার ঝুরি উপহার দিত। যদিও লোকটা খারাপ ছিল না কিন্তু ওর দ্বারা আমরা কখনও উপকৃত হইনি।

আমি বললাম—এবার ওর উইল সম্বন্ধে কিছু বলুন।

ট্রয় সবিস্ময়ে শুধলো; কিসের উইল ?

আমার জবাব—প্রত্যেকটা মানুষই তো মৃত্যুর আগে তার সম্পত্তি তার ইচ্ছে অনুযায়ী ভাগ করে দেয়। অ্যাডাম তেমন কিছু করেনি ?

—নিশ্চয়ই। মেয়েটি বললো। একবার অ্যাডাম স্টক মার্কেটে একটা প্রচুর টাকার দাঁও মেরে ঠিক করলো যে আমরা সবাই মিলে একটু আনন্দ করতে ভারমন্টে যাবো। আমরা সব ব্যবস্থা করলাম। তারপর সবাই মিলে মাউনটেন ফিলিংটনে একটা লজে গেলাম।

একটু কেঁপে ও নীরব হয়ে গেল। একটু পরে ফের বলতে শুরু করলো, আমি ঠিক বলতে পারবো না কেমন করে এর সূচনা হল। এমন হতে পারে যে অপরাধ গুপ্ত বিষের মত আমাদের ভেতরে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু জোসেফই প্রথম এই কথাটা বলেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলেছিস ?

—যোসেফ বলেছিল অ্যাডামকে আমাদের সঙ্গ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে। আমি কাউকেই দোষ দিচ্ছি না। দোষ আমাদের সবার। কিন্তু সেই মুহূর্তে, ঐ ফায়ার প্লেসের সামনে সবার মনের কথা যেন এক হয়ে গিয়েছিল। অ্যাডাম বুড়ো কি করবে অত টাকা দিয়ে। আমরা যুবক, আমাদেব বয়েস আছে। টাকা নিয়ে আমরা সহজে জীবন উপভোগ করতে পারি। আর তারপর...মুখ ঢেকে থেকে পরক্ষণেই মুখ তুলে বললো—আমি এরপর একটু সংক্ষেপে সারছি।

...পরদিন আমরা সবাই মিলে স্কি-স্যুট পরে পাহাড়ে গেছি স্কি করতে ..অ্যাডামও গেছে। অ্যাডাম দু'হাজার ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ছিল...তলায় গভীর খাদ...জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। যোসেফ ওকে গিয়ে ধাক্কা দিল...ও একটা আর্ত চীৎকার করে নীচে পড়ে গেল। ব্যস শেষ। ফিরে আসার সময় পুলিশে রিপোর্ট দিলাম, পা পিছলে পড়ে গেছে। আর কি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি একটা ভূতের ব্যাপার বলছিলেন না। এবার বলুন, কোন ভূত কাকে মেরেছে।

মিস ট্রয় যা বললো তা অত্যন্ত বিস্মিত হবার ঘটনা, কিন্তু কোন মতেই বিশ্বাস্য নয়।

যোসেফ জানে ওর মেজ ভাইকে নাকি মৃত অ্যাডাম এসে মেরে ফেলেছে। মৃত অ্যাডাম ফিরে আসাটাই একটা অবাস্তব ব্যাপার। কিন্তু ট্রয় যেভাবে জোর দিয়ে বললো, তাতে ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। নভেম্বরের পনেরো তারিখে নাকি ও সুপার মার্কেট থেকে ফিরে এসে দেখে যে ঘরের মধ্যে অ্যাডাম বসে আছে। এবং সেই

অ্যাডামের ভূতের সঙ্গে নাকি রীতিমত কথোপকথন হয়েছে। সেই মৃত অ্যাডাম নাকি বলেছে যে সে মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এসেছে এবং যে পোশাকে মারা গিয়েছিল সেই পোশাকেই ফিরে এসেছে।

—উঁচু বুট জুতো, সবুজ স্কি স্যুট এবং সবুজ টুপী মাথায়। ব্যাপারটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সন্দেহ নেই। মৃত্যু মানুষের এ পৃথিবীতে ফিরে আসা কোন মানুষই সুস্থ দৃষ্টিতে দেখে না। কিন্তু এটা কেমন করে সম্ভব? মৃত অ্যাডাম বলে গেছে যে একে একে নিভিবে দেউটি, প্রথমে যোসেফ, তারপর সিমন্ এবং তারপর আমার মক্কেল মিস ট্রয়কে হত্যা করবে। আমি এমন মামলাতে কখনও পড়িনি।

ঘটনা শুনে ট্রয়কে জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর আপনি কি করলেন?

ট্রয় বললো, আমি আমার ভায়েদের ডেকে সব খুলে বললাম। ওরা তো সমস্ত ঘটনা আমার স্নায়ুর দুর্বলতা জনিত কল্পনা বলে উড়িয়ে দিল। আমি কেমন বেকুব বনে গেলাম। কিছুই বললাম না। কিন্তু...যোসেফের খুন হওয়া আমায় ভাবিয়ে তুলেছে।

আমি বললাম—সে তো আপনার মনের ব্যাপার। কিন্তু আপনিই তো বলেছেন জোসেফ আত্মহত্যা করেছে।

ট্রয় বললো, জোসেফ কবজির শিরা কেটে দিয়ে মারা গেছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে বা এলাকার কোনখানে কোন রক্তমাখা অস্ত্র পাওয়া যায়নি। সব থেকে বড় কথা জানেন, আবার কাল রাতে অ্যাডাম এসেছিল। আমাকে বলে গেছে এবার সিমন তারপর আমার পালা। সেই এক পোশাক ওর পরণে...

ট্রয়ের মুখে চোখে আতঙ্কের ছাপ সুস্পষ্ট।

পরবর্তী কাহিনী আগের মতোই।

আমার মক্কেল সব দেখে শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। পরে জ্ঞান ফিরে এলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওর সেই ভাইয়ের কাছে যেতে ওর ভাই যথারীতি মতিভ্রম হয়েছে ভেবে ডাক্তারের কাছে যেতে বলে। কিন্তু আজ আমার মক্কেল একটা কিছু করার জন্যে বদ্ধ পরিকর।

—প্লিজ, প্লিজ আমায় সাহায্য করুন।

ওর কাতর আহ্বানে মনটাকে সত্যিই নাড়া দিল। ওর সঙ্গে আর দেরী না করে ওর অ্যাপার্টমেণ্টে এলাম। তিনশো ডলার তুলে নিতে ভুললাম না।

ওর অ্যাপার্টমেণ্টটা আমায় সত্যই মুগ্ধ করে দিল। সমস্ত ব্যবস্থাই আধুনিকতার চূড়ান্ত। এমনকি ফায়ার এসকেশ পর্যন্ত নেই। জিজ্ঞাসা করতে জানলাম, বাড়ীটাই নাকি ফায়ার প্রুফ। কিন্তু সবচেয়ে মজা লাগলো দরজার তালাটা খুবই পুরানো ধাঁচের যে কেউ খুলে ফেলতে পারে। ঘরটা তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণের ফলে এইত্রুটিটা নজরে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে হল ভুত হোক বা যেই হোক সে ব্যাটা কোন পুরানো দরজা খুলে নির্ঘাত আসে। আমি ট্রয়কে সে কথা জানিয়ে টেলিফোন ডিরেক্টর দেখে একজন তালার মিস্ত্রীকে আসবার জন্য ফোন করে দিলাম আর বিলম্ব না করে।

অতঃপর আপ্যায়নের ধুম পড়লো। মিস ট্রয়ের হাতের তৈরী কফি আর শ্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে করতে সবিস্ময়ে দেখলাম যে আমার বিকেলটা সত্যিই খুব সুন্দর কাটলো। বিশেষত মিস ট্রয়ের মত সুন্দরী মহিলার এত সময় ধরে সাহচর্য পাওয়া কম কথা নয়।

অনেকদিন পর ভাল লাগলো।

মিস ট্রয় আমাকে ওনার প্রদর্শনীর নাইট ক্লাব 'কাফে বেলাতে' ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্রণ জানায়।

আমি কথা দিতে না পারলেও ঐ নিমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করলাম। মিস ট্রয়ের গভীর দৃষ্টি আমাকে রীতিমত আলোড়িত করছিল বলা যায়।

তালার মিস্ত্রী এসে পড়ায় কিছুক্ষণের জন্য আমাদের আলাপে বাধা পড়লো। মিস্ত্রী নতুন মজবুত তালা বসিয়ে দিল। মিস ট্রয়ের মুখের ওপর থেকে সেই আগেকার ভয়ের মেঘ অনেকটা যেন সরে গেছে। আমাকে তুলনা দিল ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তার এলে যেমন রোগী বাঁচার

স্বপ্ন দেখে, আমার এই অ্যাপার্টমেন্টে পদার্পনে নাকি মিস ট্রয়ের মনে সেই রকম আশা জাগরিত হয়। অতিশয়োক্তি আর কাকে বলে!

বিদায় সুন্দর বিকেল!

বিদায় সুন্দরী ট্রয়!

বিদায়ের প্রাক্কালে আবার নাইট ক্লাবে যাবার সনির্বন্ধ অনুরোধ। সুন্দরের জয় বিশেষতঃ সুন্দরীর জয় সর্বত্র। পুরনো কথাটা নতুনভাবে মনে পড়লো।

স্থান—সিমন ট্রয়ের কর্মস্থল।

একটা পুরনো ধাঁচের দোকান। এমন কিছু আহামরি নয়। সিমন ট্রয় একাই কাজ করছিলো। আমি যেতে আমায় আপ্যায়ন করতে লাগলো। আমি আমার পরিচয় দিয়ে আমার উদ্দেশ্য খুলে বললাম। ওর মুখে আতঙ্কের ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ও আমাকে কথা বলার জন্য আড়ালে নিয়ে গেল।

সব কিছু খুলে বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের আকার প্রচণ্ড আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে উঠলো। ও ওর বোন সম্বন্ধেই শুধু নয় নিজের সম্বন্ধেও যথেষ্ট চিন্তিত দেখলাম। কারণ ঐটুকু সময়ের মধ্যে ঘন ঘন দুটো সিগারেট শেষ করে ফেললো।

আমি ওর কাছে মাউন্ট ফিলিংটন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা জানতে চাইলাম।

সিমনের কথা থেকে একটা কথা পরিষ্কার হল যে পুলিশে রিপোর্ট করার পর ওরা এসে খোঁজাখুঁজি করে হাড়ের টুকরো, সবুজ স্কি স্যুট, রক্তে মাংস ইত্যাদি পেয়েছিল কিন্তু দেহটা পায়নি। আমি সমস্তই মন দিয়ে শুনলাম।

সিমনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওর দাদা অ্যাডামের সম্পত্তির ব্যাপারে কি করা হয়েছে, এ কথাটা মিস ট্রয়কে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। সিমনের মুখে বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারলাম, কে কত টাকা পয়সা পেয়েছে।

অ্যাডামের সম্পত্তি বেচে সবাই মোটামুটি গড়ে পঞ্চাশ হাজার ডলার পেয়েছে। এরা দুভাই করিৎকর্মা লোক, সঞ্চয়ী। সুতরাং এরা আজও ভাল ভাবেই চালাচ্ছে কিন্তু সিলভিয়ার উড়নচণ্ডী স্বভাবের জন্য সব টাকা ফুরোতে দেরী লাগেনি। সুতরাং আবার যে কে সেই, এখন কাজের ধান্দায় ঘুরে বেড়ানো আর কি!

জোসেফের সুইসাইডের ব্যাপারে ওর অভিমত ওটা আত্মহত্যাই। যদিও কোন অস্ত্র-সস্ত্র কিছু পাওয়া যায়নি তবুও ও আন্দাজ করতে পেরেছে, কি ঘটেছিল। ওর ধারনা, জোসেফ বাথরুমে ব্লেড দিয়ে নিজের কব্জি কেটে পায়খানার প্যানে সেটা ফেলে দিয়েছে। পুলিশও নাকি ওর চিন্তাধারার সঙ্গে একমত হয়েছে। এর কারণ নাকি কিছুদিন থেকেই জোসেফের শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। প্রধান ব্যাপারটাই ছিল পেটের রোগ, এক্সরে করে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে কিছুই করা যায় নি। শেষ অবধি অপারেশন করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তার আগেই সে মারা যায়।

আমি ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসবার আগে ও আমায় সিলভিয়ার দেওয়া ফিটা ফেরত দিতে বললো। কারণ ট্রয়ের এখন গোয়েন্দার থেকেও ডাক্তারের বেশী দরকার। ওর ভাই সিমন একটা ভাল মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তারও ঠিক করে রেখেছে।

আমিও তাতে সমর্থন জানালাম। বললাম, যে ঐ টাকা আমি ফিরিয়ে দেব তবে সেই মুহূর্তে আমার কাছে ছিল না। সেজন্য ওকে দিতে পারলাম না। ওকে জানালাম পরে ওর কাছে পাঠিয়ে দেবো কারণ ট্রয়কে টাকা ফেরত দেবার ব্যাপারটা ভাল দেখাবে না। সিমনও সে কথা মেনে নিল ও আমাকে ওর থেকে পঞ্চাশ ডলার রেখে দিতে বললো। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম। পরে না হয় মধ্যরাত্রেই একসময় দেখা করবো ওর সঙ্গে। কারণ সিমন বললো ও খুব দেরীতে বাড়ী ফেরে।

কাফে বেলের পরিবেশটা ততটা মনোরম নয় যতটা মনোরম সিলভিয়া। পানীয় গুলোও খারাপ, ঠিক সেই রকম খারাপ বেয়ারাদের সার্ভিস। যাই হোক, কিছুক্ষণ বসে থেকে আমি সিলভিয়ার প্রদর্শনী দেখলাম।

আমাকে খুব সন্তুষ্ট করতে পারলো না ঐ প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর মাঝামাঝি আমি উঠে পড়লাম আমাকে সিমনের ফ্ল্যাটে যেতে হবে। আমার পকেটে আড়াইশো ডলার নিয়ে বেরিয়েছি

...সিমনের ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল বাজালাম বার দু' তিন। কোন সারা শব্দই পেলাম না। দরজা ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। আমি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলাম...

দেখলাম সিমন বসে আছে চেয়ারে। সামনের টেবিলে একটা ফাঁকা গ্লাস আর একটা ককটেল ভর্তি গ্লাস রাখা আছে। সিমন বসেই আছে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে। আমি দ্রুত গিয়ে সিমনকে ধাক্কা দিতেই ও মাটিতে পড়ে গেল...সিমনের প্রাণ শক্তি কোন একটা ক্ষণে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। আমি দ্রুতপদে ফোন ধরলাম।

আমার বন্ধু ডিটেকটিভ লেফটেনেণ্ট লুইস পার্কার হোমিসাইড ডিপার্টমেণ্টে আছে। তার অধীনে ময়না তদন্ত ইত্যাদি খুব তাড়াতাড়িই সম্পন্ন হল। ফাঁকা গ্লাসে সিমনের আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে। অন্য গ্লাসটি ছোঁয়াই হয়নি। পরীক্ষা করে জানা গেছে, সিমনের মৃত্যু হয়েছে পটাসিয়াম সায়ানাইডে।

ফোন করে সব ব্যবস্থা করার পর পার্কারের সাথে সামনা সামনি এই প্রথম।

দেখা হতেই পার্কার জিজ্ঞাসা করলো—কি ব্যাপার হে? তুমি যখন এর মধ্যে রয়েছ তখন গল্পও নিশ্চয় কিছু আছে?

আমি জবাব দিলাম—তা আছে। আচ্ছা লেফটেনেণ্ট তুমি ভূতে বিশ্বাস কর?

বিরাট মুখব্যাদন করে পার্কার বললো- মাঝে মধ্যে করি বই কি ? তুমি আমায় কোন ভুতের গল্প বলতে চাও ?

—শুনলে কি খুব ক্ষতি হবে ? বললাম আমি। পার্কার হেসে জবাব দিল—না ক্ষতি কি। অন্ততঃ কাজের একঘেয়েমী তো কাটবে।

অতঃপর সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক পার্কারকে বললাম মায় সিমনের ফ্ল্যাটে আমার যাবার উদ্দেশ্য পর্যন্ত।

সব শুনে পার্কার বললো—চল, ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করে আসি।

সারা রাত্রি সিলভিয়া তার ড্রেসিং রুমেই ছিল। পার্কার বিভিন্ন ভাবে সকলকে জেরা করছিল। কিন্তু ওর কথার সত্তার বিরুদ্ধে কারও কাছ থেকে কোন সূত্র বের করা গেল না।

এই মেয়েটি তার ড্রেসিং রুম ছেড়ে কোথাও বের হয়নি। ওর ড্রেসিং রুমের সামনের করিডোর সরাসরি রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। পার্কার সমস্ত কর্মচারীকেই প্রশ্ন করলো কিন্তু প্রয়োজনীয় উত্তর কারও কাছ থেকেই পাওয়া গেল না। সিলভিয়া ট্রয়ের কথার বিরুদ্ধে কথা একটাও পাওয়া গেল না

পার্কার ট্রয়কে স্টেশন হাউসে তুলে নিয়ে এল। আমিও সঙ্গে এলাম। সেখানে সিলভিয়াকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পার্কার জেরা করলো।

সুফল কিছুই পাওয়া গেল না।

সিলভিয়া জোর গলায় এককথাই বার বার বললো যে ও ড্রেসিং রুমের বাইরে এক চুলও যায় নি। একমাত্র প্রদর্শণীর সময় ছাড়া।

অবশেষে পার্কার হতাশ হয়ে ওকে অন্য পুলিশ ম্যানের হাতে দিয়ে বললো—বেরিয়ে যাও। বাড়ীতে থাকো। তবে একটা কথা পরিষ্কার বলে দিচ্ছি যতদিন না কিছু হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কোথাও বেরোবে না। কথাটা যেন খেয়াল থাকে ?

ট্রয় স্বাভাবিক ভাবে ব্যাপারটা মেনে নিয়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

পার্কার চিন্তান্বিত, ওর সিগারেটের ধোঁয়াটা পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠছে। হাতে তাপ লাগতে আমার সম্বিত ফিরলো। আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার সিগারেট পুড়ে কখন শেষ হয়ে গিয়েছিল বুঝতেই পারিনি।

সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললাম—কি রকম মনে হলো?

পার্কার আমার দিকে চেয়ে সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে বললো—ঐ মেয়েটাকে নিয়ে আমার চিন্তা হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

পার্কার জিজ্ঞাসা করলো—তোমার রেসিপ্রোক্যাল উইল সম্বন্ধে কোন ধারনা আছে তো?

—হ্যাঁ, জানি।

পার্কার বললো, দুই ভাই-ই কোর্টে তাদের ইচ্ছাপত্র দাখিল করেছিল। এখন দুজন মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাওনাটা মেয়েটার ভাগ্যে হচ্ছে! একশ হাজার ডলার।

একটু থেমে পার্কার আবার বললো—এখন দেখ জোসেফ আত্মহত্যা করেছে কিন্তু কোন অস্ত্র সেখানে পাওয়া যায় নি। ওটা খুন হওয়া অসম্ভব নয়। সিমন মারা গেল। কিন্তু কাছাকাছি কোন ছোট শিশি বা পাত্র পাওয়া যায় নি যার মধ্যে করে বিষ আনা হয়েছিল। তার মানে কি কারও আত্মা এসব করে গেছে।

আমি বললাম - তুমি বলতে চাও, তাহলে আবার সেই ভূতুড়ে ব্যাপার।

—ঐ মহিলাটিই সবার মূলে। পার্কার বললো—ও এই দুজনকে খুন করে একটা আষাঢ়ে ভূতের গল্প তোমায় সাজিয়ে বলেছে এবং আমাদেরও কোন সাক্ষী নেই ওর বিরুদ্ধে। কিন্তু আমরা ব্যাপারটা ধরেছি। আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিতে পারি এ বিষয়ে।

তারপর আমাকে বললো—যাও, তুমি চলে যাও। তোমায় খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি করবে ? তুমি যাবে না।

পার্কার বললো—এখন নয়। আমার একটু কাজ আছে।

আমি চারটে নাগাদ বাড়ীতে পৌঁছলাম। যখন ঘরের মধ্যে ঢুকি তখন ফোন বাজছে। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম।

অপর প্রান্তে সিলভিয়ার গলা।

—মি. চেম্বার্স, প্লীজ, মি. চেম্বার্স, তাড়াতাড়ি করুন।

ওর গলা আতঙ্কে কাঁপছে।

তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলাম—কি হয়েছে ?

ওর গলায় বিভীষিকার স্বর—আবার আসছে "ও"...অ্যাডাম। এইমাত্র ও বললো যে "ও" আসছে...এবার আমার পালা...মিঃ চেম্বার্স।

গলার স্বর যেন স্তিমিত হয়ে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম—মিস ট্রয়! মিস ট্রয়! আপনি আমার গলা শুনতে পাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ, পাচ্ছি।

—আপনি এক কাজ করুন, ঘরের জানলাগুলো সব ভাল করে বন্ধ করে দিন।

একটা ভয়ার্ত অদ্ভুত গলায় সিলভিয়া বললো, আমি যথারীতি বন্ধ করে দিয়েছি।

আমি ওকে বললাম,—দরজাটা বন্ধ করে দিন। দরজাও বন্ধ করে দিয়েছি।

—একমাত্র আমি ছাড়া আর কাউকে দরজা খুলবেন না। আমি গেলে দরজার ফুটো দিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলবো। তাহলেই আপনি বুঝবেন কে এসেছে। আমার গলা চিনতে পারবেন তো ?

—হ্যাঁ, পারবো। ও বললো।

আমি বললাম—ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। আপনি থাকুন।

আমি ফোন রেখে সঙ্গে সঙ্গে পার্কারকে ফোনে ডাকলাম। ফোনে ওকে সব খুলে বললাম—যাই হোক না কেন প্রচুর লোক-জন আর অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে চলে এসো। আমি নীচের তলাতে তোমার সঙ্গে দেখা করছি। ঠিকানা জান তো ?

পার্কার জবাব দিল—নিশ্চয়ই।

আমি ফোন রেখেই ছুটলাম।

•

নীচে পার্কার ছাড়া আরও তিনজন গোয়েন্দা আর তিন জন অস্ত্রধারী পুলিশ ছিল।

আমরা সদলে সিলভিয়ার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সিলভি-য়ার দরজার বেল বাজালাম। ভেতর থেকে একজন পুরুষের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

—কে ?

—আমি পিটার চেম্বার্স। সিলভিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

নেপথ্য কণ্ঠস্বর—ও এখানে নেই।

—মিথ্যে কথা। আমি প্রতিবাদ করলাম। আমি জানি, ও এখানেই আছে।

—ও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না।

—আপনি কে ?

—সেটা তোমার জানার দরকার নেই। তুমি এখান থেকে চলে যাও। নেপথ্য কণ্ঠস্বর বললো।

আমি জানালাম—দুঃখিত। আমি চলে যেতে পারছি না।

নেপথ্যের কণ্ঠস্বর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো—দেখ আমার হাতে কিন্তু বন্দুক রয়েছে। তুমি যদি না চলে যাও তাহলে আমি দরজার ভিতর দিয়ে গুলি করতে বাধ্য হব।

পার্কার আমাকে দরজার সামনে থেকে পাশে টেনে নিয়ে সরে এলো। তারপর ভেতরের দিকে উদ্দেশ্য করে বললো, দরজা খোলো। আমরা পুলিশ।

নেপথ্যের স্বর গর্জে উঠলো—তোমরা যেই হও না কেন আমি পরোয়া করি না। আমি শেষ বারের মত তোমাদের বলছি, চলে যাও। নাহলে আমি গুলী করছি।

পার্কার চীৎকার করে বলে উঠলো—আমিও তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। যদি দরজা না খোল, আমরা তাহলে গুলী চালাবো। তিন পর্যন্ত গুনবো, তার মধ্যে যদি দরজা না খোলো তবে আমি আমার কথা মত কাজ করবো……এক।

কোন উত্তর নেই।

নেপথ্যের থেকে হাসির শব্দ পাওয়া গেল।

—দুই।

আবার হাসির আওয়াজ।

—তিন।

কোন সাড়া শব্দ নেই।

পার্কার পুলিশদের কারবাইন তুলে নিতে বললো। সবাই প্রস্তুত হলে পার্কার বললো—শেষবার বলছি, দরজা খোল।

কোন সাড়াশব্দ নেই।

পার্কার নির্দেশ দিল গুলী করার। দরজাটা গুলীর চোটে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। একটা তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল। তার পর সব শান্ত। পার্কার ওর সঙ্গীদের দরজা ভাঙ্গার নির্দেশ দিল।

…মড় মড়…মড়াৎ…!!

হুড়মুড় করে সব নিয়ে তিনজন জোয়ান মদ্দ হুমড়ি খেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

ঘরে ঢুকতেই প্রথমে যার সঙ্গে দেখা হল সে সিলভিয়া, ··মেঝেতে পড়ে আছে ··গুলীতে সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত।

সিলভিয়া মৃত ·· ··

কি আশ্চর্য ! ঘরে আর কেউ নেই।

তন্ন তন্ন করে সারা ঘর খুঁজে দেখলাম।

নাঃ, ঘরে অন্য কেউ এসেছিল তার কনামাত্র চিহ্ন নেই। ঘরের

দরজা, জানলা সব শক্ত করে বন্ধ করা ··একমাত্র সিলভিয়াই ঘরের মধ্যে ছিল ··আর এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

লুইস পার্কার আমার কাছে এলো···চোখ দুটো বিস্ফারিত···মুখে ভয়ের ছাপ ··উত্তেজনার নিঃশ্বাসে সারা শরীর কাঁপছে।

পার্কারের অতগুলো শক্ত সমর্থ লোকজন স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে পার্কারকে ঘিরে।

পার্কার আমায় এসে জিজ্ঞাসা করলো—কি ব্যাপার বলতো পিটার। তোমার কি মনে হয়?

তার গলার স্বরে কৌতুহল বা ভয় কোনটাই চাপা পড়লো না।

আমিও খুবই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম।

তবু আমি বললাম—আমি ভূতে বিশ্বাস করি না।

যদিও আমি এই ঘটনার কোন বিশ্বাস্য কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

আসলে আমি ভূতে বিশ্বাস করতে পারি না তার কারণ আমি এই সম্ভাবনাকে আমল দিই না এবং পিছনে যুক্তি খুঁজি!

ট্রয়ের এই ব্যাপারে আমার মনে হয়েছে যে হ্যালোসিনেশন বা আত্মশাস্তি বা অদ্ভুত প্রতিশোধ ··ইত্যাদি নিয়ে নিজের কাছে নিজে যুক্তির অবতারনা করি।

কিন্তু আমার বহু পরিচিত লোক এই ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট নন।

আপনি তার মধ্যে হয়তো বা একজন হবেন।

আধুনিক যুগের পাঠক পাঠিকার কাছে **হেনরী কেনের** আলাদা আকর্ষণ আছে। এই শতাব্দীর জটিল মনস্তত্বকে সামনে রেখে উনি একাধিক জমজমাট ভূতের গল্প লিখেছেন। যার বেশ কয়েকটি স্থান পেয়েছে সমকালের সবচেয়ে বিখ্যাত ভৌতিক কাহিনীর সম্পাদক আলফ্রেড হিচ্‌ককের সংকলনে।

হেনরী কেনের ভূত কোন আলৌকিক অবয়ব নিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভয় দেখায় না। সে আপনার আমার মধ্যে বাতাসে ভর দিয়ে সরীসৃপ পায়ে হেঁটে বেড়ায়। বিংশ শতাব্দীর ছোট গল্পে যে মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ ও অনুভূতির প্রকাশ হেনরী কেনের ভৌতিক গল্পে তার সার্থক বিন্যাস। তবে কেনের কাহিনীগুলি যতখানি ভৌতিক তার চেয়েও বেশীমাত্রায় অলৌকিক রহস্যের ছায়ায় মোড়া। ভূতের গল্পে কেন বর্ণনা করেছেন, এমনই এক আলো-আধারি অনুভূতির কাহিনী, যা পড়তে পড়তে পাঠক বারবার আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন হয়। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

লৌহ পিঞ্জর

—লর্ড হ্যালি ফ্যাক্স

রোজ রাতে……শোবার ঘরের ঠিক উপরের ঘর থেকে একটা অদ্ভুত পায়ের শব্দ ভেসে আসে।· হঠাৎ মূর্তিটা আমার দিকে ফিরলো, উঃ কী ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য, আমি কোনদিন সে দৃশ্য ভুলব না।

(গল্পটি ভিক্টোরিও যুগের বিখ্যাত ভুতুরে গল্প সংগ্রহকারক লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের একটি অন্যতম সংগ্রহ। এটি একটি কুমারী জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। এর প্রায় ৭০ বছর পর লেখক ঘটনাটি শোনেন।)

মা বাবার সাথে আমি, আমার বোনেরা, আমার ভাই চার্লস একবার বিদেশে গিয়েছিলাম। সেটা ছিল ১৭৮৬-র শরৎকালের শেষ দিকটা। বেশ বেড়ালাম কিছুদিন। বেশ কয়েকটা শহর দেখাও হলো। এবার বাবা-মা কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবেন ব'লে ঠিক করলেন। কেননা তখন আমাদের অর্থাৎ ছোটদের ফরাসী ভাষা শেখার কথাবার্তা চলছিল। 'লীলে এলাম আমরা। যায়গাটা শিক্ষা-দীক্ষার পক্ষে যেমন উপযুক্ত, তেমনি এখানে পরিচিত কিছু প্রতিবেশী পাওয়া যাবে, এমনও সম্ভাবনা ছিল।

প্রথমে যে বাড়িটায় উঠলাম সেটা তেমন সুবিধের নয়। বাবা অন্য বাড়ির সন্ধানে থাকলেন। কদিন বাদে বাড়ি পাওয়া গেল। বিশাল বাড়ি—খোলা-মেলা। এত সুন্দর জায়গায় এমন বাড়ী আশাতীত! তার চেয়েও আশাতীত এ বাড়ির ভাড়া! খুব সস্তা! সুতরাং বেশ হৈ হৈ করে চলে এলাম নতুন বাড়িতে।

বাড়িটা তো ভালই—কিন্তু একটা জিনিসে কেমন, যেন খটকা লাগলো। রোজ রাতে আমাদের শোবার ঘরের ঠিক ওপরের ঘর থেকে একটা অদ্ভুত পায়ের শব্দ ভেসে আসে, ঠিক নিঝুম, নিশুতি রাতে!—আমাদের এ বাড়িতে আমরা ছাড়া বেশ কিছু ঝি-চাকর আছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন ফরাসীও আছে। ভাবলাম, রাতে বোধ হয় এদেরই কেউ এঘরওঘর করে—তাই শব্দ শুনি।

একদিন, মা তাঁর খাস ঝি ক্রেশওয়েলকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে ক্রেশওয়েল, ওপরের ঘরে কেউ থাকে না কি রে?

—কই না তো মা! ওটা তো একটা খালি চিলেকোটা! উত্তর দিল ক্রেশওয়েল।

যাক সে কথা; কয়েক সপ্তাহ পর আমি আর মা ব্যাঙ্কে গেছি টাকা তুলতে। এক গাদা খুচরো টাকা পয়সা দেওয়া হলো আমাদের এতগুলো খুচরো টাকা পয়সা নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ব্যাঙ্কের ভদ্রলোক বললেন—আপনাদের অসুবিধা হলে আমার লোক গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসতে পারে। আপনাদের নতুন ঠিকানাটা ···

—জায়গাটা হচ্ছে, ডিউ লায়ন ডি অর।

—অ্যাঁ! চোখ গোল হয়ে গেলো ভদ্রলোকের। সর্বনাস! করেছেন কি? ও তো একটা ভুতুড়ে বাড়ি। রোজ রাতে প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায় ও বাড়িতে! কেউ তাই ওখানে থাকতে চায় না।

আমি আর মা হো-হো করে হেসে উঠলাম। ওসবে আমাদের বিশ্বাস নেই। ফেরার পথে মা মজা করে বললেন—আমার মনে হয় কি জানিস, যে বেটা রোজ রাতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ঐ বেটাই প্রেতাত্মা!

এই ভাবেই চলছিল। সাত দশদিন পর তখন আমাদের সকালের জল খাবার খাওয়া হয়ে গেছে, এমন সময় ক্রেশওয়েল এসে এক বিচিত্র সংবাদ শোনালো। আমাদের ফরাসী চাকর বাকরেরা কেউ আর এ বাড়িতে থাকতে চাইছে না। এটা নাকি ভূতের বাড়ি। এ বাড়ির যে আসল মালিক সে ছিল একজন যুবক। তার এক কাকা তাকে লোহার খাঁচায় পুরে হত্যা করে, এ বাড়িতেই রেখে গেছে। তাই কেউ এ বাড়িতে থাকতে চায় না। আমাদের সাহস নাকি খুব বেশী। তাই এতদিন ধরে আমরা আছি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। মা, ক্রেশওয়েলকে জিজ্ঞেস করলেন—তুই এসব কথা বিশ্বাস করিস ?

—হুঁ, করিনা আবার। এসো না, দেখবে এসো উপরে, লোহার খাঁচা ঐ চিলেকোঠায় পড়ে আছে।

ঠিক সেই সময় আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। সব শুনে তিনিও আমাদের সাথে উপরে এলেন। এই ঘরটাও বেশ বড়, ফাঁকা। কোন আসবাব নেই, শুধু কোনের দিকে একটা লোহার খাঁচা রয়েছে। খাঁচাটা দেওয়ালের সাথে গাঁথা। এই ধরনের খাঁচায় বন্য জন্তুদের রাখতে দেখেছি। তবে এটা অনেকখানি বড়, চওড়ায় প্রায় চার ফুট আর লম্বায় আট ফুট। খাঁচাটার পেছনের দেওয়ালে একটা আংটা লাগানো, আংটা থেকে ঝুলছে জামার কলার শুধু মরচে পড়া একটা শেকল।

সেই দৃশ্য দেখে মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগলো। কল্পনা করতে লাগলাম হত্যার দৃশ্য! উঃ কী বীভৎস! ঐ ভাবে কোন মানুষকে মারা যায়! আমাদের পরিচিত ভদ্রলোকও শিউরে উঠলেন। তবু অন্ধভাবে সব কিছুকে মেনে নিতে পারি না। মনে মনে ভাবলাম কেউ নিশ্চয়ই এ বাড়ি থেকে আমাদের সরাতে চাইছে। তাই রাতে কোন গোপন পথে ঢুকে সকলকে ভয় দেখায়। যাই হোক, কোন ঝুঁকি না নিয়ে চলে যাওয়া ভালো, বলে স্থির করলাম।

দিন দশেক পর, সকালে যখন ক্রেশওয়েল মার ঘরে এলো কাজ-

কর্মের জন্য, দেখি ওর মুখ কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। বুঝলাম কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে আবার, জিজ্ঞাসা করলাম,—কি হয়েছে রে ?

কান্নাকাটি জুড়ে দিল ক্রেশওয়েল। বললো ও আর আমার খাস ঝি মার্স আর কোনদিন উপরে ঘুমুবে না।

মা বললেন—আচ্ছা, তোরা না হয় আমার পাশে যে ছোট খালি ঘরটা আছে ঐখানে ঘুমোস, কিন্তু তোরা ভয় পেলি কিসে ?

—কাল রাতে কেউ আমাদের ঘরে ঢুকেছিল। আমি আর মার্স দুজনেই তাকে দেখেছি, ভয়ে কাঁটা হয়েছিলাম। কোনো রকমে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়েছিলাম—ভয়ে আমরা মরি আর কি !

আমি আগের মতই হেসে উঠলাম, কিন্তু ক্রেশওয়েলের কান্না আর থামে না; একটু সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম। বললাম, আমরা একটা ভালোবাড়ির সন্ধান পেয়েছি। কয়েক দিনের মধ্যেই উঠে যাবো। এর মধ্যে ওরা এসে আমাদের পাশের ঘরে ঘুমোক। ওরা যে ঘরে ঘুমোয় সে ঘরে দেখলাম আরও একটা দরজা আছে। সেইখান দিয়ে একটা নতুন পথ বেরিয়ে গেছে। সিঁড়ির পেছন দিয়ে যেটা নীচে নেমে গেছে।

ঘর পরিবর্তনের কয়েক রাত পরে মা আমাকে আর চার্লসকে এমব্রয়ডারী ফ্রেমটা ওঁর ঘর থেকে এনে দিতে বললেন। তখন আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। ভীষণ অন্ধকার সেদিন। সিঁড়ির ঠিক নীচেই আলো জ্বলছে। ভাবলাম ঐ আলোতেই মার ঘরের সব দেখা যাবে। তাই আর সঙ্গে মোমবাতি নিলাম না। সিঁড়ির নীচ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন দেখি ঠিক তার ওপর দিয়ে কেউ যেন হেঁটে যাচ্ছে। পাতলা গাউন পরা, লম্বা চুলওয়ালা কেউ। ভাবলাম ও আমাদের হান্না বুঝি। চেঁচিয়ে উঠলাম—এই হান্না, ভালো হবে না কিন্তু, ভয় দেখাচ্ছিস, কেন ?

এই কথা শুনে সে ক্রেশওয়েলের পুরোনো ঘরে ঢুকে গেলো, ঐ ঘরে উঁকি মারলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। মনে হলো যে এসেছিল সে ঐ দ্বিতীয় দরজা দিয়ে নীচে নেমে গেছে।

নীচে এসে মাকে হান্নার বদমাইশির কথা বললাম। মা শুনে রেগে গেলেন। বললেন, এ তো ভীষণ অসভ্যতা! ও তো অনেকক্ষণ আগে মাথা ধরেছে বলে শুতে গেলো। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে হান্নার ঘরে এলাম। দেখি আমাদের আর একজন কাজের লোক এ্যালিক বসে তার কাজ সারছে। সে বললো—হান্না এক ঘণ্টার ওপর এখানে শুয়ে আছে। ঘুমে একেবারে কাদা হয়ে গেছে।

শুতে যাবার আগে ক্রেশওয়েলকে সব ঘটনা বললাম। সে তো শুনে একেবারে সাদা হয়ে গেলো। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো—ও মাগো! কী হবে গো। এ যে ঠিক আমরা যেমনটি দেখছি, ঠিক তেমনটি।

এই সময় আমার ভাই হ্যারি এলো এ বাড়িতে। সিঁড়ির ওপরে ঐ ঘরটা থেকে বেশ কিছুটা দূরের অন্য একটা ঘরে তাকে থাকতে দেওয়া হলো। একদিন সকালে সে জলখাবার খেতে বসে মায়ের সাথে কি চোট-পাট!···তুমি আমায় কি ভেবেছো, শুনি? ভেবেছো কি আমি কাল রাতে মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম? ঘরের বাতি নিভোতে পারবো কিনা, সন্দেহ ছিল বুঝি! তাই গোয়েন্দা পাঠিয়েছিলে ঘরে! আমি তো কড়ানাড়ার আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে এসে চাঁদের আলোয় দেখি ঢিলে গাউন পরে কেউ একজন সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছে। যদি আমার কাছে কিছু থাকতো বাছাধনের গোয়েন্দাগিরির মজাটা বুঝিয়ে দিতাম।

মা কিছু বলতে পারলেন না। ভীষণ মুষড়ে পড়লেন তিনি। শুধু বললেন তিনি কাউকে ওভাবে পাঠাননি।

পরেরদিন শ্রী ও শ্রীমতী এ্যাটকিনস তাঁদের ছেলে নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। এঁরা লীলের থেকে প্রায় চার মাইল দূরে থাকেন। আমাদের কাছে সব ঘটনা শুনে শ্রীমতী এ্যাটকিনস লাফিয়ে উঠলেন।—তাঁর খুব ইচ্ছা, আমার মা যদি মত দেন তো তিনি তাঁর পোষা কুকুর নিয়ে ঐ ঘরে থাকবেন। তাঁর একটুও ভয় করবে না।

মা আপত্তি করলেন না। স্ত্রীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনার জন্য ছেলেকে নিয়ে শ্রীযুক্ত এ্যাটকিনস বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন।

পরেরদিন সকালে শ্রীমতি এ্যাটকিনসকে বেশ কাহিল দেখলাম। চোখের তলায় কালি, মুখ ফ্যাকাসে। মনে হলো সারারাত ঘুম হয়নি। জিজ্ঞাসা করলাম কেমন কাটালেন? ভয়-টয় পাননি তো? ঘুম হয়েছিল তো?

বিষণ্ণ গলায় তিনি বললেন প্রথমদিকে বেশ ভালোই ঘুম হয়েছিলো। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেলো। কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম ঘরে, অথচ কুকুরটাতো কোনো অচেনা মানুষকে দেখলেই তেড়ে যায়। ল্যাম্পের আলোয় দেখি একটা মূর্তি! কুকুরটারে লেলিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে চুপচাপ মুখ গুঁজে শুয়ে রইলো।

বুঝলাম খুবই ভয় পেয়ে গেছেন তিনি। কিছুক্ষণ পর শ্রীযুক্ত এ্যাটকিনস এলেন। উনি স্ত্রীর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিলেন। বললেন ধ্যাৎ, যত সব বাজে স্বপ্ন। অত দুঃখেও না হেসে পারলাম না।

ওঁরা চলে যেতেই মা বরাবরের মত এবারেও বললেন ঐ সব ভূত-টুতে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু এ বাড়িতে আর একদণ্ডও থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রহস্য উদ্‌ঘাটনে কাজ নেই আমার। নিশুতি, রাতে কোন অচেনা লোক আমার ঘরে পায়চারি করছে উঃ ভাবতেই বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে।

নতুন বাড়ি ঠিক হয়ে গেছে। এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার তিনদিন আগের কথা। সারাদিন ঘুরে ভীষণ ক্লান্ত আমি। রাতে বাড়ি এসেই শুতে যাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। কী গরম সেদিন। পাশের আর পায়ের দিকের জানলার পর্দা তুলে দিলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম। খেয়াল নেই হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। না, পায়ের শব্দে নয়। আজকাল আমার আর মায়ের ঐ শব্দে শুনতে, শুনতে অভ্যেস হয়ে গেছে। তাই আর ঘুম টুমে খুব একটা ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু সেদিন একটা অন্যরকম অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেলো। মনে হলো,

কেউ যেন এ ঘরে ঢুকেছে। তাকিয়ে দেখি, যা ভেবেছি তাই। ঘরে সবসময় একটা বাতি জ্বলে। তাতে দেখি আমাদের ঘরেই সেই মূর্তি। জানলা আর দরজার মাপে দেরাজওয়ালা সিন্দুক একটা। সেইটার ওপর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। লম্বা, রোগাটে শরীর, ঢিলে গাউন পরা। হঠাৎ মূর্তিটা আমার দিকে ফিরলো! লম্বাটে রোগা, বিষণ্ণ মুখ! এক বিষাদ ক্লিষ্টতার ছাপ তার চোখে। উঃ কী ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য। আমি কোনদিন সে দৃশ্য ভুলবো না। প্রায় এক ঘণ্টার ওপর আমি চোখ বন্ধ করে থাকলাম। সাহস হলো না আবার সিন্দুকের দিকে তাকাতে। যখন তাকালাম, তখন ঘরে আর কেউ নেই। একেবারে শুনশান। অথচ দরজা খোলা বা বন্ধ, কোনরকম কোন শব্দ শুনিনি।

সারারাত দু চোখের পাতা আর এক করতে পারলাম না। সকালে ক্রেশওয়েল এসে ডাকতেই রাগ হয়ে গেলো। বললাম—দরজা খুলতে পারবো না। দেরাজের চাবিটা তুমি কাল ভুলে দেরাজের ওপর রেখে যাওনি! সে তো কাঁই-মাঁই করে উঠলো। উঠে দেখি, চাবি যেখানে থাকার সেখানেই আছে। আশ্চর্য।

মাকে সব কথা বলতে, মা তো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। "ভাগ্যিস ডাকিস নি আমায় ঐ সময়। আমি ঐ দৃশ্য দেখলে নির্ঘাত হার্টফেল করতাম। আর একরাতও এখানে থাকা যাবে না। আজই আমরা চলে যাবো।

জিনিসপত্র সব বাঁধা-ছাদা হলো। জলখাবার খেয়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। "লায়ন ডি অর" ছাড়ার আগে আমি আর ক্রেশ-ওয়েল আমাদের ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু কোন গুপ্ত পথ পেলাম না যেখান থেকে রাতের আগন্তুক আমাদের ঘরে ঢুকেছিল।

['কর্ণহিল' পত্রিকায় 'লৌহ পিঞ্জরাবদ্ধ মানুষ' রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার পর ঐ রচনাটির লেখক ব্যারিং গোল্ড একটি চিঠি পান। তিনি চিঠিটা লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে পাঠিয়ে দেন। হ্যালিফ্যাক্স কিছুদিন পর এই চিঠিটা পায়।]

প্রিয় ব্যারিংগোল্ড মহাশয়,

কর্ণহিল, পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যা আমি অনেক পরে পেয়েছি। আপনার 'লৌহ পিঞ্জরাবদ্ধ মানুষ' রচনাটি আমায় খুবই নাড়া দিয়েছে। কেননা তিরিশ বছর আগে 'ডিউ-লায়ন-ডি-অর' হোটেলে আমার একরকম এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

১৮৮৭ সালের মে মাসে আমি আর আমার দুই বন্ধু বার্ডলং থেকে ব্রাসেলসে যাচ্ছিলাম, আমাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধাও ছিলেন। তিনি এই দূরপাল্লার রেল ভ্রমণের সাথে পরিচিত ছিলেন না। তাই এত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন যে তাঁর বোন স্থির করলেন, সেই রাত্রিরটা লীলে কাটিয়ে যাবেন। প্রায় সন্ধ্যার দিকে সেখানে গিয়ে পৌছালাম আমরা। নতুন জায়গা সম্বন্ধে কিছু না জানার জন্য তার পরের দিন সকালবেলাতেই এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবো ভেবে স্টেশনের কাছাকাছি-ই হোটেলের খোঁজ করলাম। একটা পুরোনো ধাঁচের হোটেলও পাওয়া গেল—'হোটেল-ডিউ-লায়ন-ডি-অর'।

দোতলায় বেশ আরামের ঘর পাওয়া গেল। আমার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া আর একটা বড় শোবার ঘর। প্রথমে ভাবলাম আমার ঘরে বুঝি ঐ ঘরটা দিয়েই শুধু ঢুকতে পারা যায়। পরে খুঁজে পেতে দেখি আমার ঘরের অন্যপ্রান্তে আরো একটা দরজা আছে। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বললেন, দরজাটা সে খোলে। তাই চাবিটা রেখে দেওয়া হলো। দরজা খুলতেই বেশ পরিষ্কার একটা জায়গা বেরিয়ে পড়লো। সিঁড়ির মাথার ঠিক বিপরীত দিকে। জায়গাটা মনে হলো কাজের মেয়েরা ব্যবহার করে। সেখানে গাদা খানেক বালতি, ঝাঁটা জড়ো করা।

আমার বন্ধুরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো। আমি তাদের 'শুভরাত্রি' জানিয়ে নিজের ঘরে এলাম। ঘুম আসছিলো না, তাই কয়েকটা চিঠি লিখতে বসেছি। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল করিনি। তখন সময় কত হবে? নিশ্চয় এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। হঠাৎ কেমন যেন সজাগ হয়ে গেলাম। যদিও চারিদিক নিঃঝুম, তবু মনে

হলো, আমার ঘরের অন্তপ্রান্তের দরজার বাইরে কেউ যেন খুব সতর্ক-ভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে উপর-নীচ করছে। আপনি যেমন লিখেছেন ঠিক তেমনি, 'ধীর পদক্ষেপে টেনে টেনে হাঁটার' মতো।

একদম পাত্তা দিলাম না। ভাবলাম কোন চাকর-বাকর বুঝি অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ আমার দরজার কড়া নড়ে উঠলো। আমি ভেবেছিলাম আমার বান্ধবী বোধহয় ঘুমুচ্ছে। কিন্তু কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনেই সে আমার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। জিজ্ঞাসা করলো, আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে নাকি? কেন না সে অনেকক্ষণ থেকে আমার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। আমি নাকি উপর নীচ করছি। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম যে তখন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি চেয়ার ছেড়ে উঠিনি। তবে পায়ের শব্দ আমিও শুনেছি। আর সেটা ঠিক আমার ঘরের বাইরে ঐ খোলা জায়গায়। দুজনে সাহস সঞ্চয় করে বাইরে এলাম আলো নিয়ে। কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না।

তখন কিছুটা ভয় পেয়ে নিজেদেরকেই সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম—যদিও শব্দটা মনে হচ্ছে খুব কাছের, কিন্তু সেটা মোটেই কাছের নয়। বোধহয় উপর থেকেই আসছে। দরজাটা ভালভাবে বন্ধ করে দিলাম আবার। বান্ধবী তার বিছানায়, আমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু যতক্ষণ না ঘুম এলো, ততক্ষণ বার বার শুনতে পেলাম সেই পায়ের শব্দ—'ধীর পদক্ষেপে, টেনে টেনে হাঁটার' শব্দ।

পরের দিন সকালেই 'লীল, ছেড়ে চলে এলাম আমরা। সে ঘটনার কথা কখনও আর চিন্তা করিনি। আবার ভুলেও যাইনি একেবারে। দুমাস পর বাড়ি ফিরে মা-কে ঘটনাটা বললাম। মা'র এইসব 'প্রেতাত্মা' ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কৌতূহল ছিল। মার এক বান্ধবী তাঁকে একটি এমনই রচনা দেন। রচনায় বর্ণিত ঘটনাবলী ঠিক আপনার বর্ণনারই মতো; লীলের সেই ডিউ-লায়ন-ডি-অর নামক জায়গার এক পোড়ো বাড়ির রহস্য। আমার মনে হলো এই বাড়িটাতেই আমি সেই দুঃস্বপ্নের

রাত কাটিয়েছি। এ বিষয়েও নিশ্চিত হলাম যে, যে পায়ের শব্দ শুনেছি, তা কখনও কোন জীবিত মানুষের না।

এত কথা লিখলাম শুধু আপনাকে একটু সাহায্য করার জন্য। এই বর্ণনা পড়ে আপনি হয়তো পরবর্তীকালে এই দুঃখময় বাড়িটার হদিস পাবেন।

আমার কথা আপনি বিশ্বাস করেছেন আশা করি।

আপনার বিশ্বস্ত—

অ. স.

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স– যাঁরা নিছক ভূতের গল্প পড়তে ভালবাসেন, তাঁদেব কাছে লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের বিশেষ জনপ্রিয়তা আজও অম্লান। ইনি কোন প্রতীক গল্পে বিশ্বাস কবেন না, ভৌতিক তন্ময়তার মধ্যে অকারণে দর্শনবাদেব অনুপ্রবেশ ঘটান না। লর্ড হ্যালিফ্যাক্সেব ভূত তার আদিম বিহ্বল বীভৎস জিঘাংসায় বিদ্যমান।
তাই হ্যালিফ্যাক্সের গল্পে হারিযে যাওয়া ছোটবেলাব গা ছমছম, বুক দুর দুব ভয়েব রস আস্বাদ করা যায়। সাবা জীবনে উনি ভূত নিয়ে দারুণ রোমাঞ্চিত গবেষণা করেছেন এবং দেশ বিদেশের নানা প্রান্তে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছেন অবিশ্বাস্য কাহিনীর বিস্ময়কর ইতিবৃত্ত। লৌহপিঞ্জর হলো তেমনিই এক আদিম ভয়ের আকর্ষণীয় অনুভূতির কাহিনী।

দি ইনএক্সপিরিয়েন্স্‌ড্‌ গোস্ট

—এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌

ভুত ধরেছ, বলকি? স্যাণ্ডারসন বলল কই দেখি? আমার মোমবাতি-দানের ম্লান আলো ওর শরীর ভেদ করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।·· আর ও আমাকে শুনিয়ে চলল ওর করুণ জীবন কাহিনী।

যে পরিবেশের মাঝে বসে ক্লেটন তার শেষ গল্প শুনিয়েছিল সেটা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। বেশির ভাগ সময়টাই সে বসে ছিল ঘরের ঐ কোণে, বড়সড় অগ্নি-আধারের পাশে রাখা প্রাচীন সোফাটার ধার ঘেঁসে, আর তার পাশেই বসে ছিল স্যাণ্ডারসন—নিজের নাম লেখা ব্রোসলি মাটির পাইপ থেকে ধূমপানে মগ্ন। ইভান্স ছিল, আর ছিল অভিনয় জগতের রত্ন উইশ—অবশ্য সে খুব বিনয়ীও বটে। সেই শনিবারটায় আমরা সকলে মিলে 'মারমেইড ক্লাব'-এ এসেছি সকাল-বেলায়, শুধু ক্লেটনই এর ব্যতিক্রম, কারণ কালকের রাতটা সে ক্লাবেই কাটিয়েছে—এবং এ ঘটনা থেকেই তার গল্পের অনিবার্য সূত্রপাত। যতক্ষণ বল দেখা যায়, ততক্ষণ আমরা গল্‌ফ্‌ খেলেছি; রাতের খাওয়া-দাওয়াটাও সেরে নিয়েছি, এবং প্রত্যেকের মেজাজে গল্পের যন্ত্রণা সহ্য করার মত একটা শান্ত দয়ার আবেশ। ক্লেটন গল্প শুরু করতেই আমরা স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিয়েছি সে গাঁজাখুরি কোন কাহিনী শোনাচ্ছে। তবে এ কথা সত্যি যে, সে কাহিনীর শুরু করেছিল

অত্যন্ত সহজ সরল ভঙ্গীতে, যেন কোন সত্যি ঘটনা শোনাচ্ছে; কিন্তু আমরা ভেবেছি, সেটা মানুষটার দুরারোগ্য গল্প বলার কায়দা।

'জানো' কাল রাতে এখানে আমি একা ছিলাম? স্যাণ্ডারসনের নেড়ে-চেড়ে দেওয়া একটা জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়ি থেকে ঠিকরে ওঠা আগুনের ফুলকি বৃষ্টির দিকে অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন চোখে তাকিয়ে থেকে ক্লেটন মন্তব্য করলো।

'শুধু' ক্লাবের পোষা জন্তু-জানোয়ারগুলো ছাড়া', বলল উইশ।

হ্যাঁ, তবে ওরা বাড়ির ওদিকটায় শোয়—' বলল ক্লেটন, 'যাই হোক, কাল রাতে—' সে হাতের চুরুটে কিছুক্ষণ এক মনে টান দিল, যেন নিজের আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে ইতস্তত: করছে। তারপর বেশ শান্তভাবেই বলল, 'আমি একটা ভূত ধরেছি!

'ভূত ধরেছ, বল কি?' স্যাণ্ডারসন বলল, 'কই দেখি?'
তখন চার সপ্তাহ অ্যামেরিকায় ঘুরে আসা, ক্লেটনের একান্ত অনুগত ভক্ত, ইভান্স চিৎকার করে উঠল, 'ভূত ধরেছ, তুমি? ওঃ, দারুণ! শীগগীর বল, কি করে কি হল।'

ক্লেটন বলল যে সে গল্পটা শোনাচ্ছে এবং ওকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে অনুরোধ করল।

তারপর ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল সে, 'কেউ যে আড়ি পাতবে, তা নয়; তবে ভূত নিয়ে গুজব ছড়িয়ে ক্লাবের চমৎকার পরিচর্যা-পরিবেশন পণ্ড হয়ে যাক, তা আমি চাইনা। তাছাড়া এটা ঠিক নিত্যকার ভূত নয়। মনে হয় না, এটা আর কখনও আবার আসবে।

'তার মানে, ভূতটা তুমি ধরে রাখনি?' স্যাণ্ডারসন বলল।

'ধরে রাখতে মন চাইল না,' বলল ক্লেটন।

স্যাণ্ডারসন ভীষণ অবাক হল।

আমরা জোর গলায় হেসে উঠতেই ক্লেটনকে একটু বিমর্ষ মনে হল। ছোট্ট করে হেসে সে বলল, 'বুঝতে পারছি, তবে সত্যিই ওটা একটা ভূত ছিল। আমি ঠাট্টা করছি না। বিশ্বাস কর।

স্যাণ্ডারসন তার একটা লাল্‌চে চোখ ক্লেটনের ওপর রেখে পাইপে গভীর টান দিল, তারপর অনেক কথার চেয়ে বেশি ইঙ্গিতময় এক সরু ধোঁয়ার ফোয়ারা ছুঁড়ে দিল।

ক্লেটন ব্যাপারটা গায়ে মাখলো না, 'এ আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা। তোমরা তো জানো, আমি ভূত-টূত একেবারে বিশ্বাস করি না; আর আমিই কিনা শেষে একটা ভূত ধরে বসলাম; এখন গোটা ব্যাপারটাই আমার হাতে।'

আরো কিছুক্ষণ গভীর ধ্যানে ডুবে রইল সে; তারপর দ্বিতীয় একটা চুরুট বের করে একটা অদ্ভুতদর্শন ছুরি দিয়ে সেটা ফুটো করতে লাগল।

'তুমি ওটার সঙ্গে কথা বলেছ?' উইশ প্রশ্ন করল।

'তা, ধর প্রায় ঘণ্টাখানেক বলেছি।'

'মিশুকে আড্ডাবাজ?' সন্দেহবাতিকদের দলে নাম লিখিয়ে আমিও শ্লেষের খোঁচাটা দিয়েছি ক্লেটনকে।

'বেচারা খুব বিপদে পড়েছিল,' চুরুটের ডগার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল সে, মুখে তার প্রতিবাদ বা বিরক্তির লেশমাত্র নেই।

'কাঁদছিল?' কে যেন জানতে চাইল।

স্মৃতি রোমন্থন করে বাস্তবিকই এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্লেটন। বলল, 'হা ভগবান! সত্যিই কাঁদছিল। বেচারা!'

'তুমি কোথায় মেরেছ ওকে?' যথাসম্ভব অ্যামেরিকান কায়দার সুরে প্রশ্ন করল ইভান্স।

তাকে উপেক্ষা করে ক্লেটন বলল, 'কখনো বুঝিনি, ভূতদের এ রকম করুণ অবস্থা হতে পারে,' সে আবার আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষায় রাখল, পকেট হাতড়ে দেশলাই খুঁজে বের করে চুরুটে আগুন ধরাল।

'আমি অবশ্য একটা সুযোগ নিয়েছি,' অবশেষে সে মন্তব্য করল।

আমরা এতটুকু ব্যস্ততা না দেখিয়ে প্রতীক্ষায় রইলাম।

'যে সব ভূতরা সাধারণতঃ ভয় দেখিয়ে বেড়ায়, তারা বুনো

ঘোড়ার মত গোঁয়ার্তুমি করে একই যায়গায় বারবার ফিরে আসে। কিন্তু এ বেচারা সেরকম নয়।' হঠাৎই সে একটু অদ্ভুতভাবে চোখ তুলে তাকাল, ঘরের চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল, 'প্রথম দেখাতেই ওকে আমার খুব দুর্বল বলে মনে হয়েছে।'

চুরুটের টানে নিজের বক্তব্যকে যতিচিহ্নিত করে ক্লেটন বলল, 'ওর সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল লম্বা বারান্দাটায়। প্রথম আমিই ওকে দেখতে পাই—আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ভূত বলে আমি চিনতে পেরেছি। ওর চেহারাটা কেমন স্বচ্ছ আর সাদাটে; সোজা ওর বুক ভেদ করে বারান্দার শেষ মাথার ছোট্ট জানলার আলোর রেশটুকু বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম। শুধু চেহারা নয়, ওর হাবভাব পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল ঠেকছিল। যেন কি করবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। একটা হাতে কাঠের দেওয়ালে ভর রেখে অন্য হাতটা মুখের কাছে নাড়ছে। ঠিক—এই রকম!'

'চেহারা কি রকম ছিল?' স্যাণ্ডারসন বলল।

'রোগা। ছোটখাটো মাথায় খোঁচা খোঁচা কদমছাঁট চুল। কান দুটো বিচ্ছিরি। কাঁধ ভীষণ সরু। পরণে ভাঁজ করা কলার দেওয়া খাটো কেনা জ্যাকেট, ঢোলা প্যান্টুলটা পায়ের কাছটায় ছিঁড়ে গেছে। চুপিসাড়ে আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছি। সঙ্গে আমার কোন আলো ছিল না—পায়ে ছিল হালকা চটি। সিঁড়িতে উঠেই ওকে আমার নজরে পড়েছে। ব্যস্‌, সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি—ভাল করে ওকে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। ভয় কিন্তু একটুও পাইনি। বরং অবাক হয়েছি আরও কৌতূহলও গেছে বেড়ে। ভাবলাম, "ওঃ ভগবান! অ্যাদ্দিনে তাহলে একটা ভূতের দেখা পেলাম। আর গত পঁচিশটা বছর আমি কিনা এক মুহূর্তের জন্যেও ভূতে বিশ্বাস করিনি!"

'হুম্‌,' বলল উইশ।

'আমি সিঁড়ি বেয়ে ওঠামাত্রই ভূতটা আমাকে দেখতে পেল। চকিতে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। সব মিলিয়ে অপরিণত এক যুবকের মুখ, থুতনী ও নাকের গড়ন কেমন দুর্বল, ঠোঁটের ওপরে খোঁচা খোঁচা

গোঁফ। এক মুহূর্ত আমরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম,—ও কাঁধের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে—এবং জরিফ করতে লাগলাম পরস্পরকে। তারপরই মনে হয় নিজের উঁচুদিকের পেশার কথা ওর মনে পড়ল। ও ঘুরে দাঁড়িয়ে টান টান হয়ে খাড়া হল, মুখটা সামনে বাড়িয়ে হাত দুটো ভূতুড়ে নিয়ম মাফিক দুপাশে ছড়িয়ে এগিয়ে এলো আমার দিকে। আর এগিয়ে আসবার সময় মুখটা হাঁ করে এক হালকা টানা চিৎকার করেও আমাকে ভয় দেখাতে চাইল। কিন্তু না—ওটা শুনে এক ফোঁটাও ভয় পাওয়ার জো নেই। খাওয়া-দাওয়া করে আমি তখন এক বোতল শ্যাম্পেন শেষ করেছি, আর একা একা থাকার ফলে হয়তো দু-তিন-পেগ—না, হয়তো চার-পাঁচ পেগ—হুইস্কিও টেনে ফেলেছি; সুতরাং, আমার শরীর তখন নিরেট পাথরের মত, এবং ভয় পাওয়া তো দূরস্থান! ভূতটাকে বললাম, "বোকার মত চেঁচিও না! এটা তো তোমার আস্তানা নয়! তাহলে কি করছ এখানে?"

স্পষ্ট দেখলাম, ও কুঁকড়ে গেল। তারপর আবার চিৎকার করল, "ওঁ-ওঁ-ওঁ—"

"রাখ তোমার ভূতুড়ে চিৎকার! তুমি কি এ ক্লাবের মেম্বার?" আমি বললাম; আর ওকে যে আমি পাত্তাই দিচ্ছি না সেটা দেখবার জন্যে ওর শরীরের একটা কোনা ভেদ করে বেরিয়ে গেলাম, তারপর মনোযোগ দিলাম মোমবাতি জ্বালতে। ওর দিকে আড়চোখে চেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি মেম্বার?"

আমাকে জায়গা দিতে ও একটু সরে গেল, মুখের ভাব কি রকম যেন মনমরা হল। তারপর আমার চোখের নাছোড়বান্দা নীরব প্রশ্নের উত্তরে বলল, "না, আমি মেম্বার নই—আমি একটা ভূত।"

"সে যাই হও, তাতে তো আর মারমেইড ক্লাবের ভেতরে যথেচ্ছ ঘোরাঘুরি করা যায় না? তুমি কারো সঙ্গে দেখা করতে চাও, না কি?" খুব সাবধানে আমাকে কথাবার্তা বলতে হচ্ছিল, কারণ, নইলে আমার হুইস্কিজনিত বিশৃংখল ব্যবহারকেও ভেবে বসবে আমি ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। জলন্ত মোমবাতিটা হাতে নিয়ে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম,

"তুমি এখানে করছ টা কি ?"

"ও ততক্ষণে হাত নামিয়ে চিৎকার বন্ধ করে ফেলেছে, লজ্জা পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে ও বলল, "আমি এখানে ভয় দেখাতে এসেছি।"

'কে বলেছে তোমাকে ভয় দেখাতে ?' শান্ত গলায় বললাম।

'বললাম তো, আমি ভূত,' যেন নিজের পক্ষ সমর্থনে ও বলল।

'সে হও গিয়ে, কিন্তু ভদ্রলোকেদের প্রাইভেট ক্লাবে এসে এভাবে ভয় দেখাবার কোন অধিকার তোমার নেই ; এখানে মেয়েরা, বাচ্চারা প্রায়ই আসে। তাদের কেউ যদি হঠাৎ তোমার মুখোমুখি পড়ে যায়, তাহলে তো সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে যাবে ! একবারও ভেবেছ সেকথা ?'

'না তো স্যার—ভাবিনি।'

'ভাবা উচিৎ ছিল। তাছাড়া এ জায়গাটার ওপর তোমার কি কোন দাবী আছে ? মানে, এখানে তুমি খুন-টুন জাতীয় কিছু হয়েছিলে ?

'না, স্যার, সেরকম কিছু নয় ; তবে আমি ভাবছিলাম, জায়গাটা বেশ সেকেলে গোছের, ওক্ কাঠের দেওয়াল চারদিকে, তাই—'

'এটা একটা অজুহাত হল ? আমি শক্ত গলায় বললাম, 'এখানে আসাটা তোমার খুব ভুল হয়েছে,' বন্ধুত্বে ভরা আদেশের সুরে আরও বললাম, 'আমি হলে আর মোরগের ডাক শোনার অপেক্ষা করতাম না—এক্ষুনি উধাও হয়ে যেতাম।'

ও ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ল। 'আসলে কি জানেন, স্যার—' ও বলতে শুরু করল।

'আমি হলে কিন্তু এই মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যেতাম,' বেশ জোর দিয়ে আমি বললাম।

আসলে, স্যার, মানে—আমি—আমি অদৃশ্য হতে পারছি না।'

'পারছ না ?'

'না, স্যার, মানে, আমি কি যেন একটা ভুলে গেছি। কাল মাঝরাত থেকে আমি শুধু এখানে ঘোরাফেরা করছি, আলমারিতে দেরাজে, শোবার ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে থেকেছি। মনটা কেবলই ছটফট

করছে। আগে কখনও আমি ভয় দেখাতে আসিনি—মনে হচ্ছে, না এলেই, ভাল হত।'

'না এলেই ভাল হত?'

'হ্যাঁ, স্যার। আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ঠিকভাবে পেরে উঠি না। কি একটা ছোট্ট ব্যাপার যেন ভুলে গেছি, আর মনে করতে পারছি না।'

'একথা শুনে, বুঝলে, আমি যেন একেবারে বোল্ড আউট হয়ে গেলাম। ও আমার দিকে এমন মনমরা চোখে তাকাল যে আমি আর তর্জন-গর্জনের সুর বজায় রাখতে পারলাম না। 'ভারী অদ্ভুত তো,' বললাম আমি, এবং কথা বলার সময় মনে হল নীচের তলায় কারো চলাফেরার শব্দ পেলাম। "চল, আমার ঘরে চল। সেখানে গিয়ে তোমার সব কথা শুনবো। আমি ব্যাপার স্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না।" ওকে হাত ধরে আমার সঙ্গে নিতে চাইলাম। কিন্তু, বুঝতেই পারছ, সে চেষ্টা একরাশ ধোয়াকে মুঠো করে ধরবার চেষ্টারই মত। আমার ঘরের নম্বরটা কিছুতেই আমার মনে পডছিল না। বেশ কয়েকটা শোবার ঘর খোঁজাখুঁজির পর আমার ঘরের দরজা নজরে পড়ল। একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে ওকে বললাম, "থাক, এইবার বসে ধীরেসুস্থে তোমার গপ্পোটা বল দেখি। মনে হচ্ছে, তুমি বেশ ভাল ঝামেলাতেই পড়েছ।

'যাই হোক, ও বসতে রাজি হল না; বলল আমার আপত্তি না থাকলে ও বরং ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করতে চায়। তাই হল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এক দীর্ঘ-গভীর আলোচনায় ডুবে গেলাম। একটু পরে হুইস্কি ও সোডার আমেজটা কিছুটা কমে এলে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলাম, কি ভয়ংকর বিপজ্জনক ভূতুড়ে ব্যাপারেই না আমি আগাপাস্তালা জড়িয়ে পড়েছি। অর্ধস্বচ্ছ শরীর নিয়ে পর্দাঘেরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন সেকেলে শোবার ঘরে ও দিব্যি এপাশ ওপাশ নিঃশব্দে পায়চারি করছে। নিয়ম-মাফিক ভূতের মতই ওর চেহারা ও চালচলন তফাৎ শুধু হালকা বলার স্বরটুকুতে। তোমার

মোমবাতিদানের ম্লান আলো ওর শরীর ভেদকরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, চোখে পড়ছে দেওয়ালে টাঙানো ফ্রেমে বাঁধানো খোদাইয়ের কাজ গুলো, আর ও আমাকে শুনিয়ে চলল ওর করুণ জীবন-কাহিনী—যা সগুসগু শেষ হয়েছে এই পৃথিবীর বুকে। ওর মুখের চেহারা খুব সাধু না হলেও বলতে পারি, স্বচ্ছ হওয়ার ফলে ওর পক্ষে সত্যি বলা ছাড়া পথ ছিল না।'

'তার মানে?' হঠাৎই চেয়ারে সোজা হয়ে বসে উইশ বলল।

'কি মানে? ক্লেটন জানতে চাইল।

'এই—স্বচ্ছ হওয়ার ফলে—সত্যি বলা ছাড়া পথ ছিল না—আমি ঠিক বুঝতে পারেছি না।'

'আমিও বুঝিনি,' অননুকরণীয় আশ্বাসের ভঙ্গীতে ক্লেটন বলল, 'তবে কথাটা যে সত্যি' এটুকু বলতে পারি। ওর কাছে শুনলাম, কিভাবে ও মারা, গেছে—লণ্ডনের এক পাতাল ঘরে ও মোমবাতি হাতে নেমেছিল কোথায় গ্যাস লিক করছে দেখতে—আর বেঁচে থাকতে লণ্ডনেরই এক বেসরকারী স্কুলের ইংরিজীর মাস্টার ছিল।'

'বেচারা!' আমি মন্তব্য করলাম।

'যা বলছ। বেঁচে থাকতেও ওর জীবন ছিল উদ্দেশ্যহীন, মরে গিয়েও তাই। ও তার বাপ-মা, মাস্টারমশাই—অনেকের কথাই বলল। কেউ ওকে বুঝত না, কোন আমল দিত না। সত্যিকারের বন্ধু বলতে কেউ ছিল না ওর। সফলতা ওর জীবনে কোনদিন আসেনি। খেলাধূলা ও বরাবরই এড়িয়ে চলেছে এবং পরীক্ষায় ফেল করেছে বারবার। একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়েও ঠিক হয়ে গিয়েছিল, আর ঠিক সেই সময়েই ঘটলো ঐ গ্যাস-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা। "এখন তাহলে কোথায় আছ?" আমি জানতে চাইলাম, মানে—"

'দেখলাম, ব্যাপারটা ওর কাছে ঠিক পরিষ্কার নয়। মানে যেখানেই ও থাক, ওর সঙ্গে এখন রয়েছে একদল স্বজাতীয় ভূত, আর ওরা নিজেদের মধ্যে প্রায়ই কোন বাড়িতে গিয়ে আস্তানা গাড়বার কথা আলোচনা

করে। হ্যাঁ, কোন বাড়িকে ভূতুরে বাড়ি বানাবার মতলব আর কি! ওদের কাছে এই ব্যাপারটা ভীষণ রোমাঞ্চকর, তবে ওদের বেশির ভাগই সব সময় ভয়ে পিছিয়ে আসতে চায়। সুতরাং, অবশেষে ও আবির্ভূত হয়েছে।'

'আশ্চর্য বটে!' জ্বলন্ত আগুনের দিকে চোখ রেখে উইশ বলল।

'ওর কথাবার্তা শুনে আমার মোটামুটি এই রকমই মনে হয়েছে, ক্লেটন বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'একমনে পায়চারি করতে করতে মিহি সুরে ও কথা বলে গেছে—শুধু কথা – নিজের করুণ অবস্থা সম্পর্কে। ভয় দেখাতে এসে এই বিতিকিচ্ছিরি ঝামেলায় পড়ে ও ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েছিল। সবাই ওকে বলেছিল এতে নাকি খুব 'মজা' হবে। তা, সেই 'মজা' পাওয়ার আশাতেই ও ক্লাবে এসে উদয় হয়েছিল, কিন্তু কোথায় কি! ওর সারাজীবনের ব্যর্থতার লিস্টে আরো একটা ঘটনা যোগ হল মাত্র। ও বলল যখনই যা কিছু করতে গেছে, সেটাই নাকি কেমন তালগোল পাকিয়ে ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ওর কথা আমি একটুও অবিশ্বাস করিনি। যদি অন্তত কারো সহানুভূতিও ভূতটা পেত—এই পর্যন্ত বলেও একটু থামলো, নজর করে দেখল আমাকে, তারপর মন্তব্য করল যে শুনতে অবাক লাগলেও আমিই নাকি প্রথম ব্যক্তি যে ওর প্রতি একটু হলেও সহানুভূতি দেখিয়েছি—এটুকু দয়াও কারও কাছ থেকে ভূতটা পায়নি।

'তক্ষুণি আমি বুঝতে পারলাম, ও আসলে কি চায় এবং মনে মনে রাজীও হলাম ওকে সাহায্য করতে। চটপট উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এসব নিয়ে বেশি মন খারাপ কোরো না। যে করে হোক তোমাকে আবার ফিরে যেতেই হবে। নাও আর একবার তৈরী হয়ে চেষ্টা কর দেখি।' আমি এমনিতে নিষ্ঠুর হতে পারি, কিন্তু একজন যখন আমাকে সত্যিকারের বন্ধু বলে সম্মান দিয়েছে তখন তাকে সাহায্য না করাটা আমার সহ্যের বাইরে—আর সে মানুষ হোক আর ভূতই হোক। আমার কথায় ও বলল, "আমি পারছি না।" "পারতেই হবে।" আমি বললাম এবং ও সত্যিই চেষ্টা করতে লাগল।

'চেষ্টা!' বলল স্যাণ্ডারসন, 'কেমন করে?

হাত নাড়াচাড়া করে ক্লেটন বলল।

'হাত নাড়াচাড়া করে?'

'হ্যাঁ, বিভিন্ন জটিল ভঙ্গীতে হাত নাড়াচাড়া করে। ঐ ভাবেই ও এখানে এসে হাজির হয়েছিল, এবং একইভাবে ওকে আবার অদৃশ্য হতে হবে। ওঃ ভগবান! কি কাজেই না ফেঁসেছি!'

'কিন্তু, শুধু হাত নেড়ে কেনন করে—' আমি বলতে শুরু করলাম।

'তুমি দেখছি সবকিছুরই জট খুলতে চাও,' আমার দিকে ফিরে বিশেষ কয়েকটা শব্দের ওপর জোর দিয়ে ক্লেটন বলল, 'কেমন করে আমি জানি না। শুধু জানি, ও অন্তত তাই করেছিল। বহু চেষ্টার পর, বুঝলে, একসময় ওর হাতের ভঙ্গীগুলো ঠিক ঠিক হতেই ভূতটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।'

'ভঙ্গীগুলো, তুমি খেয়াল করেছিলে?' স্যাণ্ডারসন ধীরে ধীরে বলল।

হ্যাঁ,' বলল ক্লেটন, মনে হল কিছু একটা ভাবছে, 'ভঙ্গীগুলো ভারী অদ্ভুত। আমি আর সেই রোগা আবছা ভূতটা বসে আছি সেই নিস্তব্ধ জনশূন্য সরাইখানায়। আমাদের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোন শব্দ সেখানে ছিল না। শুধু ছিল, ওর হাতের নড়াচড়ায় শূণ্যে তৈরী এক আবছা ছবি। একটা মোমবাতি শোবার ঘরের অন্ধকার দূর করছে আর দ্বিতীয় একটা জ্বলন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলে, আলো বলতে সব মিলিয়ে ঐ টুকুই—কখনো সখনো মোমবাতির আলো ক্ষণিকের জন্যে দপ্‌ করে জ্বলে উঠছে দীর্ঘ তন্বী বিহ্বল শিখায়। আর অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে লাগল! 'আমি পারছি না,' ও বলল, 'আমার দ্বারা সম্ভব নয়—।' এবং হঠাৎই একটা ছোট চেয়ারে বসে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ভগবান! কি হয়রানি একবার বোঝ!

"কি হচ্ছে কি এসব? থাম," একথা বলে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে গেলাম, কিন্তু......আমার হতচ্ছাড়া হাতটা ওর শরীর

ভেদ করে চলে গেল। মনে আছে, বিদ্যুতস্পৃষ্টের মত ছিটকে সরিয়ে নিয়েছি আমার হাত। সামান্য শিউরে উঠে সরে এসেছি ড্রেসিং-টেবিলের কাছে তারপর, ওকে মদৎ দিতে আমিও চেষ্টা করতে শুরু করলাম।'

'কি।' স্যাণ্ডারসম বলল, 'হাত নাড়াচাড়ার ভঙ্গী?

'হ্যাঁ, তাই।'

'কিন্তু—' কি একটা ভেবে যেন বলতে শুরু করেছিলাম আমি, কিন্তু সেটা খেয়াল করে উঠতে পারলাম না।

'আশ্চর্য ব্যাপার তো,' পাইপের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে স্যাণ্ডারসন বলল, 'তার মানে তোমার এই ভূতটা সমস্ত রহস্যই তোমার কাছে—'

'ফাঁস করে দিয়েছে কিনা? হ্যাঁ, দিয়েছে।'

'হতে পারে না,' বলল উইশ, 'এ সম্ভব নয়। কারণ, তাহলে, তুমিও ওর সঙ্গে উধাও হয়ে যেতে।'

'ঠিক বলেছ,' আমি আমার মনের কথা ফিরে পেয়ে সমর্থন জানালাম।

কিছুক্ষণের জন্য সবাই চুপচাপ।

'শেষ পর্যন্ত পারল?' স্যাণ্ডারসন জানতে চাইল।

হ্যাঁ পারল, তবে অনেক চেষ্টার পর—বলতে পারো হঠাৎই হয়ে গেল। ও তো হতাশই হয়ে পড়েছিল, তারপর তাদের দুজনের মধ্যে এক চোট হল, তখন হঠাৎ ও উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে পুরো ভঙ্গীটা আস্তে আস্তে করে দেখাতে বলল, যাতে ও ভাল করে লক্ষ্য করতে পারে। 'আপনারটা খুঁটিয়ে দেখলে আরি বুঝতে পারব আমার ভুলটা কোথায় হচ্ছে,' বলল ভূতটা। এবং সত্যি পারল। কিন্তু হঠাৎ ও একটু রুক্ষ গলায় বলল আমি পারব না—এই জন্যে তখন থেকে সব খালি গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনাকে দেখে আমি আরও নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি।' যাই হোক, কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি হল। বুঝতেই পারছ, আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু ভূতটা একেবারে বুনো ঘোড়ার মত বেঁকে বসল। সুতরাং,

অগত্যা আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, তাকিয়ে রইলাম বিছানার পাশে রাখা পোষাক আলমারির আয়নায়।

'ও একেবারে ঝটপট শুরু করে দিল। আয়না দিয়ে আমি ওর সমস্ত কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগলাম। হাত দুটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এইভাবে, এইরকম করে বিচিত্র সব ভঙ্গী করতে শুরু করল ভূতটা, তারপর হঠাৎই ঝুপ করে এসে পড়ল শেষ ভঙ্গীটা—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুটো হাত টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে দুপাশে—এইরকম, ঠিক এইভাবে ও দাঁড়াল। তারপরই উধাও! হাপিস! হাওয়া! আয়না ছেড়ে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালাম ওর দিকে। কিন্তু কোথায় কে! জ্বলন্ত মোমবাতির হোঁচট খাওয়া চিন্তা নিয়ে ঘরে আমি সম্পূর্ণ একা। ব্যাপারটা কি হল? সত্যিই কি কিছু ঘটেছে? না অতক্ষণ ধরে আমি স্বপ্ন দেখেছি? আর ঠিক তখনই, সিঁড়ির দেওয়াল ঘড়িটা যবনিকাপাতের বিচিত্র সুরে আবিস্কার করল, রাত একটার ঘণ্টা বাজানোর পক্ষে সময়টা বেশ জমে উঠেছে। সুতরাং!—ঢং! ব্যস্ আমার শ্যাম্পেন ও হুইস্কির তাবৎ নেশা তখন কেটে গেছে। আর কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে—ভীষণ অদ্ভুত! ওঃ ভগবান!'

চুরুটের ছাইটাকে এক মুহূর্ত সে জরিপ করল, তারপর বলল, 'এই-ই সব।'

'তারপর তুমি ঘুমোতে চলে গেলে? ইভান্স প্রশ্ন করল।

'তাছাড়া আর কি করব?

আমি উইশের চোখে তাকালাম। আমরা সবাই মিলে ক্লেটনকে ব্যঙ্গ করতে চাইলাম, কিন্তু ওর কথায় ও ব্যবহারে এমন কিছু একটা ছিল যে শেষ পর্যন্ত আমরা সেটা আর পেরে উঠলাম না

আর সেই হাত নাড়ার কায়দাগুলো? বলল স্যাণ্ডারসন।

'ওগুলো আমি এখনই করে দেখাতে পারি।'

'তাই নাকি!' একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি বের করে পাইপের গর্তের ভেতরটা চাঁছতে লাগল স্যাণ্ডারসন, 'নাহলে করে দেখাও।

ক্লিক শব্দে ছুরিটাকে বন্ধ করে সে বলল।

'দেখাচ্ছি', বলল ক্লেটন।

দেখো, ওতে কোন কাজ হবে না', ইভান্স বলল।

'কিন্তু, যদি হয় তাহলে—' আমি বলতে চেষ্টা করলাম।

'জানো, আমার মনে হচ্ছে, এসব নিয়ে ছেলেমানুষী না করাই ভাল', বলল উইশ, তারপর পা ছড়িয়ে আয়েস করে বসল।

উইশের সঙ্গে আমাদের বিতর্ক সুরু হল। তার মতে ঐ সব ভঙ্গী যদি ক্লেটন নকল করতে যায় তাহলে সেটা একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে ভীষণ ঠাট্টা করা হবে।

'কিন্তু গল্পটার এক বর্ণও কি তোমার বিশ্বাস হয়?' আমি জানতে চাইলাম।

উইশ চকিতে চোখ ফেরাল ক্লেটনের দিকে। সে তখন অগ্নি-আধারের জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি যেন ওজন করে দেখছে।

'হ্যাঁ, বিশ্বাস হয়—অর্ধেকেরও বেশী বিশ্বাস হয়', উইশ বলল।

'ক্লেটন', আমি বললাম, 'তোমার গল্পের গাঁজাখুরি ধরে ফেলা আমাদের কম্মো নয়। গল্পটা এমনি ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু ঐ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা....তুমি আমাদের মনে একেবারে সত্যি ঘটনার মত গেঁথে দিয়েছ। নাও বাবা, এবারে স্বীকার করে ফ্যালো যে পুরোটাই গুল-তাপ্পি ছাড়া আর কিছু নয়।'

আমার কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করেই সে উঠে দাঁড়াল, অগ্নি-আধারের সামনে বিছানো কার্পেটের ঠিক মাঝখানটায় গিয়ে থামল, এবং ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে মুখ করে। এক মুহূর্ত সে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল, তারপর সারাটাক্ষণই তার চোখ গভীর মনোযোগে স্থির হয়ে রইল মুখোমুখি দেওয়ালের ওপর। ধীরে ধীরে সে তার দু'হাত তুলে ধরল চোখের সমান্তরাল করে, এবং শুরু করল....

এখানে বলে রাখা ভাল, প্রাচীন এবং বর্তমান স্থাপত্য কর্মের নানান্ রহস্য নিয়ে স্যাণ্ডারসন অনেক গবেষণা করেছে। ফলে ক্লেটনের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী সে রক্তাভ চোখে গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করতে লাগল। ক্লেটনের

শেষ হলে সে বলল, 'মন্দ নয়। তুমি জোড়াতালি দিয়ে মোটামুটিভালই দেখিয়েছো, তবে একটা ছোট্ট জায়গা বাদ পড়ে গেছে।'

'জানি', ক্লেটন বলল, তারপর হাত ছুঁড়ে, দুলিয়ে, ছোট্ট এক অদ্ভুত মোচড় দিয়ে থামলো, 'এই-টা তো? ভূতটা তো এই জায়গাটাই বার বার ভুলে যাচ্ছিল।' দাঁড়াও, এবার পুরোটা তোমাদের প্রথম থেকে করে দেখাই।'

অস্তমিত আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল ক্লেটন। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, সেই হাসিতে সামান্য ইতস্ততঃ ভাব ছিল। সে বলল, 'তাহলে শুরু করছি—'

'আমি হলে কিন্তু করতাম না,' বলল উইশ।

'না, না, ঠিক আছে। ইভান্স বলল, 'পদার্থ অবিনশ্বর। তোমার কি ধারণা সব ভোজবাজী ক্লেটনকে অশরীরী জগতে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? মোটেই না। আমি তা বলব না ক্লেটন ভায়া, যতক্ষণ না তোমার হাতজোড়া কাঁধ থেকে খুলে পড়ে যাচ্ছে ততক্ষণ তুমি চেষ্টা করে যাও।'

'আমার মত তা নয়,' উঠে দাঁড়াল উইশ, এগিয়ে এসে ক্লেটনের কাঁধে হাত রাখল, 'যে করে হোক তোমার গল্পটা আমাকে তুমি অর্ধেকেরও বেশি বিশ্বাস করিয়ে দিয়েছ, ফলে আমি চাই না, তুমি এসব নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করো!'

'হায় কপাল! উইশ দেখছি ভয় পেয়ে গেছে!' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, ভয় পেয়েছি!' আমার দিকে ফিরে তীব্র গলায় বললো উইশ, 'আমার ধারণা ঐসব হাতের ভঙ্গী ঠিক ঠিক নকল করলে ক্লেটনও উধাও হয়ে যাবে।' উইশের মনোভাব হয় সত্যি নয়তো বলতে হয়, ওর অভিনয় প্রশংসা করার মত!

'ওসব কিছু হবে না,' আমি চিৎকার করে বললাম, 'এ পৃথিবীকে ফাঁকি দেবার একটাই মাত্র উপায় মানুষের হাতে আছে, আর সে হতে ক্লেটনের এখনও তিরিশ বছর দেরি। তাছাড়া···ঐ রকম একটা ভূত! তোমার কি মনে হয়— ?'

গতিশীল হয়ে আমাকে বাধা দিল উইশ। ছড়িয়ে থাকা চেয়ারের বৃত্ত ছেড়ে সে এগিয়ে এল, টেবিলের পাশে এসে থমকে দাঁড়াল।

'ক্লেটন', সে বলল, 'তুমি একটা বোকা।'

রসিকতার আলো দু'চোখে ঝিকিয়ে হাসি ফিরিয়ে দিল ক্লেটন।

'উইশ ঠিকই বলেছে। তোমাদের ধারণা ভুল,' ক্লেটন বলতে শুরু করল। আমিও উধাও হয়ে যাব। এইসব হাত নাড়াচাড়ার বিচিত্র ভঙ্গী যেই শেষ হবে, বাতাস কাটার শব্দের রেশ যখন শিস দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, অমনি—হুস্!—এই কার্পেট পড়ে থাকবে সম্পূর্ণ খালি, অবাক বিস্ময়ে সারাটা ঘর হয়ে যাবে স্তম্ভিত এবং পনেরো ষ্টোন ওজনের সুবেশ এক ভদ্রলোক টুপ করে গিয়ে পড়বে, অশরীরী জগতে। এতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই, তোমাদেরও থাকবে না। ফালতু তর্কের মধ্যে আমি আর যেতে চাইনা। সোজাসুজি চেষ্টা করেই দেখা যাক।'

'না।' চিৎকার করে সামনে এক-পা এগিয়ে এল উইশ এবং পরক্ষণেই থমকে দাঁড়াল, কারণ ক্লেটন তখন হাত তুলে সেই প্রেতাত্মার হাত নাড়ার ভঙ্গীগুলো নকল করতে শুরু করেছে।

ততক্ষণ আমরা এক অদ্ভুত উত্তেজনার চরমে পেঁৗছে গেছি—বিশেষ করে উইশের আচরণের জন্য। ক্লেটনের দিকে চোখ রেখে আমরা সকলে বসে আছি। বিশেষ করে আমার তখন এক বিচিত্র কঠিন নিঃসাড় অবস্থা, যেন আমার মাথার পিছন থেকে উরুর মাঝামাঝি পর্যন্ত গোটা শরীরটা ইস্পাতে পরিণত হয়ে গেছে। আর ক্লেটন এক অদ্ভুত শান্ত মুখভাব নিয়ে নিজের অবয়ব ঝুঁকিয়ে দুলিয়ে ওর হাত নাড়াচাড়ার ভঙ্গী করে চলল। যতই সে শেষের দিকে এগোতে লাগল ততই আমাদের উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগল, একটা হিমেল হাওয়া যেন আমাদের চোখমুখ ছুঁয়ে গেল। শেষভঙ্গীটুকু ছিল হাত দুটোকে টান টান করে দু'পাশে ছড়িয়ে দেওয়া, এবং তার সঙ্গে মুখ তুলে ধরা। যখন সে যবনিকা পতনের কায়দায় হাত দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিল আমার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। যদিও মানছি, এর কোন মানে হয় না। তবে ব্যাপারটা অনেকটা যেন ছমছমে ভুতুড়ে গল্পের মত। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর অদ্ভুত ছায়াময় এক বাড়ির ভেতরে বসে এই ঘটনার সাক্ষী থাকা। সত্যিই কি শেষ পর্যন্ত ও—?

মুখ ওপরে তুলে, দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে, নিশ্চিন্ত উজ্জ্বল অভিব্যক্তি

নিয়ে ঝুলন্ত আলোর আভায় এক বিস্ময়কর মুহূর্ত ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল ক্লেটন। সেই একটা মুহূর্ত আমাদের কাছে যেন একটা যুগ। আর তারপরেই আমাদের বুক ভেদ করে বেরিয়ে এলো স্বস্তির এক অনন্ত দীর্ঘশ্বাস এবং আশ্বস্ত হওয়ার একগুচ্ছ অস্ফুট শব্দ, 'না! কিছুই হয়নি।' কারণ চোখের সামনেই দেখছি ক্লেটন অদৃশ্য হয়নি। ব্যাপারটা পুরোটাই বোগাস। আসলে সে একটা গাঁজাখুরি গপ্পো ফেঁদে সেটা আমাদের প্রায় বিশ্বাস করানোর জন্য এত কাণ্ড করছে।...ঠিক তক্ষুণি ক্লেটনের মুখটা পাল্‌টে যেতে লাগল।

এই পাল্‌টে যাওয়াটা যেন কোন আলো ঝলমলে বাড়ির সমস্ত আলো পলকে নিভিয়ে দেবার মত। ওর চোখ হঠাৎই হয়ে গেল স্থির, অচল, অনড়, ঠোঁটের হাসি গেঁথে গেল ঠোঁটের ওপরেই। পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্লেটন শুধু ওর শরীরটা অল্প অল্প দুলতে লাগল!

সেই মুহূর্তটাও যেন একটা যুগ। তারপরই শোনা গেল চেয়ার নাড়াচাড়ার শব্দ, জিনিষপত্র পড়ে যাবার শব্দ, এবং আমরা ব্যস্ত হয়ে যাবার শব্দ, এবং আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ক্লেটনের হাঁটুজোড়া যেন হঠাৎই রণে ভঙ্গ দিল; ও হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। পলকে উঠে দাঁড়িয়ে ইভান্স ওকে ধরে ফেলল দু'হাতে···

আমরা সকলে স্তম্ভিত। অন্তত এক মিনিট কেউ গুছিয়ে কোন কথা বলতে পারল না। আমরা বিশ্বাস করছি, আবার করতেও পারছি না···· জটিল হতবুদ্ধি ভাব কাটিয়ে যখন সম্বিৎ ফিরে পেলাম, তখম দেখি, আমি ক্লেটনের পাশে হাঁটুগেড়ে বসে আছি, ওর খাটো কোট ও জামা ছিঁড়ে ফেলে স্যাণ্ডারসন ওর বুকে হাত রেখে পরীক্ষা করে দেখছে···

এ রহস্যের প্রকৃত সমাধান করা আমার জ্ঞান ও বুদ্ধির বাইরে। ভৌতিক যাদুমন্ত্রের কোন হাত এতে আছে কিনা আমি জানি না। আমি শুধু একটু বলতে পারি যে হাত নাড়াচাড়ার সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়া যে মুহূর্তে ওর শেষ হল, ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর চেহারা পুরোপুরি পালটে গেছে' ও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমাদের চোখের সামনে—এবং মারা গেছে?

—*—

এইচ. জি ওয়েলস : জন্ম ১৮৬৬ খ্রীঃ কেণ্টের ব্রমলিতে। ইংরাজী সাহিত্যের ছোটগল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে যে কয়জন লেখকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য এইচ, জি, ওয়েলস তাঁদের অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিকাশোন্মুখ ইংরাজী ছোট গল্পে হারবার্ট জর্জ ওয়েলস এক অভিনব বেগ ও বৈচিত্র্য আনয়ন করেন। তাঁর আবির্ভাবে ইংরাজী সাহিত্যে বিজ্ঞান সুবাসিত, সমাজচেতনাপৃক্ত গল্প ও উপন্যাসের এক নতুন আস্বাদন পাঠকদের আকৃষ্ট করে। তাঁর মতাদর্শ, চিন্তা ও সিদ্ধান্তগুলো সাহিত্যের নানা প্রদেশে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ছাড়াও চিঠি ও লঘুচপল আলোচনার আবরণেও তাঁর ভাব চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। এইচ, জি, ওয়েলস, বার্ণার্ডশ'য়ের ন্যায় যতখানি সাহিত্যিক তার চেয়েও বড় সমাজবিজ্ঞানী—এক চিন্তাবিদ। তাঁর চিন্তা ও সিদ্ধান্তগুলি সাহিত্যের লঘুপক্ষ বাতাবরণের আবরণে পাঠক হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, হয়ত বিমোহিত করেছে। বিজ্ঞান মনস্ক, স্বাপ্নলী-শিল্প, এই কথা শিল্পীর গল্প, উপন্যাসে অসাধারণ কল্পনাশক্তির দুরন্ত আবেগের সাথে মিলে মিশে আছে তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বচ্ছ ও সাবলীল প্রকাশ-ভঙ্গী। লেখকের নিউ ম্যাকিয়াভেলী, প্যাসেনট ফ্রেণ্ড, ম্যারেজ, দি আয়লণ্ড অব ডঃ মরুয়, আউটলাইন হিস্ট্রী অব দ ওয়ার্লড, ফার্স্ট মেন অন দ্ মুন ইত্যাদি গ্রন্থ বহুল প্রচারিত।

ড্রাকুলাস গেস্ট

ওটার পিছনের দিকে যেতেই নজরে পড়ল বড় বড় রুশ হরফে খোদাই করা হয়েছে :

'মৃতেরা দ্রুত চলে'

[এই গল্পটি মূলতঃ ব্রাম স্টোকারের 'ড্রাকুলা' হরার ক্লাসিকেরই একটি অংশ। 'ড্রাকুলা' উপন্যাসের দৈর্ঘ্য সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে লেখক নিজেই এই অংশটিকে নির্বাসন দেন, এবং লেখকের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ফ্লোরেন্স ব্রাম স্টোকার এই লেখাটি প্রকাশ করেন তাঁর স্বামীর উপরোক্ত নামের এক গল্প সংকলনের প্রথম গল্প হিসেবে।]

—ব্রাম স্টোকার

আমাদের যাত্রা যখন শুরু হল তখন মিউনিখের সূর্য উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে, এবং আসন্ন গ্রীষ্মের খুশিতে বাতাস ভরপুর। রওনা হতে যাব এমন সময় যে হোটেলে আমি আছি, তার পরিচালক হের্ ডেলব্রুক গাড়ির কাছে 'শুভ যাত্রা' কামনা করলেন, তারপর জুড়ি গাড়ির দরজার হাতলে হাত রেখে কোচোয়ানকে বললেন, 'মনে থাকে যেন, রাত হবার আগেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে। আকাশ ঝকঝকে হলেও উত্তুরে বাতাসে কেমন একটা কাঁপুনি দিচ্ছে, হয়তো হঠাৎ করে ঝড় উঠবে। অবশ্য আমি ভাল করেই

জানি, দেরি তুমি করবে না,' এবারে উনি একটু হেসে যোগ করলেন, 'কারণ তুমি তো জানো, আজকের রাতটা কিসের রাত।'

জার্মাণী ভাষায় জোরালো স্বরে, উত্তর দিল জোহান. 'হ্যাঁ স্যার, জানি, এবং টুপিতে হাত ঠেকিয়ে চকিতে গাড়ি ছুটিয়েদিল। শহরের বাইরে এসেই ওকে থামতে ইশারা করে আমি বললাম, 'বল দেখি, জোহান আজ কিসের রাত।'

বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ও, ভাল্পার্গিসের রাত।' তারপর জার্মান-সিলভারের তৈরি বিশাল এক শালগম-সাইজের সেকেলে ঘড়ি ও গাড়ি ছুটিয়ে দিল সজোরে, যেন নষ্ট হওয়া সময়টুকু পূরণ করতে চায়। থেকে থেকেই ঘোড়াগুলো মাথা ঝাঁকিয়ে সন্দেহজনকভাবে বাতাসের গন্ধ শুঁকতে লাগল। আর আমি ভয়ে ভয়ে চারপাশে দেখতে লাগলাম। রাস্তাটা বেশ ভালই নির্জন, কারণ আমরা তখন ছুটে চলেছি ঝাড়ো হাওয়ায় ধূ-ধূ হয়ে যাওয়া উঁচু মালভূমির ওপর দিয়ে। যেতে যেতে হঠাৎ একটা রাস্তা আমার নজরে পড়ল। দেখে মনে হল, সচরাচর সেটা ব্যবহার হয় না। একটা ছোট আঁকাবাঁকা উপত্যকার বুক চিরে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে গভীরে। কিন্তু তার আকর্ষণ এতই তীব্র যে জোহানকে বিরক্ত করার ঝুঁকি নিয়েও ওকে ডেকে বললাম, ঐ রাস্তা ধরে যেতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে। ও হাজার রকম অজুহাত দেখাতে শুরু করল, কথা বলতে বলতে ঘন ঘন ক্রুশ আঁকতে লাগল বুকের ওপর। এতে আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল, সুতরাং ওকে নানারকম প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। ও আত্মরক্ষার কায়দায় উত্তর দিতে লাগল, এবং প্রতিবাদ জানাতে বারবার ঘড়ি দেখতে শুরু করল। অবশেষে আমি বললাম, শোন, জোহান, আমি ঐ রাস্তায় যেতে চাই। তোমার ইচ্ছে না থাকলে আমি তোমাকে আসতে জোর করব না ; তবে শুধু এটুকু বল, তুমি কেন যেতে চাও না—

উত্তরে ও লাফিয়ে পড়ল নিজের ঘেরা জায়গা ছেড়ে। তারপর কাকুতি-মিনিত করতে লাগল, যেন আমি না যাই। ওর জার্মানী কথার মধ্যে বক্তব্যের মানে বোঝার মতো যথেষ্ট ইংরিজী মিশে ছিল। মনে হল,

সব সময়েই ও যেন কিছু একটা আমাকে বলতে গিয়েও থমকে যাচ্ছে—সম্ভবতঃ ভয় পেয়েই ; কিন্তু প্রত্যেকবারই ও বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে শুধু বলছে, 'ভাল্‌পার্গিসের রাত !'

আমি ওর সঙ্গে তর্কে নামতে চাইলাম, কিন্তু কারো ভাষা না জানা থাকলে তার সঙ্গে তর্ক করার চেষ্টাই বৃথা। ফলে হঠাৎ ঘোড়াগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল, বার বার শুঁকতে লাগল বাতাসের গন্ধ। এতে ও ফ্যাকাশে হয়ে গেল, এবং ভয়ার্ত চোখে চারপাশে তাকিয়ে হঠাৎই লাগাম ধরে ঘোড়াগুলোকে প্রায় ফুটবিশেক এগিয়ে নিয়ে গেল। ওকে অনুসরণ করে জানতে চাইলাম, কেন ও এমনটা করল। উত্তরে ও আবার বুকে ক্রুশ আঁকল এবং কাছেই একটা ক্রুশের দিকে ইশারা করে প্রথমে জার্মানী ভাষায়, পরে ইংরিজীতে, বলল, 'এখানে সে শুয়ে আছে—নিজেকে যে মেরে ফেলেছে।'

কেউ আত্মহত্যা করলে তাকে চৌরাস্তার মোড়ে কবর দেবার প্রাচীন রীতিটার কথা আমার মনে পড়ল, 'ও আত্মহত্যা ! আশ্চর্য বটে !'

দুজনে যখন কথা বলছি তখন হঠাৎই শুনতে পেলাম চিৎকার ও গর্জনের মাঝামাঝি এক অদ্ভুত শব্দ। শব্দটা আসছে বহু দূর থেকে ; কিন্তু ঘোড়াগুলো ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ল, এবং ওদের শান্ত করতে জোহানের বেশ সময় লাগল। ফ্যাকাশে মুখে ও বলল, মনে হয় নেকড়ের গর্জন—অথচ এ সময়ে এদিকে কোন নেকড়ে থাকে না।'

বলে শান্ত করার চেষ্টায় ঘোড়াগুলোকে যখন ও আদর করছে, আকাশে শুরু হল কালো মেঘের চঞ্চল আনাগোনা। সূর্যের আলো মুছে গেল, এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া যেন আমাদের গা ঘেঁষে ছুটে গেল পলকে। এই হাওয়ার ঝলক অনেকটা যেন এক বিপদ-সংকেত, কারণ সূর্য আবার দেখা দিল উজ্জ্বল হয়ে। হাতের আড়াল দিয়ে দিগন্তে চোখ রাখল জোহান, বলল, এই তুষার-ঝড়, তার আসতে আর দেরী নেই।' তারপর ও আবার তাকাল নিজের ঘড়ির দিকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হাতে লাগাম টেনে ধরে ও উঠে বসল গাড়ির ঘেরা জায়গায়।

মনে কেমন একটা জেদী ভাব জেগে ওঠায় গাড়ীতে না উঠে আমি

বললাম, এ রাস্তাটা যেখানে গেছে, সে জায়গাটার কথা কিছু বল দেখি—

আবারও বুকে ক্রুশ অাঁকল এবং বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল। তারপর উত্তর দিল, 'জায়গাটা খুব খারাপ।'

'কোন্ জায়গাটা ?' আমি জানতে চাইলাম।

'ঐ গ্রামটা।'

'ও, ওদিকে তাহলে একটা গ্রাম আছে ?'

'না, না। শ' শ' বছর ধরে কেউ ওখানে থাকে না।'

আমার কৌতূহল আরো বেড়ে উঠল, 'কিন্তু তুমি যে বললে, ওখানে একটা গ্রাম আছে '

'এক সময় ছিল।'

'তা এখন কোথায় ?'

এ প্রশ্নে জোহান জার্মানী ও ইংরিজী মিশিয়ে এক লম্বা গল্প ফেঁদে বসল, ফলে ওর কথা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, কিন্তু এটুকু আঁচ করলাম যে, বহু শতাব্দী আগে ওখানে অনেক মানুষ মারা গেছে এবং সেখানেই তাদের কবর দেওয়া হয়েছে ; তারপরেই মাটির নিচে শব্দ শোনা গেছে এবং কবর খুঁড়ে দেখা গেছে যে ঠিক মৃত স্ত্রী-পুরুষেরা সকলেই তরতাজা হয়ে বেঁচে আছে, ওদের ঠোঁট রক্তে লাল টুকটুকে। তখন সেখানে জীবিত যে ক'জন ছিল তারা সকলেই নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে যায় অন্যান্য জায়গায়—যেখানে জীবিত মানুষেরা বাস করে, আর মৃত মৃতই, অন্য—অন্য কিছু নয়। শেষ কথা কটা বলতে ও স্পষ্টতঃই বেশ ভয় পেল। ওর মুখ হয়ে গেল সাদা, দরদর করে ঘামছে, কাঁপতে কাঁপতে চারপাশে দেখছে, যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা এখুনি আবির্ভূত হবে ওর চোখের সামনে। অবশেষে হতাশ যন্ত্রণায় ও চিৎকার করে বলে উঠল, 'ভালপার্গিসের রাত।' এবং গাড়ির দিকে ইশারা করে আমাকে বসতে বলল।

আমার নীল রক্ত এতে যেন জেগে উঠল। এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললাম, 'তুমি ভয় পেয়েছ জোহান—ভয় পেয়েছ। যাও, বাড়ি যাও ; আমি একাই ফিরব।

—ভাল্পার্গিসের রাতের জন্য ইংরেজদের কোন মাথাব্যথা নেই।'

হতাশার ভঙ্গী করে জোহান ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল মিউনিখের দিকে। লাঠিতে ভর দিয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম ওর যাওয়ার পথের দিকে। তারপর হালকা মনে সরু রাস্তাটা ধরে রওনা হলাম জোহানের না-পসন্দ্ উপত্যকার গভীরে। ওর আপত্তির বিন্দুমাত্রও কারণ আমার নজরে পড়ল না; মনে হয়, সময় অথবা দূরত্বের চিন্তা না করে আমি ঘণ্টাদুয়েক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি, এবং একটিও মানুষ কিম্বা বাড়ি আমার চোখে পড়েনি। জায়গাটা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, ওটা জনমানবহীন নির্জন।

বিশ্রামের আশায় একটু বসলাম, তাকিয়ে দেখলাম চারপাশে। হঠাৎই খেয়াল হল, পথচলা শুরু করার সময় যেরকম ঠাণ্ডা ছিল, এখন সেটা তার চেয়ে অনেক বেশি—দীর্ঘশ্বাসের এক অদ্ভুত শব্দ যেন আমাকে ঘিরে রয়েছে, সঙ্গে কখনও সখনও অনেক ওপর থেকে ভেসে আসছে চাপা গর্জন। ওপরে তাকিয়ে নজরে পড়ল আকাশে বিশাল ঘন মেঘের দল অস্থিত গতিতে ভেসে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে। বাতাসে আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত। আমার কেমন যেন শীত করতে লাগল। ভাবলাম, এতক্ষণ হেঁটে আসার পরিশ্রমের পর এখন চুপচাপ বসে রয়েছি, তাই হয়তো শীত করছে, সুতরাং আবার পথ চলা শুরু করলাম। সময়ের দিকে কোন খেয়াল না রেখেই আমি পথ চলেছি, ফলে যখন ঘন হয়ে আসা গোধূলির আলো চারিদিকে জাঁকিয়ে বসল, তখনই আমার দুশ্চিন্তা শুরু হ'ল, কি করে পথ চিনে বাড়ি ফিরে যাব। দিনের উজ্জ্বল আলো তখন মিলিয়ে গেছে। বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা, অনেক ওপরে ভেসে যাওয়া মেঘের মিছিল যেন দলে আরও ভারী হয়েছে। সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে বহু দূর থেকে কিছু একটা ছুটে আসার শব্দ, আর সেটা ভেদ করে কিছুক্ষণ পরে পরেই ভেসে আসছে এক রহস্যময় চিৎকার—এটাকেই আমার কোচোয়ান নেকড়ের চিৎকার বলেছিল।

তাকিয়ে আছি, হঠাৎই বাতাসে এক ঠাণ্ডা কাঁপুনি খেলে গেল, এবং শুরু হ'ল তুষারপাত। পেরিয়ে আসা মাইলের পর মাইল গাছপালাহীন নির্জন পথের কথা আমার মনে পড়ল, সুতরাং আশ্রয়ের খোঁজে দ্রুতপায়ে রওনা হলাম সামনের জঙ্গলের দিকে। আকাশ ক্রমে আরও কালো হয়ে উঠল, বরফ পড়তে লাগল আরও ঘন হয়ে, আরও জোরে—অবশেষে এক-

সময় আমার সামনে ও চারপাশের মাটি হয়ে উঠল এক চকচকে সাদা গালিচা যার শেষ প্রান্ত মিলিয়ে গেছে দূরের অস্পষ্ট কুয়াশায়। ক্রমে বাতাসের গতি বেড়ে উঠল, বয়ে উঠল ঝোড়ো হাওয়া, তখন আমি বাধ্য হয়ে বাতাস ঠেলে ছুটতে শুরু করলাম। ক্ষণে ক্ষণেই আকাশকে চিরে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে জ্বলন্ত বিদ্যুৎ, আর সেই আলোয় নজরে পড়ল, আমার ঠিক সামনেই ঘন তুষারে ঢাকা ইউ ও সাইপ্রেস গাছের গায়ে মাখামাখি জটলা।

অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেই গাছপালার আশ্রয়ে, আর সেই অপেক্ষাকৃত নিঝুম জায়গায় দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম অনেক উঁচুতে ছুটে যাওয়া বাতাসের শন্-শন্ শব্দ। দেখতে দেখতে ঝোড়ো অন্ধকার মিশে গেল রাতের অন্ধকারে। ক্রমে ক্রমে মনে হ'ল ঝড় শান্ত হয়ে আসছে; এখন মাঝে মধ্যে শুধু শোনা যাচ্ছে দুরন্ত হাওয়ার ঝটকা। সেই মুহূর্তে নেকড়ের অপার্থিব চিৎকার যেন হাজারো প্রতিধ্বনি তুলল আমার চারদিকে।

কখনও কখনও অলসভাবে ভেসে যাওয়া ঘন কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছে বিক্ষিপ্ত চাঁদের আলো। সেই আলোয় দেখলাম সাইপ্রেস ও ইউ গাছের এক ঘন জটলার কিনারায় এসে আমি দাঁড়িয়েছি। তুষারপাত থেমে যাওয়ায় আমি আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম এবং আরও খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম জায়গাটা। মনে হ'ল, যেসব প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আমার চোখে পড়েছে তার মধ্যে একটা বাড়ি জীর্ণ হলেও এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং সেখানেই হয়তো আমি কিছুক্ষণের জন্যে আশ্রয় পেতে পারি।

ঝোপঝাড়ের কিনারা ঘুরে এগিয়ে যেতেই আবিষ্কার করলাম একটা নীচু দেওয়াল বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে, এবং এই দেওয়াল অনুসরণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেতরে ঢোকার সরু পথ খুঁজে পেলাম। এটুকু নজরে পড়ামাত্রই ভেসে যাওয়া মেঘ চাঁদকে আড়াল করে দিল; কিন্তু সামনেই আশ্রয়ের হাতছানি, অতএব আমি অন্ধের মত হাঁতড়ে এগিয়ে চললাম।

হঠাৎ এক নিস্তব্ধতার মুখোমুখি হয়ে আমি থমকে দাঁড়ালাম। ঝড় থেমে গেছে; এবং সম্ভবত নিঃশব্দ স্তব্ধ প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতিবশে আমার হৃৎপিণ্ডও যেন বন্ধ করেছে তার স্পন্দন। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য;

কারণ হঠাৎই মেঘ চিরে এসে পড়ল চাঁদের আলো, আমাকে জানিয়ে দিল যে আমি এক কবরখানায় এসে দাঁড়িয়েছি, এবং আমার সামনেই যে চৌকো স্তুপটা রয়েছে সেটা বিশাল এক সমাধি-প্রস্তর, ওটার ওপরে ও চারপাশে ছড়িয়ে থাকা তুষারের মতই শুভ্র তার রঙ। চাঁদের আলোর হাত ধরে ভেসে এলো ঝড়ের এক ভয়ঙ্কর দীর্ঘশ্বাস, এবং অসংখ্য কুকুর অথবা নেকড়ের মত চাপা একটানা গর্জন করে সে যেন তার পুরোনো তোলপাড় আবার শুরু করল। এক অদ্ভুত আকর্ষণে আমি এগিয়ে চললাম সেই মার্বেল পাথরের তৈরি সেই সমাধির দিকে। দেখতে, ওটা কার, এবং কেনই বা এইরকম একটা জায়গায় এইরকম একটা জিনিস একা একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওটার চারপাশ ঘুরে অবশেষে ডরিস-দেশীয় দরজার ঠিক ওপরে জার্মানী ভাষায় লেখা কথাগুলো পড়তে পারলাম ঃ

ষ্টাইরিয়ার গ্রাৎস্‌-এর কাউন্টেস ডলিংগেন
প্রার্থিত মৃত্যুকে পেয়েছেন ১৮০১

সমাধি-প্রস্তরের ঠিক ওপরে নিরেট পাথরে যেন পুতে দেওয়া হয়েছে এক বিশাল লোহার গজাল কিম্বা শূল। ওটার পিছন দিকে যেতেই নজরে পড়ল বড় বড় রুশ হরফে খোদাই করা রয়েছে।

'মৃতেরা দ্রুত চলে।'

পুরো ব্যাপারটায় এমন একটা অপার্থিব গা ছমছমে আমেজ ছিল যে আমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল, যেন এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাব। এই প্রথম মনে হ'ল যে জোহানের উপদেশ শুনলেই বোধহয় ভাল ছিল। হঠাৎই একটা চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেল, এই রহস্যময় পরিস্থিতিতে আকস্মিক আঘাতের মতই ঝলসে উঠল সেটা আজকের রাত ভাল্‌পার্গিসের রাত।'

ভাল্‌পার্গিসের রাত। লক্ষ লক্ষ লোকের বিশ্বাস অনুযায়ী যে রাতে শয়তান যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়—সমস্ত কবর খুলে যায়, মৃতেরা বেরিয়ে আসে বাইরে, চলে বেড়ায়। যে রাতে জল, স্থল, অন্তরীক্ষের সমস্ত অশুভ জিনিস আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। আমার সমস্ত দর্শন, শেখা সমস্ত ধর্ম, সমস্ত সাহস এক জায়গায় জড়ো করলাম, যেন অন্ধ আতঙ্কে ভেঙে না পড়ি।

এবার এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ফুঁসে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। মাটি এমনভাবে কাপতে লাগল যেন হাজার ঘোড়া দুদ্দাড় করে তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে ; এবং এইবার তুষার নয়, বিরাট আকারের সব শিলাপিণ্ড দুরন্ত গতিতে ছুটে চলল এবং তার আঘাতে গাছের ডালপালা পাতা সব খসে পড়তে লাগল ফলে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম এবং রওনা হলাম আশ্রয় দিতে পারে এমন এক ও একমাত্র জায়গা লক্ষ্য করে : সমাধি-প্রস্তরের গভীর ডরিসীয় দরজা। বিশাল ব্রোঞ্জের দরজার গায়ে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে মুষলধারে শিলাবৃষ্টির হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পেলাম।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেই ওটা সামান্য নড়ে উঠল এবং খুলে গেল ভিতর দিকে। এই নিষ্ঠুর ঝড়ের মুখে কোন সমাধির আশ্রয়ও অনেক বেশি সুখের, কিন্তু যেই আমি ভেতরে ঢুকতে যাব, ঠিক তক্ষুণি অসংখ্য রেখায় আঁকাবাকা বিদ্যুৎ ঝল্‌সে উঠে সারা আকাশে আলোর রোশনাই জ্বালিয়ে দিল। সেই মুহূর্তে, সমাধির অন্ধকারে চোখ ফিরিয়ে স্পষ্ট দেখলাম, একটা শবযানে ঘুমিয়ে আছে ভারী গাল ও টুকটুকে লাল ঠোঁট এক সুন্দরী মহিলা —আমি যেমন বেঁচে আছি, এ দৃশ্য তেমনি সত্যি। বজ্রপাতের শব্দটা আকাশে ভেঙে পড়তেই যেন এক দানবের হাত আমাকে চেপে ধরে ছুড়ে ফেলে দিল বাইরের বিক্ষুব্ধ ঝড়ের মধ্যে। সমস্ত ঘটনাটা এত আকস্মিক-ভাবে ঘটল যে মানসিক ও শারীরিক আঘাত পুরোপুরি বুঝে ওঠার আগেই টের পেলাম অসংখ্য শিলাপিণ্ড তোড়ে আছড়ে পড়ছে আমার ওপর। একই সঙ্গে এক অদ্ভুত আচ্ছন্ন করা অনুভূতি যেন আমাকে বলে দিল, আমি একা নই। এবার চোখ ফেরালাম সমাধির দিকে। সেই মুহূর্তেই দেখা গেল চোখ ধাঁধানো এক আলোর ঝলকানি, সেটা আঘাত করল সমাধির ওপরে গাঁথা লোহার শূলের ওপর, তারপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মার্বেল পাথর চুরমার করে আগুনের তাণ্ডব ধরিয়ে যেন সরাসরি ঢুকে গেল মাটিতে। এক যন্ত্রণাময় মুহূর্তের জন্য উঠে দাঁড়াল সেই মহিলা, আগুনের শিখা তাকে জড়িয়ে লকলক করে জ্বলছে, এবং তার মৃত্যু যন্ত্রণার আর্ত চিৎকার ডুবে গেল বজ্রপাতের শব্দে। শেষ যা শুনতে পেলাম, তা হ'ল এইসব ভয়ংকর শব্দ-রোলের মিশ্রণে জন্ম নেওয়া এক বিচিত্র শব্দ, কারণ ততক্ষণে সেই দৈত্যের

হাত আবার আমাকে বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলেছে, শিলাবৃষ্টি আছড়ে পড়ছে শরীরে, এবং নেকড়ের গর্জনে কেঁপে উঠছে বাতাস। শেষ যে দৃশ্য মনে আছে তা হল, অস্পষ্ট সাদা এক চলমান স্তূপ, যেন চারপাশের সমস্ত সমাধি তাদেব আচ্ছাদিত মৃতদেহের প্রেতাত্মাগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে, এবং তারা দুরন্ত শিলাবৃষ্টির সাদা ধোঁয়াশা ভেদ করে আমাকে ক্রমশ ঘিরে ধরছে।

ধীরে ধীরে অস্পষ্টভাবে চেতনা ফিরে আসতে লাগল; তারপর এক গভীর ক্লান্তির অনুভূতি। কয়েক মুহূর্তের জন্য কিছুই মনে করতে পারলাম না; তারপর আস্তে আস্তে চেতনা ফিরে আসতে লাগল। আমার পা দুটোয় অসহ্য অস্থির যন্ত্রণা, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ওদের একচুল নাড়াতে পারছি না। পা দুটো যেন অসাড হয়ে গেছে। আমার ঘাড়ে এক বরফ-শীতল স্পর্শ এবং মেরুদণ্ড, কান, সব যেন আমার পায়ের মতই মৃত, অথচ তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির; কিন্তু আমার বুকে এক অদ্ভুত উষ্ণ স্পর্শ তৃপ্তির স্বাদ এনে দিচ্ছে। এ যেন এক দুঃস্বপ্ন— সঠিক বলতে গেলে, এক বাস্তব দুঃস্বপ্ন; কারণ আমার শ্বাস-প্রশ্বাসকে কষ্টকর কবে তুলছে।

এক অগাধ স্তব্ধতা আমাকে ঘিবে ধরল, যেন সারাটা পৃথিবী ঘুমে অচেতন কিংবা মৃত—শুধু থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে, আমার খুব কাছে দাঁড়িযে থাকা হয়তো কোন জন্তুব চাপা হাঁপানিব শব্দ। গলায টের পেলাম এক উষ্ণ কর্কশ স্পর্শ, তারপর ভযংকব সত্যের মুখোমুখি হলাম, আমার হৃৎপিণ্ড যেন বরফে জমে গেল, রক্তের জোয়ার ছুটে গেল মস্তিষ্কের শিরায় শিরায়। একটা বিশাল জন্তু আমার শরীরের ওপব বসে আমার গলা চাটছে। চোখের ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়ে দেখলাম, আমাব মুখের ঠিক সামনেই এক প্রকাণ্ড নেকড়ের দুটো বিশাল জ্বলন্ত চোখ। হাঁ-কবা লাল মুখে ধারালো সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করছে এবং ওটাব গরম ঝাঁঝালো নিঃশ্বাসে আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি।

আরও কিছু সময়ের জন্য আমার স্মৃতিশক্তি অচল হল! তারপর শুনতে পেলাম একটা চাপা গর্জন, পরক্ষণেই এক চিৎকার—একবার, দুবার, বার-

বার। তারপর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা সমবেত কণ্ঠে শুনতে পেলাম, 'হ্যালো! হ্যালো!' অতি সাবধানে মাথা তুলে শব্দ লক্ষ্য করে তাকালাম, কিন্তু সমাধিক্ষেত্র আমার দৃষ্টি আড়াল করল। নেকড়েটা তখনও অদ্ভুতভাবে চিৎকার করছে, এবং একটা লাল আভা সাইপ্রেস কুঞ্জে চলেফিরে বেড়াতে লাগল, যেন শব্দটাকে অনুসরণ করছে। কণ্ঠস্বরগুলো আরও কাছে আসতেই নেকড়েটার গর্জন আরও দ্রুত, আরও জোরালো হয়ে উঠল। সাড়া দিতে বা নড়াচড়া করতে আমি ভয় পেলাম। তারপর হঠাৎই ঘিরে থাকা গাছের আড়াল থেকে শোনা গেল একদল ঘোড়সওয়ারের ঘোড়া ছুটিয়ে আসার শব্দ, হাতে তাদের জ্বলন্ত টর্চ। নেকড়েটা আমার বুক ছেড়ে উঠে পড়ল, রওনা হল সমাধিস্থলের দিকে। একজন ঘোড়সওয়ারকে (টুপি ও লম্বা কোট দেখে ওদের সৈনিক বলেই মনে হলো) দেখলাম বন্দুক তুলে তাক করতে। অন্য একজন তার হাত ঠেলা মারলো, গুলিটা শিস দিয়ে বেরিয়ে গেল আমার মাথার ওপর দিয়ে। সে নিশ্চয়ই আমাকে নেকড়ে বলে ভুল করেছে। চুপিসারে পালিয়ে যাওয়া জন্তুটাকে আর একজন দেখতে পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল গুলির শব্দ। তারপর দু-চার কদমেই ঘোড়-সওয়ারের দল কাছে এসে গেল—কেউ এল আমার কাছে, আর কেউ কেউ গেল বরফে সাজানো সাইপ্রেস গাছের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া নেকড়েটাকে অনুসরণ করতে।

ওরা কাছে আসতেই আমি নড়াচড়া করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু শক্তি খুঁজে পেলাম না, অথচ আমি আমার চারপাশে যা যা হচ্ছে তার সবই দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। দু-তিনজন সৈনিক ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল, হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল আমার পাশে। একজন আমার মাথা তুলে ধরল, হাত রাখল আমার বুকে।

'ভাল খবর, কমরেড!' সে চিৎকার করে উঠল, 'ভদ্রলোক এখনো বেঁচে আছেন!'

তারপর কিছুটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দেওয়া হল আমার গলায়; শরীরে যেন শক্তি ফিরে এলো, এবার চোখ পুরোপুরি মেলতে পারলাম, তাকালাম চারিদিকে। গাছের সমারোহে আলো ও ছায়া চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে,

শুনতে পেলাম লোকজনের চিৎকার করে পরস্পরকে ডাকাডাকির শব্দ। ভয়ার্ত চিৎকারে বিস্ময় প্রকাশ করতে করতে ওরা ক্রমে এক জায়গায় জড়ো হল; ভূতে পাওয়া মানুষের মত অন্যান্যরা কবরখানার গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে এলো, টর্চের আলো ঝলসে উঠতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে। দূরের লোকজন সবাই যখন কাছে চলে এল তখন আমাকে ঘিরে থাকা লোকেরা অধীর আগ্রহে ওদের প্রশ্ন করল 'কি হল, ওটাকে পাওয়া গেল?'

উত্তর পাওয়া গেল ঝটিতি, না! না! শীগগীর চল -- জলদি! এ জায়গায় থাকা ঠিক নয়, বিশেষ করে আজকের রাতে!'

'ওটা কি ছিল?' একাধিক সুরে ধ্বনিত হল এই প্রশ্ন। উত্তর পাওয়া গেল বিভিন্ন এবং অস্পষ্ট, যেন সবাই এক বিশেষ আবেগে কথা বলতে চাইছে অথচ কি এক আতঙ্কে নিজের জিভের রাশ টেনে ধরছে।

'ওটা - ওটা — একটা—' দিশেহারা চিন্তা নিয়ে তোতলা স্বরে বলতে চাইল একজন।

'একটা নেকড়ে— অথচ নেকড়েও ঠিক নয়!' শিউরে উঠে বলল আর একজন।

'পবিত্রগুলি ছাড়া ওটাকে কিছু করা সম্ভব নয়,' স্বাভাবিক সুরে মন্তব্য করল তৃতীয় কোন ব্যক্তি।

'এ রাতে যেমন বেরিয়েছি, তেমনি উচিত শিক্ষা হয়েছে! আমাদের হাজার মার্ক আমরা সত্যি খেটে উপায় করেছি!' চতুর্থজনের মুখ ফুটে বেরিয়ে এলো।

'ভাঙা মার্বেল পাথরের ওপর রক্ত ছিল, আর একজন বলল, 'সেটা তো আর বজ্রপাত থেকে আসেনি। আর এই ভদ্রলোক—এঁর আর কোন ভয় নেই তো? গলাটা একবার দেখ! দেখ, কমরেড, নেকড়েটা এই ভদ্রলোকের গায়ের ওপর শুয়ে তাঁর রক্ত গরম রেখেছে।'

অফিসারটি আমার গলার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, 'ভদ্রলোকের আর কোন ভয় নেই; চামড়ায় কোন ক্ষত হয়নি। এসবের মানে কি? নেকড়েটার চিৎকার না শুনলে আমরা একে খুঁজেই পেতাম না।'

'নেকড়েটার কি হল?' আমার মাথাটা যে তুলে ধরেছিল সে জিজ্ঞেস করল।

'ওটা নিজের আস্তানায় ফিরে গেছে, লম্বাটে বিবর্ণ মুখ লোকটি উত্তর দিল, আতঙ্কে সে কাঁপছে, 'এখানে অনেক কবর রয়েছে, তারই একটায় হয়তো ওটা থাকে। এসো, কমরেড—জলদি চল! এই অভিশপ্ত জায়গা ছেড়ে আমরা চলে যাই।'

অফিসারটি আমাকে তুলে ধরলেন বসানোর ভঙ্গীতে, আদেশের সুরে কি যেন বললেন; তখন কয়েকজন মিলে আমাকে বসিয়ে দিল, ঘোড়ার পিঠে। সে লাফিয়ে উঠে বসল আমার পিছনে, আমাকে জড়িয়ে ধরল দু'-হাতে, এগোতে নির্দেশ দিল সবাইকে; অতএব সাইপ্রেস গাছের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা সামরিক শৃঙ্খলায় দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম।

আমার জিভ তখনও বিদ্রোহ করায় আমি চুপ করে থাকতে বাধ্য হলাম। নিশ্চয়ই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; কারণ পরের যে ঘটনা মনে আছে, তা হল আমি দাঁড়িয়ে আছি, দু'পাশে দুজন সৈনিক আমাকে ধরে রেখেছে। চারিদিকে প্রায় উজ্জ্বল দিনের আলো, আর উত্তর দিকে প্রতিফলিত হয়েছে সূর্যের আলোর এক লাল রেখা, আনকোরা তুষারের ওপর যেন রক্ত ঢেলে তৈরি এক পায়ে চলা পথ। অফিসার তখন অন্যান্যদের বলছেন যে তারা যা দেখেছে তা যেন কাউকে না বলে—শুধু যেন বলে যে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ইংরেজকে পাওয়া গেছে—আর একটা বিরাট কুকুর তাকে পাহারা দিচ্ছিল।

'কুকুর। ওটা তো কুকুর ছিল না,' সবচেয়ে ভয় পাওয়া মানুষটা বাধা দিয়ে বলল, 'নেকড়ে দেখলে আমার চিনতে ভুল হয় না।'

তরুণ অফিসার শান্ত স্বরে জবাব দিল, 'আমি বলছি কুকুর।'

'কুকুর!' ব্যঙ্গভরে পুনরাবৃত্তি করল অন্যজন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সূর্যের তেজের সঙ্গে সঙ্গে তার সাহসও বাড়ছে; তারপর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'ভদ্রলোকের গলাটা দেখুন। ওটা কি কোন কুকুরের কাজ, স্যার?'

সহজাত প্রবৃত্তিবশে আমি হাত দিলাম গলায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায়

চিৎকার করে উঠলাম। ওরা আমাকে ঘিরে ধরল দেখবার জন্যে, কেউ কেউ তাদের জিন থেকে ঝুঁকে পড়ল, আর তখনই আবার শোনা গেল সেই তরুণ অফিসারের কণ্ঠস্বর, আমি যা বললাম—কুকুর। এ ছাড়া অন্য কিছু বলতে গেলে সবাই আমাদের কথায় হাসবে।'

এরপর আর একজন অশ্বারোহী সৈনিকের ঘোড়ায় আমাকে তুলে দেওয়া হল, এবং আমরা মিউনিখের শহরতলী অঞ্চলে ঢুকে পড়লাম সেখানে হঠাৎই একটা জুড়িগাড়ি দেখতে পেয়ে আমাকে সেটাতে তুলে দেওয়া হ'ল, গাড়ি ছুটে চলল আমার হোটেল অভিমুখে- তরুণ অফিসারটি আমার সঙ্গী হলেন, আর একজন সৈনিক ঘোড়ায় চড়ে আমাদের অনুসরণ করল, বাকিরা ফিরে গেল তাদের ব্যারাকে।

আমরা পৌঁছতেই হের্ ডেলব্রুক এত তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি নেমে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন যে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি মনে মনে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন। অফিসারটি আমাকে অভিবাদন করে যখন বিদায় নিতে চলেছে, তখন আমি তাকে এবং তার সাহসী কমরেডদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম সে খুব সহজ গলায় উত্তর দিল যে, সে ভীষণ খুশি হয়েছে, এবং অনুসন্ধান-কারী দলকে তুষ্ট করার জন্য হের্ ডেলব্রুক আগেই সব ব্যবস্থা করেছেন, এই হেঁয়ালিভরা কথায় হোটেল পরিচালক হাসলেন, এবং অফিসারটি কাজের ওজর দেখিয়ে বিদায় নিল।

কিন্তু হের্ ডেলব্রুক', আমি জানতে চাইলাম, 'সৈন্যদলের লোকেরা আমাকে কি করে, আর কেনই বা খুঁজতে গেল?'

নিজের কাজের জন্য যেন লজ্জায় কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, তারপর উত্তর দিলেন, 'আমার ভাগ্য ভাল যে আমার দলের সেনাপতির কাছ থেকে ছুটি পেয়েছি, এবং অনুসন্ধানের জন্য স্বেচ্ছাসৈনিকের দল চাইতে পেরেছি।'

'কিন্তু কি করে জানলেন যে আমি পথ হারিয়েছি?' 'আমি প্রশ্ন করলাম।

কোচোয়ান তার ভাঙাচোরা গাড়ী নিয়ে এখানে এসেছিল, ঘোড়াগুলো পালিয়ে যাওয়ার পর তার গাড়ি উলটে যায়।

'কিন্তু শুধু এই কারণেই তো আর সৈন্যবাহিনী থেকে অনুসন্ধান দল পাঠানো যায় না।

না, না!' সে তার উত্তর দিল, 'আসলে কোচোয়ান আসার আগেই আপনি যার অতিথি সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে এই খবরটা আমি পাই,' বলে পকেট থেকে একটা তার আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, এবং আমি পড়লাম :

বিস্ ত্রিজ

আমার অতিথি সম্পর্কে সাবধান—তাঁর নিরাপত্তা আমার কাছে অমূল্য। তাঁর যদি সামান্য কিছুও হয়, বা তিনি হারিয়ে যান, তাহলে তাঁকে খুঁজে বের করে নিরাপত্তা অটুট রাখতে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখবেন না। ভদ্রলোক ইংরেজ, ফলে ভ্রমণবিলাসী। তুষার, নেকড়ে ও অন্ধকার রাত প্রায়ই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। যদি তাঁর বিপদের সামান্যতম আভাসও পান একটা মুহূর্তও নষ্ট করবেন না। আপনার উৎসাহ ও প্রচেষ্টার যথাযথ উত্তর আমার ঐশ্বর্য দেবে।

—ড্রাকুলা

তারটা হাতে নিয়ে মনে হল ঘরটা আমার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, আর তৎপর হোটেল পরিচালক যদি আমাকে না ধরে ফেলতেন, তাহলে হয়তো আমি পড়েই যেতাম। সমস্ত ঘটনার মধ্যেই কেমন একটা অদ্ভুত জিনিস রয়েছে, সেটা এতই অপার্থিব যে কল্পনা করা দুঃসাধ্য, আমি যেন বিপরীত শক্তির হাতে এক খেলনা হয়ে গিয়েছিলাম—এই চিন্তার আভাস-টুকুই আমাকে যেন অসাড় পঙ্গু করে দিল। নিঃসন্দেহে আমি এক ধরনের রহস্যময় কোন নিরাপত্তার আশ্রয়ে ছিলাম। এক দূর দেশ থেকে ঠিক সঙ্কটজনক মুহূর্তে এসেছে এক তারবার্তা, তুষার-ঘুম ও নেকড়ের দাঁত থেকে বাঁচিয়ে আমাকে বিপদমুক্ত করেছে।

ব্রাম স্টোকার : (১৮৪৭—১৯১২ : ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত হরর ক্লাসিক 'ড্রাকুলা' লিখে ব্রাম স্টোকার সারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়ে পড়েন। 'ড্রাকুলা' নাটকে রূপান্তরিত হয়, পরে চলচ্চিত্রে একাধিকবার। শোনা যায়, 'ফ্রাঙ্কেন্স্টাইন' উপন্যাসের মতো এই বইটিও স্টোকার লিখে-ছিলেন কোন প্রতিযোগিতার জন্য। 'ড্রাকুলা'স গেস্ট' গল্পটি প্রথমে মূল পাণ্ডুলিপিরই অংশ ছিলো, কিন্তু পরে বাদ দেওয়া হয় লেখকের নিজের বিচারেই।

আইরিশ লেখক ব্রাম স্টোকারের আসল নাম ছিলো আব্রাহাম স্টোকার। ছোটবেলা থেকেই লেখার দিকে ঝোঁক ছিলো তাঁর। ১৮৭০ সালে স্নাতক হওয়ার পর কেরানী হিসেবে চাকরি-জীবন শুরু করেন। পরে এক নাট্য কোম্পানীর ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর লেখা শেষ উপন্যাস 'দ্য লেয়ার অফ হোয়াইট ওয়ার্ম'। আরও অনেক লেখা লেখার পরিকল্পনা থাকলেও ১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে অকালমৃত্যু তাঁর পরিকল্পনায় বাদ সাধে। সন্দেহ নেই, কাউণ্ট ড্রাকুলার স্রষ্টা হিসেবে তিনি চিরকাল স্থায়ী থাকবেন রহস্য পিপাসু পাঠকের মনে।

ওয়াজ ইট এ ড্রীম

গী. দ্য. মঁপাসা

মনে হল যেন আয়নাটাকে আমি ভালোবাসি। ওটা স্পর্শ করলাম ঠাণ্ডা। ওঃ, সেই স্মৃতি! বিষণ্ণ আয়না, জ্বলন্ত আয়না, ভয়ঙ্কর আয়না। তুমি মানুষকে কত যন্ত্রণা দাও ··

* * *

ওকে আমি পাগলের মত ভালোবাসতাম!

মানুষ কেন ভালোবাসে? কেন মানুষ ভালোবাসে? কি অদ্ভুত লাগে যদি কেউ পৃথিবীতে শুধু একজনকেই দেখে, মনে একজনকেই ভাবে, অন্তরে একজনকেই চায় এবং তার ঠোঁটে থাকে শুধু একটাই নাম—যে নাম ক্রমাগত উঠে আসে ঝর্ণার জলের মত, আত্মার গভীর স্তর থেকে পৌঁছে যায় ঠোঁটের সীমারেখা পর্যন্ত, যে নাম সে উচ্চারণ করে বার বার, অনলসভাবে সর্বত্র ফিস ফিস করে ঈশ্বরের প্রার্থনা-সঙ্গীতের মত।

আমাদের গল্পটা এবার আপনাদের বলব, কারণ প্রেমের গল্প বলতে শুধু একটাই, এবং সে গল্প বরাবর সেই একই। ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং তারপর থেকে আমি বেঁচে ছিলাম ওর কোমলতায়, ওর আদরে, ওর আশ্লেষে, ওর পোশাকে, ওর কথায়, একেবারে এমন ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে ওর প্রতিটি জিনিসে বাঁধা পড়েছি যে আমাদের এই পৃথিবীতে রাত কি দিন তার পরোয়া আমি করিনি, এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবিনি আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি।

আর তার পরই ও মারা গেল। কেমন করে? আমি জানি না, তার পর থেকে আর কিছুই জানি না। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ও ভিজে ফিরল বাড়িতে, এবং পরদিন থেকেই কাশতে শুরু করল, এক সপ্তাহ

চলল এই কাশি, তারপরই ও বিছানা নিল। ঠিক কি যে হয়েছিল আমার এখন স্পষ্ট মনে নেই, তবে ডাক্তারবাবুরা এসেছে, লেখালিখি করেছে, আবার চলেও গেছে। ওষুধ কিনে আনা হল এবং অন্যান্য মহিলারা সে ওষুধ ওকে খাইয়ে দিল। ওর দুটো হাত গরম, কপাল যেন পুড়ে যাচ্ছে, আর দু'চোখ উজ্জ্বল ও বিষন্ন। আমি কথা বলতেই ও উত্তর দিল, কিন্তু কি কথা আমরা বলেছি আমার মনে নেই। সবকিছু আমি ভুলে গেছি, সবকিছু, সবকিছু! ও মরে গেল, আমার স্পষ্ট মনে আছে, ওর সেই হালকা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস! নার্স বলে উঠল, আহা রে। তখন আমি বুঝলাম, সব বুঝতে পারলাম!

আর কিছুই আমি জানি না, কিছু না। একজন ধর্মযাজকের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন, কে, আপনার প্রণয়িনী? আর আমার মনে হল উনি যেন ওকে অপমান করছেন। ও মরে গেছে, সুতরাং এ কথা বলার অধিকার এখন আর কারো নেই, সুতরাং আমি সেই ধর্মযাজককে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। আর একজন এলেন, নরম ও দয়ালু প্রকৃতির। তিনি যখন ওর কথা আমাকে শোনাতে লাগলেন তখন আমি শুধু চোখের জল ফেলে চললাম।

ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে সবাই আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে, কিন্তু ওরা কে কি বলেছে কিছুই আমার মনে নেই, বরং কফিনের কথাটা আমার মনে আছে, মনে আছে ওকে শুইয়ে দিয়ে কফিনে পেরেক ঠোকার হাতুড়ির শব্দ। ওঃ! ভগবান, ভগবান!

ওকে কবর দেওয়া হল! কবর! ওকে! ঐ গর্তে! কিছু কিছু লোক এলো—মেয়ে বন্ধুর দল। আমি লুকিয়ে ছুটে পালিয়ে এলাম। ছোটা শেষ করে বিভিন্ন পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম, একসময় পৌঁছলাম বাড়িতে এবং পরদিনই পাড়ি দিলাম দেশান্তরে।

গতকালই আমি প্যারিসে ফিরে এসেছি, এবং নিজের ঘরে ঢুকতেই নতুন এক দুঃখের ঢেউ নিষ্ঠুরভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর, আমাকে গ্রাস করল, মনে হল, জানলা খুলে এখুনি লাফিয়ে পড়ি নীচের রাস্তায়। কারণ আমার চোখের সামনে আমাদের ঘর, আমাদের বিছানা, আমাদের আসবাবপত্র, কোন মানুষের মৃত্যুর পর তার জীবনের যতটুকু পড়ে থাকা-

সম্ভব তার সবটুকুই উপস্থিত। এসব জিনিসের মাঝে আমি আর একমুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, এই দেওয়াল একদিন ওকেইঘিরে ছিল, আশ্রয় দিয়েছিল, এই দেওয়ালের প্রতিটি অদৃশ্য ফাটলে রয়েছে ওর সহস্র পরমাণুর স্বাক্ষর, ওর ত্বক ও নিশ্বাসের অস্তিত্ব। সুতরাং টুপিটা তুলে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলাম, এবং যেই দরজার কাছে এসেছি চোখ পড়ল হলঘরের বিশাল আয়নাটায়! আয়নাটা ও-ই এখানে বসিয়েছিল যাতে বাইরে বেরোবার সময় ও নিজের আপাদমস্তক দেখতে পায়, পরখ করতে পারে সাজগোজ ঠিক আছে কি না, সুন্দর দেখাচ্ছে কি না, পায়ের জুতো থেকে মাথার টুপি পর্যন্ত সবকিছু নিখুঁত হল কি না;

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আয়নাটার সামনে। এই আয়না কত বার ওর ছায়া বুকে ধরেছে—এত বহু বার যে সে ছায়া নিশ্চয়ই স্থায়ী হয়ে আছে আয়নার কাঁচের গভীরে! আমি সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁপতে শুরু করলাম, আমার চোখ কাঁচের ওপরে স্থির - সমতল, গভীর, শূন্য কাঁচে—যে কাঁচ ওকে গ্রহণ করেছে সম্পূর্ণ ভাবে, অধিকার করেছে আমারই মত, আমার প্রণয়াচ্ছন্ন দৃষ্টির মত। মনে হল যেন আয়নাটাকে আমি ভালোবাসি। ওটা স্পর্শ করলাম; ঠাণ্ডা। ওঃ, সেই স্মৃতি! বিষণ্ণ আয়না, ভয়ংকর আয়না, তুমি মানুষকে কত যন্ত্রণা দাও! সেই মানুষই সুখী যার হৃদয় ভুলে যায় কতটুকু সে পেয়েছিল, কতটুকু সে পেয়েছিল, তার গভীরে চোখ মেলে কে তাকিয়েছিল, ভুলে যায় তার অনুরাগে ভালোবাসায় প্রতিফলিত হওয়া সবকিছু! সত্যি, কি কষ্টই না আমি পাচ্ছি!

সে সব কিছু না ভেবে, না জেনে আমি বেরিয়ে এলাম, রওনা হলাম কবরখানার দিকে। ওর সাদাসিধে সমাধি আমি খুঁজে পেলাম—একটা সাদা ক্রুশচিহ্ন ও এই ক'টি কথা লেখা:

'ও ভালোবেসেছিল, ভালোবাসা পেয়েছিল, অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছে।'

ওর ক্ষয়ে যাওয়া শরীর এর নিচেই শুয়ে রয়েছে। ভয়ংকর! মাটিতে মাথা রেখে আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম, এবং অনেক অনেকক্ষণ বসে রইলাম সেখানে। তারপর এক সময় লক্ষ্য করলাম, অন্ধকার নেমে আসছে, এবং এক অদ্ভুত পাগল করা ইচ্ছে—হতাশ কোন প্রেমিকের ইচ্ছে—আমাকে

গ্রাস করল। ইচ্ছে করল, ওর সমাধিতে চোখের জল ফেলে সারাটা রাত আমি কাটিয়ে দিই, কাটিয়ে দিই শেষ একটা রাত। কিন্তু আমাকে এখানে দেখতে পেলেই বের করে দেওয়া হবে। কি করে সেটাকে আমি রোধ করি? বুদ্ধি আমার আছে, সুতরাং উঠে দাঁড়িয়ে মৃতের শহরে ঘুরতে শুরু করলাম। হেঁটে চললাম, শুধু হেঁটে চললাম। যে শহরে আমরা বাস করি তার তুলনায় এই শহর কত ছোট। অথচ জীবিতদের চেয়ে মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি। আমাদের দরকার হয় বিশাল বিশাল বাড়ি, চওড়া রাস্তা, যে চারপুরুষ একসঙ্গে দিনের আলো দেখে তাদের জন্যে চাই যথেষ্ট জায়গা।

আর মৃতদের সমস্ত পুরুষের জন্যে, যে মনুষ্যত্বের ধারা নেমে এসে আমাদের ছুঁয়েছে, তাদের জন্যে প্রায় কিছুই দরকার হয় না, কিছু না। পৃথিবীর মাটি তাদের ফিরিয়ে নেয়, এবং বিস্মৃতি তাদের মুছে ফেলে। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

কবরখানার শেষপ্রান্তে পৌঁছে হঠাৎই বুঝতে পারলাম আমি একেবারে প্রাচীন অংশে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখানে মৃতেরা শুয়ে আছে অনেক দিন ধরে, এবং ওদের দেহ এখন মিশে যাচ্ছে মাটির সঙ্গে, এখানকার ক্রুশ চিহ্নগুলো ক্ষয়ে গেছে কালের প্রকোপে, আর আগামীকাল থেকেই সম্ভবত নতুনদের এখানে এনে শোওয়ানো হবে। অযত্নে বেড়ে ওঠা অসংখ্য গোলাপ ও বিশাল কালো সাইপ্রেস গাছে জায়গাটা ছেয়ে আছে—এক বিষণ্ণ অথচ সুন্দর বাগান, নরমাংসে লালিত-পালিত।

আমি এখানে একা, সম্পূর্ণ একা। সুতরাং একটা সবুজ গাছের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে বসলাম, ঘন ও মলিন শাখা প্রশাখার মাঝে নিজেকে পুরোপুরি লুকিয়ে ফেললাম। জাহাজডুবি হওয়া কোন মানুষ যেমন করে ভাসমান কাঠের টুকরো আঁকড়ে ধরে, ঠিক তেমনি করে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে আমি অপেক্ষায় রইলাম।

যখন পুরোপুরি অন্ধকার হল, আমি আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এলাম, এবং হালকা, ধীর ও নিঃশব্দ পায়ে মৃত মানুষে আকীর্ণ ঐ মাটিতে পায়চারি করতে শুরু করলাম। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু ওর সমাধি

আর দ্বিতীয়বার খুঁজে পেলাম না। দু-হাত সামনে বাড়িয়ে, হাতে, পায়ে, হাঁটুতে, বুকে, এমন কি মাথাতেও পর্যন্ত বিভিন্ন সমাধির ধাক্কা খেয়ে আমি এগিয়ে চললাম, কিন্তু তবু ওকে খুঁজে পেলাম না। অন্ধের মত আমি পথ হাঁতড়ে চললাম, স্পর্শে অনুভব করলাম সমাধি-প্রস্তরগুলো, ক্রুশগুলো, তাদের লোহার রেলিং, ধাতুর মালা ও বিবর্ণ ফুলের অঞ্জলি! আঙুলে অনুভব করে অক্ষরে আঙুল বুলিয়ে তাদের নামগুলো আমি পড়তে লাগলাম। কি ভয়ংকর রাত! কি ভয়ংকর রাত! ওকে আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না!

আকাশে চাঁদ নেই। এ এক অদ্ভুত রাত। আমি ভয় পেলাম। কবরের দুই সারির মাঝে সরু পথটায় দাঁড়িয়ে আমি ভীষণ ভয় পেলাম। কবর! কবর! কবর! কবর ছাড়া আর কিছু নেই। আমার ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, চারপাশে, প্রতিটি জায়গায় শুধু কবর! তারই একটার ওপরে বসে পড়লাম, কারণ আর আমি হাঁটতে পারছি না, আমার হাত যেন ভেঙে পড়ছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন! আর সেই সঙ্গে আরও একটা শব্দ কানে এলো। কিসের শব্দ? এক অস্পষ্ট, নাম-না জানা শব্দ। শব্দটা কি আমার মাথার ভেতর থেকে আসছে না কি এর জন্ম দিয়েছে অভেদ্য রাত, অথবা মানুষের মৃতদেহ রোপিত এই রহস্যময় মাটির গভীর স্তর? চারপাশে ভালকরে তাকালাম, কিন্তু কতক্ষণ যে ওখানে বসে ছিলাম বলতে পারি না, আতঙ্কে আমি তখন অসাড়, স্থবির, ভয়ে শরীর ঠাণ্ডা, চিৎকার করে ওঠার জন্যে আমি তৈরি, হয়তো মরবার জন্যেও।

হঠাৎই মনে হল যে মার্বেল পাথরের ওপর আমি বসে আছি সেটা সত্যিই নড়ছে, যেন কেউ ওটা আস্তে তুলে ধরছে। একলাফে আমি পাশের কবরে গিয়ে পড়লাম, এবং দেখলাম, হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখলাম, এইমাত্র ছেড়ে আসা পাথরটা ওপরে উঠছে। তারপর দেখা গেল মৃত মানুষটাকে, এক উলঙ্গ কঙ্কাল, পিঠ কুঁজো করে পাথরটা ঠেলে তুলছে। রাত ঘন অন্ধকার কিন্তু আমি পরিষ্কার সব দেখতে পেলাম। ক্রুশ চিহ্নের ওপর লেখা আছে:

এখানে শুয়ে আছেন জ্যাক অলিভঁ্যা—একান্ন বছর বয়েসে মারা গেছেন। পরিবারের সকলকে তিনি ভালবাসতেন, তিনি দয়ালু ও সম্মানিত ছিলেন, এবং ঈশ্বরের করুণায় মুক্তিলাভ করেছেন।'

সমাধি-প্রস্তরে লেখা কথাগুলো মৃত ব্যক্তিও পড়ল, তারপর রাস্তা থেকে একটা ছোট্ট ছুঁচলো পাথর সে কুড়িয়ে নিল, এবং অক্ষরগুলোকে অতি যত্নে ঘষে তুলতে লাগল। ধীরে ধীরে সে মুছে ফেলল লেখাগুলো, এব যেখানে সেগুলো খোদাই করা ছিল, সেই জায়গাটা দেখতে লাগল চোখের অন্ধকার কোটব মেলে। তারপর, চকমকি দেশলাই দিয়ে ছোট ছোট ছেলেরা যেমন দেওয়ালে লেখে, সেই রকম করে তাব তর্জনীর হাড়ের প্রান্ত দিয়ে উজ্জ্বল অক্ষরে সে লিখতে লাগল:

'এখানে বিশ্রাম করছেন জ্যাক অলিভঁ্যা, একান্ন বছর বয়েসে মারা গেছেন। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার বাসনায় তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুকে নির্দয় ব্যবহারে ত্বরান্বিত কবেছেন, নিজেব স্ত্রীকে যন্ত্রণা দিয়েছেন, পুত্রকন্যাদের কষ্ট দিয়েছেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, যাঁকে সম্ভব লুণ্ঠন করেছেন এবং চরম দুর্দশায় মৃত্যুবরণ করেছেন।'

লেখা শেষ করে মৃত মানুষটি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দেখতে লাগল নিজের সগুসমাপ্ত সৃষ্টি। ফিরে তাকিয়ে দেখি সমস্ত কবরই খোলা, আর সেখানে থেকে সমস্ত মৃতদেহগুলো বেরিযে এসেছে, সমাধি-প্রস্তরের ওপর থেকে মুছে দিয়েছে তাদের আত্মীয়দেব লেখা সুন্দর কথাগুলো এবং পরিবর্তে লিখে দিচ্ছে নিখাদ সত্যিটুকু। আর আমি দেখলাম, প্রত্যেকেই তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়েছে—বিদ্বেষপরায়ণ, অসাধু, ভণ্ড, মিথ্যেবাদী, দুর্বৃত্ত, কুৎসাপ্রিয়, পরস্ত্রীকাতর, দেখলাম, ওরা চুরি করেছে, প্রতারণা করেছে, কোন রকম লজ্জাকর ও জঘন্য কাজ বাদ দেয়নি, এই সব আদর্শ পিতারা, বিশ্বস্ত স্ত্রীরা, অনুরক্ত পুত্রেরা, চরিত্রবতী কন্যারা, এই সব সৎ ব্যবসায়ীরা, এই সব নারী ও পুরুষেরা, যাদের সকলে সমস্ত নিন্দার ঊর্ধ্বে বলে এতদিন জেনে এসেছে। নিজেদের চিরন্তন আবাসের প্রবেশ পথে ওরা সকলে একই সঙ্গে লিখে চলেছে সত্যি কথাটুকু, ভয়ংকর ও পবিত্র সত্য, ওরা বেঁচে থাকতে যা কেউ জানত না, অথবা না জানার ভান করে এসেছে।

ভাবলাম, ও নিজেও হয়তো ওর সমাধি-প্রস্তরে কিছু না কিছু লিখেছে, সুতরাং এখন, নির্ভয়ে আধখোলা কফিন, মৃতদেহ ও কঙ্কালের সমারোহ ভেদ করে আমি ছুটে চললাম ওর কাছে, মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এক্ষুনি ওকে খুঁজে বের করতে হবে। শবাচ্ছাদন-বস্ত্রে ওর মুখ ঢাকা ছিল, কিন্তু মুখ না দেখেও আমি ওকে পলকে চিনতে পারলাম, আর সেই মার্বেল পাথরের ক্রুশ চিহ্নে, যেখানে একটু আগেও লেখা ছিল—

ও 'ভালবেসেছিল, ভালবাসা পেয়েছিল, অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছে।

সেখানে এখন লেখা রয়েছে—

'নিজের প্রেমিককে প্রতারণা করতে একদিন বৃষ্টিতে ও বেরিয়েছিল, তারপর সর্দির প্রকোপে মৃত্যুবরণ করে।'

* * *

মনে হয়, পরদিন সকালে ঐ কবরের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় ওরা আমাকে আবিষ্কার করে।

মঁপাসা : বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে যে কয়জন সাহিত্যিক ছোট গল্পের ছোট ব্যথা ও বেদনা ঘেরা আলেখ্য রচনায় অনন্যসাধারণ সাফল্য ও খ্যাতি অর্জন করেছেন ফরাসী গল্পকার মঁপাসা তাঁদের অন্যতম। অ্যালেনপো, চেকভ্, টুর্গেনেভ ইত্যাদির সমকালে ফরাসীদেশে মঁপাসা ছোট গল্পের রূপ, রস ও আঙ্গিকের এক সার্থক রূপকার। তাঁর গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ইংরাজী ভাষা ও বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক হতে যে ছোটগল্পের ফল্গু ধারা আজও প্রবহমান তার গতি প্রকৃতি আঙ্গিক ও ভাব চেতনায় মঁপাসার প্রভাব অনস্বীকার্য। আমাদের সাহিত্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় হতে শরৎচন্দ্র তথা মুন্সী প্রেমচাঁদ সকলের লেখাতেই মঁপাসার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ছোট গল্প সাহিত্যের আসরে এক নবীন সন্ন্যাসী। কিন্তু নবীন হলেও বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ছোট গল্পের এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য যে কয়জন পথিকৃৎ

গল্পকার দ্যমী মঁপাসা তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়। বিংশ শতাব্দীর ব্যস্ত সমস্ত মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা ছোট গল্পের ছোট পরিধির মধ্যে যত সহজে প্রকাশিত আর কোন কিছুতেই তা সম্ভব নহে। ছোট গল্পের হাত ধরেই সাহিত্যের দরবারে আজ একাঙ্ক নাটকেরও আবির্ভাব। বিংশ শতাব্দীর ব্যস্ত মানুষের ত্রস্ত জীবন সংগ্রামের দিন-লিপিতে যে সাহিত্যিক ফসল সহজ পাচ্য ও সহজ গ্রাহ্য তা ছোট গল্প। আর মঁপাসার হাতেই আজকের সার্থক ছোট গল্পের প্রথম পাদটিকা রচিত হয়।

ড্রয়ার নাম্বার ফোর্টিন

ট্যালমেজ পাওয়েল

•

কিন্তু একদিন, এক ভ্যাপসা গরমের রাতে নিজের বাড়ির ছাদে উঠে গেল সেই 'এগুরের চতুর্থ মায়াবিনী।' কেউ ঠিক জানে না, সে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল, না উড়ে চাঁদে যাবার চেষ্টা করেছিল…

• • • •

আমার চাকরী নিয়ে ঠাট্টা করবেন না, প্লীজ। কলেজ এলাকার ছেলে-ছোকরাদের কাছ থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অনেক খোঁচা সহ্য করেছি। শহরের লাশ-রাখা ঘরে রাতের কেরাণীর কাজ যে আমার খুব একটা পছন্দ তা নয়, তবে তার কতকগুলো সুবিধেও আছে।

প্রথমতঃ, এ চাকরিতে দিনের বেলায় কলেজে পড়াশুনা কবার সুবিধে রয়েছে এবং রাতে সামান্য নিয়ম-মাফিক কাজ ও তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে বই নিয়ে বসার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

ক্যালকুলাসের কোন অঙ্ক নিয়ে যখন মাথার মধ্যে তোলপাড় করছি, তখন লেবেল লাগানো নম্বর দেওয়া ড্রয়ারে শুয়ে থাকা বাসিন্দারা আমাকে একটুও বিরক্ত করে না। অন্তত আমি তাই ভাবতাম।

এই রাতেও আমি এসে রোজকার মত ওলাফ ডেলিকে ছুটি দিলাম। ওলাফ সব সময় কাজ নিয়ে লেগে থাকে, কাজ নিয়ে লেগে থাকার কারণ ওর বয়েস আর খোঁড়া পা। চাকরি ছেড়ে পালাবার এই মুহূর্তটার জন্যেই যেন প্রতিদিন ও বেঁচে থাকে। সুতরাং বরাবরের মত এক নিশ্বাসে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে 'হ্যালো' এবং 'বিদায়' বলল ওলাফ, তারপর খোঁড়া পায়ে অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে লাশ-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

গভীর নিস্তব্ধতায় ভরা পাশের ঘরে এসে ফ্লাস্ক, ট্রানজিস্টর রেডিও ও

কয়েকটা পড়ার বই ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখলাম। আমি এখন সম্পূর্ণ একা। রেকর্ডের ভারী খাতাটা সামনে টেনে নিলাম চোখ বুলিয়ে নেবার জন্য।

রোজকার নাম-ধামগুলো ওলাফ ওর পরিষ্কার টানা হাতের লেখায় লিখে রেখেছে। জলে ডোবা যুবক। মোটর দুর্ঘটনায় মৃত মহিলা ও পুরুষ। বিছানায় আগুন লাগা সত্বেও জেগে ওঠেনি এমন এক মাতাল। ছুরির লড়াইয়ে হেরে যাওয়া যুবক। নদীতে পাওয়া মহিলার মৃতদেহ।

নাঃ, ওলাফের দিনটা রোজকার মতই কেটেছে। গত সপ্তার বুড়িটার মত কোন লাশ আসেনি।

বুড়িটা জঘন্য, নোংরা এবং সেই রকমই নোংরা এক বাসায় একা একা থাকত। এমনিতে ছিল বদ্ধ পাগল, কিন্তু সব সময়েই এক স্বপ্নের দেশে বাস করত, যেখানে সে নোংরা নয়, বুড়ি নয়, সকলের করুণার পাত্রী নয়। বরং সে ভাবত, অন্ধকারের শক্তির ওপর তার খবরদারির ক্ষমতা রয়েছে; সে 'এণ্ডরের চতুর্থা মায়াবিনী।'

অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ডিপো ছিল সেই বস্তি অঞ্চলটা এবং বুড়ির প্রতি-বেশীরা সত্যি সত্যিই তাকে ডাইনী ভাবত, তার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করত। অবশ্য তাকে দেখেও তাই মনে হত, কঙ্কালের মত মুখ, লম্বা নাকের ডগায় একটা আচিল, মুখে একটাও দাঁত না থাকায় থুতনীটা ছুঁচলো ও লম্বা মনে হত, আর ভাঙা দু'গালের ওপর ঝুলে থাকত নোংরা চুলের গোছা। হাত গুণে, ভবিষ্যৎ বলে, ভালবাসার মন্ত্রপূত ওষুধ বেচে, তার আধপেটা খাবার জুটে যেত। তবে বুড়িটার একটা গুণ ছিল; কারো খারাপ সে করত না, অন্তত তার প্রতিবেশীরা তাই বলত।

কিন্তু একদিন, এক ভ্যাপসা গরমের রাতে, নিজের বাড়ির ছাদে উঠে গেল সেই 'এণ্ডরের চতুর্থ মায়াবিনী'। কেউ ঠিক জানে না, সে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল, না উড়ে চাঁদে যাবার চেষ্টা করেছিল। সে যাই হোক ছ'তলা নীচের অ্যাসফল্টের রাস্তা থেকে তাকে চেঁছে তোলা হয়, নিয়ে আসা হয় এখানে, এবং চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারে জমা দেওয়া হয়। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত বাক্সে বন্দী হয়ে সে চারদিন ছিল। তারপর দূরের কোন্ রাজ্য থেকে তার

এক কেতাদুরস্ত ছেলে এসে হাজির হল মৃতদেহ দাবী করতে।

সে চলে যাবার পরেও ওলাফ ডেলি স্বস্তি পায়নি। বুড়ো খালি বলেছে, মাইরি বলছি, চোদ্দ নম্বর ড্রয়ার থেকে কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোচ্ছে, ঠিক যেন গন্ধকের মত।

আমি কিন্তু টের পাইনি। যে বদ গন্ধ আমার নাকে ধরা পড়ে তা হল কেমিষ্ট্রী ল্যাবরেটরীর গন্ধ, যেখানে ক্লাসের পড়াশোনার সঙ্গে তাল রাখতে আমাকে রোজ হিমসিম খেতে হয়।

রেকর্ডের খাতা থেকে চোখ সরিয়ে ঘরগুলোয় নিয়ম-মাফিক টহলে বেরোলাম।

পাশের ঘরটা আকারে বেশ বড়, উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত, ঠাণ্ডা এবং নিষ্প্রাণ। ঘরের মেঝে তকতকে ধূসর টালিতে বাঁধানো, এবং তা থেকে সামান্য অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ নাকে আসছে। ঘরের ও প্রান্তে বড় দু-পাল্লার দরজা। সেটা পেরোলেই ছোট্ট বারান্দা: মৃতদের প্রথম সেখানে এনে রাখা হয়। দরজার কাছেই ছোট ছোট চাকা লাগানো লম্বা সরু মার্বেল পাথরের টেবিল। সুখের কথা, এই মুহূর্তে সেটা খালি, ঘষে মেজে পরিষ্কার করা, এবং অনিবার্য ব্যবহারের জন্যে অপেক্ষা করছে। শীততাপ যন্ত্রের চাপা ফিসফিসে গুঞ্জন যেন শোনার চেয়ে অনুভব করা যায় বেশি।

আমার ডানদিকে অতিকায় মৌচাকের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি ড্রয়ারের থাক। এখানেই মৃতদেহগুলো রাখা হয় কেউ দাবী করবে বলে, নয়তো শেষমেষ কোম্পানীর খরচায় সেগুলো কবর দেওয়া হয়।

যে যে ড্রয়ারে লাশ আছে, সেগুলোয় জাহাজের টিকিটের মত কার্ড লাগানো আছে। লাশ রাখার সময়েই সরু তার দিয়ে কার্ডকে ড্রয়ারের হাতলের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়।

নিছক কোন শব্দ শোনার আশাতেই হালকা সুরে শিস দিতে দিতে ড্রয়ারের কার্ডগুলো রেকর্ড খাতায় লেখা নামগুলোর সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে নিতে লাগলাম আমি।

চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের কাছে আসতেই একটা গন্ধ যেন নাকে এলো। গন্ধ শুঁকতে গিয়ে হাঁচি পেলো। 'এই তাহলে ওলাফ ডেলির গন্ধকের গন্ধ।'

আপন মনেই বিড়বিড় করে বললাম।

চোদ্দ নম্বর ড্রয়ার পেরিয়ে দু-পা গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম, তারপর আস্তে আস্তে ঘুরে তাকালাম।

চোদ্দ নম্বরে কোন দেহ আছে বলে রেকর্ড খাতায় ওলাফ কোন নাম লেখেনি, কিন্তু ড্রয়ারের হাতলে দেখছি কার্ড ঝুলছে। ড্রয়ারের কাছে এসে ঝুঁকে পড়লাম, হাত বাড়ালাম কার্ডটার দিকে। আমার ঠোঁট থেকে শিসের শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল নিস্তব্ধতায়।

অন্যমনস্ক ভাবেই কার্ডটাকে একবার উলটে দেখলাম ; তারপর আবার, আরো একবার—আগের চেয়ে আরো বেশি ক্ষিপ্রতায়।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগলাম। কার্ডের দু পাশটাই সাদা। ওলাফ বুড়ো হতে পারে, কিন্তু এখনও ওর ভীমরতি ধরেনি। ড্রয়ারের কার্ডে নাম লিখতে ভুলে যাওয়াটা তো ওর স্বভাব নয়।

তারপর আপন মনেই হেসে উঠলাম : ব্যাটা বুড়ো বোধহয় আমার সঙ্গে মস্করা করতে চাইছে। ওলাফ যে ঠাট্টা-মস্করাও করতে পারে এ ধারণা আমার আগে ছিল না।

আমার ঠোঁটে শিসের সুর আবার ফিরে এলো। ড্রয়ারটার হাতল ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলাম। ছোট ছোট রোলারে ভর করে ড্রয়ারটা সরসর করে খুলে এলো। আমার শিসের সুর পালটে গেল এক চাপা চিৎকারে, এবং মাঝপথেই থমকে গেল।

ড্রয়ারের মেয়েটা বয়সে যুবতী। মাথার চুল সোনালী। যথেষ্ট সুন্দরী, এমন কি মরে যাবার পরেও।

জুতোর ভেতরে আমার পায়ের বুড়ো আঙুল গুটিয়ে যেতে চাইল। মেয়েটার দিকে অপলকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটার মুখের গড়ন চমৎকার। গায়ের চামড়া বিবর্ণ তামাটে সাটিনের মতো। চোখ দুটো এমন ভাবে বোজা ঠিক যেন ঘুমোচ্ছে, লম্বা লম্বা চোখের পাতা যেন ঘন ছায়ার রেখা। পরণে সাদা নাইলনের ইউনিফর্ম, কলারে নার্সদের পিন আঁটা। একমাত্র ব্যক্তিগত সাজসজ্জা বলতে একটা সোনার ব্রেসলেট। সরু চেনের সঙ্গে লাগানো একটা ছোট লকেট। লকেটে দুটি আদ্যাক্ষর খোদাই করা :

জেড. এল.

স্বর্ণকেশীর থেকে চোখ সরিয়ে চটপট ফিরে এলাম পাশের ঘরে। টেবিলে রাখা রেকর্ডের খাতাটা এক ঝটকায় কাছে টেনে নিলাম। বুড়ো ডেলির প্রতি আমি অবিচার করতে চাই না।

রোজকার ভর্তির নামের লিস্টে আঙুল বুলিয়ে চললাম। ইতস্তত: করলাম। আগের পাতা উল্টে গতকালের লিষ্টে চোখ বোলালাম। তারপর তার আগের দিন। নাঃ, চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারে কাউকেই ভর্তি করা হয়নি।

আবার লাশ-ঘরের দিকে রওনা হলাম। শিস দিতে ঠোঁট ছুঁচলো করলাম, তবে শিসের শব্দ বেরোল না। দু-ঘরের মাঝের দরজাটার ওপর দিকটা কাঁচের। কাঁচ ভেদ করে চোখ মেলে দিলাম। দরজা খোলার কোন প্রয়োজন নেই। চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারটা আমি খোলা রেখেই এসেছি, এবং স্বর্ণকেশী জেড. এল. এখনও সেখানে রয়েছে; এ সত্য জীবনের মতই বাস্তব ও মৃত্যুর মতই অমোঘ।

সন্তর্পণে টেবিলে বসলাম, রুমাল বের করে কপালে বুলিয়ে নিলাম!

একটা গভীর শ্বাস টেনে ফোন তুলে নিলাম। ডায়াল করলাম ওলাফ ডেলির নম্বর। ওর ফোন যখন বাজছে, আমি তখন একটা চোরা চাউনি ছুঁড়ে দিলাম লাশ-ঘরের দিকে।

ছ'বার কি সাত বার ফোন বাজার পর ওলাফের বউ ঘুম-জড়ানো গলায় জবাব দিল।—না, ওলাফের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়, সে এখনও বাড়ি ফেরেনি।

তারপর হঠাৎই ও একটু নরম সুরে বলে উঠল, এক মিনিট ধরুন। মনে হয় ও ফিরে এসেছে।

গলা খাঁকারি দিয়ে বউয়ের কাছ থেকে ফোনটা নিল ওলাফ।

হ্যালো, কি ব্যাপার?

আমি টুলি ব্রানসন বলছি, মিস্টার ডেলি।

তোমার ইয়ার দোস্ত, কে কোথায় বোতল খুলেছে তার জন্যে আমি তোমার জায়গায় ডিউটি দিতে পারব না।

না, স্যর, তা নয়—আমি বললাম, আসল ব্যাপারটা হল, চোদ্দ নম্বর

ড্রয়ারের মেয়েটা সম্পর্কে কিছু খবরাখবর দরকার।

চোদ্দ নম্বরে তো কেউ নেই, টুলি।

হ্যাঁ, স্যর, আছে। চোদ্দ নম্বরে একটা মেয়ে আছে। অল্পবয়েসী সোনালী চুল ফুটফুটে একটা মেয়ে, মিস্টার ডেলি। মরেছে বলে বিশ্বাসই হতে চায় না। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। শুধু খাতায় মেয়েটার নাম এন্ট্রি করতে আপনি ভুলে গেছেন।

শুনতে পেলাম মিসেস ডেলি ওলাফকে জিজ্ঞেস করছে, কি ব্যাপার! বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওলাফের স্বর পালটে গেল, মনে হয় ব্রানসন ছোকরা আজ রাতে ওর ফ্লাস্কে হুইস্কি নিয়ে এসেছে।

না স্যার—ওলাফকে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, যা অবস্থা তাতে আমার হুইস্কিরই দরকার, কিন্তু সঙ্গে তো এক ফোঁটাও নেই। শুধু যা অবস্থা তাতে তা হল চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারে একটি সোণালী-চুল মেয়ের মৃতদেহ, যার নামটা আপনি খাতায় টুকতে ভুলে গেছেন।

এ রকম ভুল আমার কি করে হবে? ওই তো মেয়েটা চোখের সামনেই রয়েছে। বিশ্বাস না হলে স্বচক্ষে দেখে যান।

তাই করতে হবে দেখছি, খোকা! তুমি আমার নামে বিরাট বদনাম দিচ্ছ!

ও এত জোরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল যে আমার কানের পর্দা কেঁপে উঠল। অত্যন্ত শান্তভাবে ফোন নামিয়ে রাখলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢাললাম, একটা সিগারেট ধরিয়ে কফিতে চুমুক দিলাম, এবং একটা সিগারেট ধরালাম।

আর এক ঢোক কফি খেয়ে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়ালাম। আর তখনই লক্ষ্য করলাম, ইতিমধ্যে তিন তিনটে সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছি এবং অ্যাসট্রে থেকে সেগুলোর ধোঁয়া একেবেঁকে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। ক্লিষ্ট হাসি হেসে ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের জন্যে দুটো টান দিয়ে সিগারেট নিভিয়ে দিলাম।

ঝোড়ো সমুদ্রে জাহাজের মাস্তুলের মত ওর খোঁড়া পা নিয়ে ওলাফ এসে হাজির হল। ওর আগুনঝরা দৃষ্টির উত্তর দিলাম হাসি দিয়ে। যতখানি

সম্ভব আশ্বাস ঢেলে দিলাম সে হাসিতে। তারপর ওকে ইশারা করলাম লাশ-ঘরের দিকে।

সুইং-ডোর ঠেলে ওলাফ লাশ-ঘরে ঢুকল; আমি ঠিক ওর পিছনে পিছনে। চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারটা এখনো হাট করে খোলা। ও ড্রয়ার পর্যন্ত যাওয়ার কষ্টটা করল না। বরং ড্রয়ারটার দিকে এক পলক দেখেই বিদ্যুৎ-গতিতে ঘুরে দাঁড়াল আমার মুখোমুখি।

ব্রানসন! ও রাগে গর্জে উঠল, আমার বয়েস বিশ বছর কম হলে তোমার নাকটা থেৎলে দিতাম! তোমার সাহস আছে বলতে হবে, একটা ক্লান্ত বুড়ো মানুষকে এই হতচ্ছাড়া জায়গায় টেনে এনেছ। আর আমি ভাবতাম আজকালকার ছেলে-ছোকরার মধ্যে তুমি অনেক ভাল।

কিন্তু, মিষ্টার ডেলি…

আর কিন্তু বলে লাভ নেই ছোকরা! তোমার নামে আমি রিপোর্ট করব।

উদ্‌ভ্রান্তের মত আবার তাকালাম চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের দিকে। ঐ তো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মেয়েটাকে। সোনালী চুল, সুন্দরী এবং মৃত।

আমাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে ওলাফ বেরিয়ে যেতে চাইল ঘর থেকে। আমি ওর হাত চেপে ধরলাম। ভয়ে আমার অবস্থা মুরগীর ছানার মত এবং পারলে পালক সমেত খোলস ছেড়ে দিই।—শুনুন, শুনুন আমি চিৎকার করে উঠলাম, মেয়েটাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো! আমি জানি স্পষ্ট দেখেছেন।

আমার গা থেকে হাত সরাও—ওলাফও চেঁচিয়ে জবাব দিল, ঠিক যা আছে আমি স্পষ্ট তাই দেখতে পাচ্ছি। একটা খালি ড্রয়ার। ঠিক তোমার ফাঁপা মগজের মতই খালি।

আমি ওর হাত খামচে ধরলাম, প্রাণ গেলেও ছাড়ছি না।—এ আপনি কি ধরণের ঠাট্টা করছেন আমার মাথায় ঢুকছে না…

ঠিক তাই! আমারও মাথায় ঢুকছে না আমার চেয়েও জোরে চেঁচিয়ে বলল ওলাফ, তবে ঠাট্টাটা নেহাতই বস্তাপচা।

তাহলে আপনি ড্রয়ারটার দিকে আর একবার দেখুন, আর এই খাম-

খেয়ালিপনা বন্ধ করুন।

আমার যা দেখার আমি দেখেছি। কোন গর্দভ দামড়া ছাড়া এক বুড়োকে রাত-বিরেতে তার বাড়ি থেকে বের হতে বলবে না!

এক ঝটকায় ওলাফ হাত ছাড়িয়ে নিল, ঝড়ের মত দরজা পার হয়ে বেরিয়ে গেল। সদর দরজায় পৌঁছে ও থামল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে শাসাল আমাকে—

হাড়-হাভাতে বজ্জাত ছোকরা—ও বলল, কাল থেকে অন্য চাকরি খুঁজতে শুরু কর! এ কথা বলে ও চলে গেল।

ওলাফকে অনুসরণ করে আমি পাশের ঘর পর্যন্ত এসেছিলাম, এবার ঘুরে তাকালাম লাশ-ঘরের দিকে। একটা হতাশার আর্তনাদ বেরিয়ে এলো আমার মুখ থেকে। কাঁচের শার্সি দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি জেড, এল, এখনও চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারেই রয়েছে।

লক্ষ্মী মেয়ে আমার—আপন মনেই বিড়বিড় করে বললাম, চলে যাও দেখি, এই আমি চোখ বন্ধ করছি, সেই ফাঁকে তুমি কেটে পড়।

চোখ বন্ধ করলাম, আবার খুললাম, না, মেয়েটা যায়নি, ড্রয়ারেই রয়েছে।

হাতড়ে হাতড়ে টেবিলের কাছে গিয়ে ধপ করে চেয়ারটায় বসে পড়লাম। কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারলাম না, কারণ কাজের ব্যস্ততার ইঙ্গিত দিয়ে দরজার কলিং বেল বেজে উঠল।

আচমকা তীক্ষ্ণ শব্দে চেয়ার ছেড়ে প্রায় হাতখানেক লাফিয়ে উঠলাম। চেয়ারটা পায়ে লেগে ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

স্মিথ আর ম্যাকলিন তখন শতছিন্ন পোশাক-পরা এক বুড়োকে ষ্টেচার থেকে নামিয়ে রাখছে মার্বেল পাথরের টেবিলের ওপর।

বেচারা এক চলন্ত ট্রাকের সামনে গিয়ে হাজির হয়—স্মিথ বলল।

কোনো পরিচয়-পত্র নেই—ম্যাকলিন বলল, জন ডো নাম দিয়ে এটাকে বরফ—ঘরে ঢুকিয়ে দাও।

একেবারে থেঁৎলে গেছে, তাই না ব্রানসন? জন ডো র ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে নিয়ে দাঁত বের করে হাসল স্মিথ। ও সব সময়ে আমার সঙ্গে এ রকম বজ্জাতি করে, কারণ ও জানে আমার পাকস্থলী তেমন মজবুত নয়।

হ্যাঁ, তা যা বলেছ—আমি বললাম, ঠোঁটের ওপর থেকে ঘাম মুছে নিলাম, তবে ঐ মেয়েটার মত নয়। ওর গায়ে এতটুকু দাগ পর্যন্ত নেই।

মেয়ে?

হ্যাঁ,—আগ্রহ ঝরে পড়ল আমার কণ্ঠস্বরে, সুন্দর সোনালী-চুল মেয়েটা। চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারে যে আছে।

স্মিথ ও ম্যাকলিন দুজনেই বাইরে বের করা খোলা ড্রয়ারটার দিকে দেখল। তারপর তাকাল পরস্পরের চোখে।

টুলি ভাই—ম্যাকলিন বলল, তোমার শরীর কেমন আছে?

ভালই আছে—আমি জবাব দিলাম। স্পষ্ট টের পেলাম আমার কপালের ভাঁজে বরফ জমতে শুরু করেছে।

ঘুমের কোন গণ্ডগোল হয়নি তো? কোন বাজে স্বপ্ন-টপ্ন বার বার দেখো নি তো?

কই না তো—আমি বললাম, কিন্তু চোদ্দ নম্বরের মেয়েটা···তোমরা যদি ওকে এনে না থাকো তাহলে হয়তো কলিন্স আর স্নেভলি এনেছে। ওরাই তাহলে মেয়েটা সম্পর্কে খবর-টবর দিতে পারবে।

স্মিথ আর ম্যাকলিন যেন আমার কাছ থেকে সরে গেল। তারপরই স্মিথের দম-ফাটা হাসি লাশ-ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরমার করে দিল।

সুন্দরী মেয়ে, সোনালী চুল, চোদ্দ নম্বর ড্রয়ার, যেখানে ঐ হতভাগী ছিটেল বুড়িটা ছিল···ঠিক, আছে ব্রানসন, বুঝেছি।

ম্যাকলিন হতভম্ব হয়ে তার সঙ্গীর দিকে তাকাল, বুঝেছি মানে?

খুব সহজ—স্মিথ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, বেচারা টুলির এখানে একা একা ভীষণ একঘেয়ে লাগে। তাই আমাদের সঙ্গে একটু মজা করবার জন্যে এই গপ্পো ফেঁদেছে, কি বল টুলি?

স্পষ্টই বোঝা গেল মেয়টাকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না, আর পাবেও না। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি যদি আরও জোর করি, তাহলে বিপদটা শেষ পর্যন্ত আমারই হবে। সুতরাং মাখন তোলায় দুধের মত সাদা হাসিতে ফেটে পড়লাম—যা বলেছ—বললাম স্মিথকে, খাটুনির কষ্টটা তো ভুলতে হবে।

স্মিথ কনুই দিয়ে খোঁচা মারল আমার পাঁজরে—দেখ টুলি ভায়া, ঐ লাশ

যেন গরম হয়ে না ওঠে—। আর একদফা হাসি হেসে ও চলে গেল। কিন্তু স্মিথের পিছন পিছন বেরোবার সময় ম্যাকলিন বারকয়েক ঘাড় ফিরিয়ে চিন্তিত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে গেল আমার দিকে।

আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাইরের দরজাটা বন্ধ হল। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গীর ভীষণ প্রয়োজন। 'লাশ-ঘরে আমি একা জীবিত প্রাণী' এ কথা ভেবে এই প্রথম আমার পাকস্থলী যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল ঠিক ঠাণ্ডা শুকনো খেজুরের মতো।

এত সাবধানে চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারকে পাশ কাটিয়ে চলে এলাম যেন এক গভীর খাদের ওপর দিয়ে এক ভঙ্গুর কাঁচের সেতু পার হচ্ছি।

চলে যাও বলছি—জেড· এল· কে লক্ষ্য করে চাপা গলায় বলে উঠলাম, তুমি মোটেই সত্যি নও। এমন কি মৃতদেহ পর্যন্ত নও। নিছকই একটা—একটা ছায়া; যে ছায়া আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সুতরাং কেটে পড়।

যাকে উদ্দেশ্য করে এত কথা বলা সে কিন্তু নির্বিকার রইল। বরং কোন্ সুরে অস্তিত্বহীন একটা মৃত দেহের সঙ্গে কথা বলছি তা ভেবে আমি নিজেই ভয় পেলাম।

পাশের ঘরের টেবিলে ফিরে এসে বসলাম। কয়েক সেকেণ্ড এক বিচিত্র কাঁপুনি দিয়ে গেল আমার শরীরে। তারপর একটা উৎসাহী চিন্তা ঝল্‌সে উঠল মনের মধ্যে। হয়তো ওলাফ ডেলি, স্মিথ ও ম্যাকলিন, সবাই মিলে আমার সঙ্গে মজা করছে। হয়তো জেড· এল-এর মৃতদেহ কলিন্স আর স্লেভলিই নিয়ে এসেছে, কারণ দিনের বেলায় ওরাই লাশ এনে জমা দেয়। তারপর ওরা হয়তো ভেবেছে এই কলেজের ছোকরাকে ভয় দেখিয়ে দারুণ একটা মজা করা যাবে।

মেজাজটা সামান্য ভাল হল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে জুড লরেন্সকে ফোন করলাম। জুড আমার বাবার গল্‌ফ্ খেলার সঙ্গী এবং হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের সাদা পোশাক ডিটেকটিভ। আমার সম্পর্কে ওর ধারণা ভালই. এবং সত্যি বলতে কি, এ চাকরিটার জন্যে ও-ই আমার হয়ে সুপারিশ করেছিল।

বেড়াচ্ছে। সুতরাং পুলিস হেডকোয়ার্টারে ফোন করলাম। শুনলাম জুড সই করে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু ওরা চেষ্টা করে লকার রুমে জুডকে পেল।

টুলি ব্র্যানসন, মিস্টার লরেন্স।

কেমন চলছে, টুলি?

একটা মুশকিলে পড়ে গেছি।

বলে ফেল। ওর জোরালো মেজাজী স্বরে দ্বিধার লেশ মাত্র নেই।

হ্যাঁ, মানে···মনে হচ্ছে, একটা লাশের ব্যাপারে আমাদের রেকর্ড খাতায় একটু গোলমাল হয়েছে। একটা মেয়ে। সোনালী চুল। নার্স। নামের আদ্যাক্ষর জেড· এল·।

তাহলে ওলাফ ডেলিকে ফোন করে ছাখ, টুলি।

হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু জানেন তো, ডিউটি থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ওলাফের কি অবস্থাটা হয়! এতক্ষণে ও স্বপ্নের দেশে পৌঁছে গেছে, আর আমি ওকে ঐ সময়ে বিরক্ত করতে চাই না! ও ভীষণ ক্ষেপে যাবে।

জুড দরাজ গলায় হেসে উঠল, নাঃ, বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না। মেয়েটার সম্বন্ধে কিছু তাহলে জানো না?

না, যা বললাম শুধু তাই। মেয়েটা বেওয়ারিশ নয়, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। এর মত মেয়ে, বিশেষ করে স্বাভাবিক কারণে যে মারা গেছে, বেসরকারি কবরখানায় যার যাওয়ার কথা, এখানে আসার কথা নয়।
সুতরাং মর্গে যখন এসেছে তখন মেয়েটা স্বাভাবিক ভাবে মারা যায়নি, জুড বলল।

সে ছাড়া আর কি হতে পারে।

খুন?

অন্য কোন কারণ তো মনে পড়ছে না—আমি বললাম, মেয়েটা নিশ্চয়ই সন্দেহ জনক অবস্থায় মারা গেছে।

ঠিক আছে, টুলি। দেখছি, তোমার জন্যে কি করতে পারি।

আপনাকে কষ্ট দিতে হচ্ছে বলে ভীষণ খারাপ লাগছে।

কষ্ট—ও বলল, কষ্টের কি আছে? গোটা দুয়েক টেলিফোন করলেই কাম ফতে হয়ে যাবে।

ধন্যবাদ, মিস্টার লরেন্স।

ফোন রেখে দিলাম। জুড লরেন্সের টেলিফোনের অপেক্ষা করতে করতে উঠে গেলাম লাশ-ঘরের দরজার কাছে। আস্তে আস্তে শার্সির ফাঁক দিয়ে নজর চালিয়ে নিশ্চিত হতে চাইলাম আমি যে, চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারে মেয়েটার ছায়া এখনও আছে।

হ্যাঁ আছে। পা টেনে টেনে আবার ফিরে এলাম টেবিলের কাছে। মনে হল, আমি যেন এক ক্লান্ত বৃদ্ধ মানুষ।

অবশেষে ফোন যখন বাজল, আমি ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিলাম।

সিটি মর্গ। টুলি ব্র্যানসন বলছি।

আমি জুড, টুলি।

আপনি কি···

হোমিসাইড থেকে কোন খবর নেই, টুলি। জেড· এল· নামে কোন সোনালিচুল মেয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় খুন হয়নি।

ও—সত্যিকারের যন্ত্রণার আর্তনাদকে মাঝপথে টুঁটি টিপে থামিয়ে দিলাম।

নার্সদের খাতা-পত্তরেও খোঁজ নিয়েছি—জুড তখন বলে চলেছে, তোমার বর্ণনা মত একজন নার্সকে পাওয়া গেছে। যুবতী, সোনালি চুল, সবে ট্রেনিং শেষ করেছে। ওর নাম জেলা ল্যাংট্রি। থাকে ৭১১ ইস্টল্যাণ্ড অ্যাভিনিউতে। সম্প্রতি সিটি হসপিটালে কাজে ঢুকেছে। যদি ওর কোন বিপদ-আপদ হয়ে থাকে, তাহলে তা গত আধ ঘণ্টায় হয়েছে। কারণ কিছুক্ষণ আগেই শিফ্‌ট বদলের সময় ও ডিউটি শেষ করে বাড়ি রওনা হয়ে গেছে।

জুডের কথা ও চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের ছায়া যোগ করলে একটাই অবিশ্বাস্য উদ্ভট সম্ভাবনা বাকি থাকে। সেটা এতই ভয়ংকর ও অপার্থিব যে আমার মাথার চুল ছুঁচের মত খাড়া হয়ে উঠল।

মিস্টার লরেন্স, আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে, জেলা ল্যাংট্রি কোন দিনই জীবিত অবস্থায় বাড়ি পৌঁছবে না।

তার মানে? কি বলছ তুমি, টুলি?

এগুরের চতুর্থ মায়াবিনী যে ড্রয়ারে···আমার কথা জড়িয়ে গেল, বুড়িটার

জুডকে বাড়িতে পেলাম না। ও তিনটে থেকে এগারোটা ডিউটি করে মন ভীষণ নরম ছিল। কখনও লোকের ক্ষতি করত না। শুধু ভাল করত।

কি সব আবোল-তাবোল বকছ? তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল জুড, টুলি, তুমি নেশা করেছ নাকি?

না, স্যর।

শরীর ঠিক আছে তো?

আমি—মানে....ইয়ে, হ্যাঁ, স্যর। অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার লরেন্স।

* * *

বিশ মিনিট পরে আমার ঝরঝরে চার চাকা ইস্টল্যাণ্ড অ্যাভিনিউতে এসে থামল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে নম্বর খুঁজতে পা চালালাম। বুঝলাম, ঠিক জায়গাতেই এসেছি, এবং ৭১১ নম্বর সহজেই পেয়ে গেলাম। একটা ছোট সাদা রঙের বাড়ি, সঙ্গে লাগোয়া ছোট উঠোন।

জায়গাটা অন্ধকার, নির্জন, শান্ত।

সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে যখন গর্দভ মনে হচ্ছে তখন হঠাৎই সামনের চৌরাস্তা থেকে ডিজেল ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে এলো। তাকিয়ে দেখি, একটা সরকারী বাস ভারী শরীর নিয়ে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটা দলছুট মেপ্‌ল্‌ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, একটা মেয়ের ছায়া-শরীর ইস্টল্যাণ্ড অ্যাভিনিউ ধরে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু বাস থেকে মেয়েটা একা নামেনি। ওর ঠিক পিছনে আরও লম্বা, ভারী একটা ছায়া: একটা লোক। দৃশ্যটা দেখে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে গেল।

মেয়েটা টের পেল ওর পিছনে কেউ আসছে। তাই তাড়াতাড়ি পা চালাতে শুরু করল। লোকটাও চলার গতি বাড়িয়ে দিল। মেয়েটা পিছন ফিরে তাকাল। আরও জোরে পা চালাল; বলতে গেলে এখন ছুটছে।

ফুটপাথে লোকটার পায়ের শব্দ স্পষ্ট ও দ্রুত লয়ে বাজতে লাগল। সে মেয়েটার ঘাড়ের ওপর এসে পড়তেই মেয়েটার চিৎকার মাঝপথে থেমে গেল।

ফুটপাথে ওরা তখন যুঝে চলেছে। লোকটা বাহুর খাঁজে মেয়েটার গলা চেপে ধরেছে, মেয়েটা হাত-পা ছুড়ছে আর ছটপট করছে।

মেপ্‌ল্‌ গাছের আড়াল থেকে আমি এমন ভাবে ছুটে গেলাম যেন অদৃশ্য দামামা আমাকে রক্তের হোলিখেলায় যোগ দেবার জন্যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। লোকটা আমার পায়ের শব্দ পেয়েই মেয়েটাকে ছেড়ে দিল। আমি সরাসরি গিয়ে লোকটার ওপবে পড়লাম। আমার কাঁধ ওর পেটে আঘাত করল।

লোকটা সজোবে একটা হাঁটু তুলল। আঘাতটা আমার থুতনিতে এসে লাগল। আমি ফুটপাথে বসে পড়লাম, এবং লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাল।

শক্ত অথচ কোমল হাত আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। এই প্রথম আমি জেলা ল্যাংট্রির চোখেব দিকে তাকালাম। ছায়াময় রাতে কৃতজ্ঞতা মাখানো ভারী সুন্দর ধোঁয়াটে চোখ।

আপনাব লাগেনি তো? দম ফিরে পেয়ে প্রশ্ন করলাম।

না, ঠিক আছি। আপনি?

না না, আমার কিছু হয়নি, আমি বললাম।

মেয়েটা আস্তে আস্তে আস্থা ফিবে পাচ্ছে।

ভাগ্যিস্‌ ঠিক সময়ে আপনি এসে পড়েছিলেন।

আমি—ইয়ে—মানে এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম—ওকে বললাম, চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই। ঐ লোকটার নামে পুলিসে রিপোর্ট করে লাভ নেই। কারণ মুখ দেখতে পাইনি। ওরা ধবতে পারবে না।'

আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম—ও বলল, একটু এগিযে আমার বাড়ি।

আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। মেয়েটা বলল, ওর নাম জেলা। আর আমিও বললাম, আমার নাম টুলি। ওর বাড়ির দরজায় পৌঁছে আমরা পরস্পরের চোখে তাকালাম, এবং আমি জানতে চাইলাম কখনও ওকে ফোন করলে কোন অসুবিধে আছে কি না, ও বলল, হাতের কাছে টেলিফোন খালি পেলেই করতে। দেখলাম, ও বাড়িতে ঢুকে গেল। গাড়িতে ফিবে আসার সময় আমি শিস দিতে শুরু করলাম।

মর্গে ফিরে এসে সোজা এগিয়ে গেলাম চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের দিকে। আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে জেলা ল্যাংট্রির ছায়াকে ড্রয়ারে আর

দেখা যাবে না, কারণ এইমাত্র ওকে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

সুতরাং চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। না, আমার অনুমানে অন্তত কোন ভুল হয়নি।

জেলা ল্যাংট্রির ছায়া ড্রয়ারে আর নেই। নতুন যে মেয়েটা রয়েছে তার মাথায় সুন্দর একরাশ লাল চুল!

ট্যামলেজ পাওয়েল ঃ আজকের দিনে রহস্য ও ভৌতিক সাহিত্যের অঙ্গনে যে সকল লেখক সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে ট্যামলেজ পাওয়েল তাঁদের অন্যতম। লেখক নানা ধরনের গল্প লিখেছেন। তবে তাঁর গল্পের অন্যতম মূল উপজিব্য হচ্ছে রহস্য ও অলৌকিক ঘটনার ঘনঘটায় ভরা এক বিদেহী জগতের দিশারী অনির্দেশ্য অস্তিত্বের প্রতিভূ কোন অলৌকিক জগত ও জীবন।

ট্যামলেজ পাওয়েলের ভৌতিক ও অলৌকিক গল্পগুলি বহু বিদেশী রহস্য গল্প সংকলনের অভিজাত সংস্করণের অন্যতম আকর্ষণ। আমরা তাঁর ড্রয়ার নাম্বার কোর্টিন নামক গল্পটি পাঠকদের পরিতৃপ্তির জন্য পরিবেষণ করার সুযোগ গ্রহণ করেছি।

দি ভেনডেটা
THE VENDETTA

গী দ্য মোপাসাঁ

কঙ্কালের সাদা ও পরিষ্কার হাতের হাড় নয়। মাংস সমেত একটা কালো হাতে হলুদ নখ। মাংসগুলো দেখা যাচ্ছে, হাড়ের ওপরে শুকনোরক্ত ও ময়লা . . .

*　　　*　　　*

এমন একটা অপরাধ, যা নিয়ে গত একমাস ধরে প্যারী শহরে হৈ চৈ পড়ে গেছে। যার যুক্তি ও সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তা হল—সাঁক্লদের রহস্যজনক ঘটনা।

ম্যাজিষ্ট্রেট মসিয়ঁ বারমূশর এই মাথা মুণ্ডুহীন ব্যাপারটার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছেন। তিনি এখন ফায়ার প্লেসের দিকে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। কি ভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল, তাই নিয়ে বিভিন্ন থিওরী চালু হয়েছে, সেসব নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট আলোচনা করছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কিভাবে সমাধান হবে, তা সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলছেন না।

তাঁর চেয়ারের আশেপাশে অনেক মহিলা ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। ওদের প্রত্যেকের দৃষ্টি একই দিকে আবদ্ধ ঐ চেয়ারে বসে থাকা নিখুঁত করে কামানো ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের দিকে। ওরা মন দিয়ে তাঁর কথা গুলো শুনছে। যে আতঙ্ক মহিলাদের সাধারণতঃ সুধীর যন্ত্রনার মত অভিভূত করে, তারই প্রভাবে ওরা কাঁপছে।

ওদের মধ্যে একজন হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে—ভয়ঙ্কর; গোটা ব্যাপারটাই যেন অস্বাভাবিক। কি যে ঘটেছিল, সেই রহস্য উন্মোচন কোনদিনই হবে না। অন্যান্যদের তুলনায় ঐ মহিলার মুখ আরও বেশী বিবর্ণ।

—হ্যাঁ, মাদাম—ম্যাজিষ্ট্রেট ওর দিকে তাকালেন, রহস্য উন্মোচন হয়তো

কোনদিনই হবে না, কিন্তু ঐ অস্বাভাবিক নামের শব্দটার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। চতুরভাবে পরিকল্পনা করা এবং সক্ষমতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত করা একটা ক্রাইম। এমনভাবে রহস্যে জড়ানো যে দুর্ভেদ্য পরিপার্শ্বিক পরিস্থিতির জট সহজে ছাড়ানো যাচ্ছে না।

—···এইরকম একটি জটিল কেস নিয়ে আমাকে তদন্ত করতে হয়েছিল। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে আমাকে তদন্ত বন্ধ করতে হয়।

—বলুন, বলুন; কোরাসে মহিলা কণ্ঠ শোনা যায়।

গাম্ভীর্যপূর্ণ হাসি হাসলেন ম্যাজিস্ট্রেট। তারপর তিনি বললেন —তবে যেন মনে করবেন না, ঐ কেসে অস্বাভাবিক কিছু ছিল। আমি স্বাভাবিক কারণ ও যুক্তিতে বিশ্বাসী। আমি অতিপ্রাকৃত শব্দটার পরিবর্তে দুর্বোধ্য শব্দটাই পছন্দ করি। কেসটার মধ্যে যে পরিস্থিতিতে ক্রাইম ঘটে সেটা আমার আশ্চর্য লেগেছিল। ঘটনাটার কথাই বলি—

···তখন আমি অ্যাজাসিয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করি, সুন্দর পাহাড় ঘেরা সমুদ্র শহর। প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড যা ভেনডেটার তদন্ত করা, আমার আসল কাজ ছিল। এই ঘটনা গুলো যেমন বিস্ময়কর তেমনি হিংস্র, বীরত্ব ও উত্তেজনায় ভরা, এমনই নাটকীয় যা বিশ্বাস করা যায় না।

····প্রতিশোধের অদ্ভুত চাঞ্চল্যকর কাহিনী যুগযুগান্তের ঘৃনা ও বিদ্বেষের যে আগুন কখনও নেভেনা, যে সব খুন অনেক সময় গণহত্যার নামান্তর এবং অদ্ভুত বীরত্বের উজ্জ্বল কিছু নিদর্শণ। দুবছর ধরে আমি কর্তিকার সেই যুগযুগান্তের ঐতিহ্যের কথা শুনেছি, যে ঐতিহ্য অনুযায়ী কেবল যে অপরাধীর ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে তা নয়, তার বংশধর ও আত্মীয়দের প্রতিশোধ নিতে হবে। আমি দেখেছি, অপরাধীর শিশু ও বৃদ্ধ আত্মীয় এমনকি দূর সম্পর্কে খুড়তুতো মাসতুতো ভাইয়েরও গলাকাটা হয়েছে ভেনডেটা বা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে।

একদিন শুনলাম, একজন ইংরেজ ভদ্রলোক উপসাগরের শেষপ্রান্তের ছোট্ট একটা ভিলা বারোবছরের জন্য লীজ নিয়েছেন। মার্সেলিজ থেকে আসার সময় ঐ ভদ্রলোক সঙ্গে একজন ফরাসী চাকর নিয়ে এসেছেন।

ঐ ব্রিটিশ ভদ্রলোকের অদ্ভুত স্বভাবের কথা প্রত্যেকের মুখে মুখে ঘুরে

বেড়াতে থাকে—বাড়ীতে উনি একা থাকেন। মাত্র দুটো কারণে বাইরে বেরোন শিকার ও মাছ ধরা। ভুলেও কারও সঙ্গে কথা বলেন না, শহরে যান না। আর রোজ এক ঘণ্টা পিস্তল ও বন্দুক নিয়ে প্রাক্‌টিস করেন।

উনি কে, এই নিয়েও নানা মতবাদ আছে। কারো মতে উনি একজন বিখ্যাত লোক, রাজনৈতিক কারণে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন। কেউ বলে, উনি একজন ভয়ঙ্কর ক্রাইম, এখানে আত্মগোপন করে আছেন। এই রহস্যময় লোকটাকে দেখার জন্য আমার মনে কৌতুহল জাগে অনুসন্ধান করি। কেবল ওঁর নাম ছাড়া কিছু জানা গেল না—স্যার জন রাওয়েল।

আমি ভদ্রলোকের ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করলাম, কিন্তু সন্দেহ জনক কিছু পাওয়া গেল না। গুজব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়লো। স্থির করলাম, বিদেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

অবশেষে একদিন পাখী শিকারের অছিলায় ওর বাড়ির কাছাকাছি ঘুরতে লাগলাম। আলাপের সুযোগও মিললো। ইংরেজ ভদ্রলোকের নাকের সামনেই আমি গুলি করে পাখী মারলাম। আমি সেই মরা পাখীটাকে ওখানে রেখে সোজা স্যার জনের কাছে গিয়ে দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে পাখীটা—নিতে স্যার জনকে অনুরোধ জানালাম।

ভদ্রলোকের মাথার চুল লাল, মুখে লাল দাড়ি, খুব লম্বা চওড়া এবং ভদ্র ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার। হারকিউলিসের মতো চেহারা। বিটিশ নাগরিকদের মত অমিস্ত্রক নয় ভদ্রলোক, ফরাসী উচ্চারণে ইংরেজ টানী আমার ভদ্রতার জন্য ভদ্রলোক অনেক ধন্যবাদ জানালেন। একমাসের মধ্যে ওঁর সঙ্গে পাঁচ ছবার দেখা হলো। একদিন দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছি, দেখি বাগানে্ বসে ভদ্রলোক পাইপ খাচ্ছেন।

আমি তাঁকে অভিনন্দন জানালাম, উনি তার পরিবর্তে একগ্লাস বীয়ার খেতে ভেতরে ডাকলেন, ইংরেজদের মতোই কেতাদুরস্ত ভদ্রতা। ফ্রান্স ও কর্সিজ ওর খুব পছন্দ, এ অঞ্চলের সমুদ্র উপকুলত ওঁর কাছে অচেনা নয়। আমি মনে মনে খুব খুশী হলাম। ওর জীবন ও ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ওর কি পরিকল্পনা, সে সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলাম।

.. উনি এক মুহূর্ত দ্বিধা বোধ করলেন। বললেন—আফ্রিকা, ভারতবর্ষ

ও আমেরিকায় উনি অনেক ঘুরেছেন, একটু হাসলেন—ও হ্যাঁ, অনেক অ্যাডভেঞ্চরের স্বাদ পেয়েছি। আমি শিকারের গল্প করেছিলাম, উনি বাঘ, হাতী, জলহস্তী এমনকি গরিলা শিকারের সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা বললেন।

- ওগুলো সবই বিপদজনক এবং ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।

—ঠিকই বলেছেন। তবে এর চেয়েও মানুষ হল বেশী বিপদজনক।

ভদ্রলোক জোরে হেসে উঠলেন—মানুষও আমি শিকার করেছি।

আমি ওঁর সঙ্গে ড্রইং রুমে গেলাম। বিভিন্ন ধরনের বন্দুক দেখালেন। ড্রইং রুমের দেয়ালে কালো রঙের রেশমী কাগছে সোনালী এমব্রয়ডারী। কালো কাপড়ের ওপরে বড় বড় হলুদ ফুল, আগুনের মত জ্বলজ্বল করছে।

—জাপানী কাপড়, ভদ্রলোক বললেন।

মস্ত বড় প্যানেলের ঠিক মাঝখানে অদ্ভুত একটা জিনিষ, চৌকোনা লাল ভেলভেটের ওপরে পড়ে আছে। জিনিষটার আকর্ষণে কাছে এগিয়ে গেলাম, রীতিমত অবাক হলাম—একটা মানুষের হাত।

"কঙ্কালের সাদা ও পরিষ্কার হাতের হাড় নয়। মাংস সমেত একটা কালো হাতে হলুদ নখ। শুকনো মাংসগুলো দেখা যাচ্ছে, হাড়ের ওপরে শুকনো রক্ত ও ময়লা।" দেখে মনে হচ্ছে, হাতটা কুড়ুল দিয়ে কনুই ও মণিবন্ধের মাঝামাঝি জায়গায় কাটা হয়েছে। অপরিচ্ছন্ন হাতের মণিবন্ধে ভারী লোহার চেন রিভেট করে আঁটা, চেনটা দেয়ালের একটা মজবুত রিং-এর সঙ্গে আটকানো, ঐ রিং-এ একটা হাতিও বেঁধে রাখা যায়।

আমি সহসা প্রশ্ন করলাম—ওটা কি ?

—আমার সবচেয়ে বড় শত্রুর হাত ওটি। লোকটা জাতে আমেরিকান। ঐ হাত তরোয়াল দিয়ে কেটে ধারালো পাথর দিয়ে চামড়া ছাড়িয়ে রোদে একসপ্তাহ শুকিয়েছিলাম। আমি কোন ভুল করিনি, আমার সৌভাগ্য।

শুকনো হাতটা স্পর্শ করলাম। মনে হলো, যার হাত তার চেহারা দৈত্যের সমান। বিরাট লম্বা লম্বা আঙুল, মোটা মোটা গাঁটে এখনও মাঝে মধ্যে চামড়া লেগে আছে। চামড়া ছাড়ানো হাতটা অতি ভয়ঙ্কর, যেন হিংস্র কোন প্রতিশোধমূলক কাজের ইশারা করছে।

—লোকটার গায়ে নিশ্চয়ই খুব জোর ছিল ?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার জোর বেশী। চেন দিয়ে তাই ওকে আটকে রেখেছি।

—কিন্তু এখন তো আর হাতটা পালিয়ে যাবে না ? চেনের প্রয়োজন নেই।

আমার কথা শুনে স্যার জন গম্ভীর হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে বললেন —সর্বদা পালাবার চেষ্টা করে বলেই এই চেনের সাহায্য নেওয়া।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ওঁর দিকে তাকাই। কিরে বাবা, ভদ্রলোক পাগল নাকি ? না, ইয়ার্কি করছে ? কিন্তু ওর মুখে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না, শান্ত ও স্বাভাবিক।

আমি এই প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলাম। লক্ষ্য করলাম, ঘরের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আসবাবের ওপরে তিনটে গুলিভর্তি পিস্তল। পরিস্থিতি দেখে মনে হল, ভদ্রলোক যেন সর্বদা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয়ে ভীত হয়ে থাকেন।

এর পরে আরও কয়েকবার গেলাম। তারপর ওঁর বাড়ী যাওয়া বন্ধ করলাম। এতোদিনে ওর সম্বন্ধে গুজব রটানোও কমে গেছে।

কেটে গেল একটি বছর।

নভেম্বরের শেষের দিক। একদিন সকালে চাকরের ডাকে ঘুম ভাঙলো : শুনলাম, কাল রাতে স্যার জন রাওয়েল খুন হয়েছেন।

আধঘণ্টা পরে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ ও স্থানীয় পুলিশবাহিনীর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমরা স্যার জনের বাড়ীতে ঢুকলাম। ওর চাকর বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। প্রথমে ওকে আমি সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু পরে দেখা গেল, ওর কোন দোষ নেই। খুনী কে জানা গেল না।

ঢুকলাম ড্রইংরুমে, স্যার জনের মৃতদেহ মেঝের ঠিক মাঝখানে পড়ে আছে। ওয়েস্ট কোট ছেঁড়া, কোটের একটা হাতাও ছেঁড়া, মনে হয় খুব মারামারি হয়েছিল। মুখটা ভয়ঙ্কর ভাবে ফুলে উঠেছে। আতঙ্কের ছাপ সারা মুখে। দাঁতে দাঁত আটকানো। কাঁধটা রক্তে ভিজে গেছে, সেখানে পাঁচটা ফুটো, সম্ভবতঃ পেরেকের ফুটো।

ডাক্তার লাশ পরীক্ষা করলো। গলায়-আঙুলের দাগগুলো দেখে বললো, মনে হচ্ছে কোন কঙ্কাল ওকে গলা টিপে খুন করেছে।

আমার মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ অনুভব করলাম। নিজের অজান্তেই চোখদুটি দেওয়ালে আটকানো রিং-এর দিকে চলে গেল। হাতটা নেই। ভাঙা চেনটা ঝুলছে।

নীচু হয়ে দেখি, লাশের দাঁতে চাপা অদৃশ্য হাতের একটা কাটা আঙুল। চারিদিক পরীক্ষা করে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লো না। দরজা জানালা, আসবাব পত্র যেমনটি তেমন রয়েছে। পাহারাদার কুকুর দুটো সারারাত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে।

চাকরের কাছ থেকে জানতে পারলাম—গত মাসে কি একটা ব্যাপার নিয়ে স্যার জন দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। ওঁর কাছে অনেক চিঠি আসতো, সেগুলো উনি পুড়িয়ে ফেলতেন। মাঝে মাঝে রাগে পাগল হয়ে উঠতেন, ঘরের দেয়ালে চেনে আটকানো হাতটাতে চাবুক দিয়ে এলোপাথাড়ি মারতেন।

উনি বেশীর ভাগ দিনই দেরীতে ঘুমোতে যান। ভেতর থেকে দরজা লক করে বন্ধ করতেন। হাতের কাছে সর্বক্ষণের জন্য পিস্তল থাকতো। রাতে উনি কয়েকবার জোরে চেঁচিয়ে উঠতেন, মনে হয় ঝগড়া করছেন কারোসঙ্গে।

কিন্তু গত রাত্রে ওঁর গলার আওয়াজ একদম পাওয়া যায় নি। ওঁর ঘরের জানালাটা খোলা ছিল। সকালে ওঁর ফরাসী চাকর ঐ জানালা দিয়ে মেঝেতে স্যার জনের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে। কে এ কাজ করতে পারে, সেটা তার বোধগম্য হচ্ছে না।

মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে আমি যা জানতাম পুলিশ বিভাগে জানালাম। সারাদ্বীপে হৈ-চৈ পড়ে গেল, তদন্ত চললো কিন্তু কোন ফল হলো না।

তারপর তিনমাস কেটে গেল।

এক রাতে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নে সেই বিপজ্জনক হাতটাকে দেখলাম। ওটা মাকড়সা বা বিছের মত দেয়ালে আর পর্দার ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। তিনবার ঘুম ভাঙলো, আর

তিনবারই একই দুঃস্বপ্ন দেখলাম। হাতটা আঙুলগুলো পায়ের মত ব্যবহার করে সারা ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছে।

পরে স্যার জনের কবরের উপরে হাতটা পাওয়া গেল। কারো কোন খবর না পেয়ে ওঁকে ওখানেই কবর দেওয়া হয়েছিল। হাতের অঙ্গুষ্ঠটা কাটা।

এইবার ম্যাজিস্ট্রেট তাকালেন সমবেত মহিলাদের দিকে—শুনুন, মহিলাগণ, আমার গল্প এখানেই শেষ। এ ব্যাপারে আর কিছু আমার জানা নেই।

মহিলারা প্রত্যেকেই আতঙ্কিত; বিবর্ণ মুখ, ভয়ে কাঁপছে। একজন চেঁচিয়ে বললো—

এভাবে কোন গল্প শেষ হয় না। আপনি ঘটনার কোন কারণ ও যুক্তি দেখান নি। কি ঘটেছিল সে সম্বন্ধে আপনার থিওরিটা বলুন। তাহলে আমরা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবো।

ম্যাজিস্ট্রেটের মুখে গম্ভীর হাসি ফুটে উঠলো—আমি দুঃখিত এইভেবে যে আপনাদের অতিপ্রাকৃত আতঙ্কের স্বপ্ন নষ্ট করছি। আমার থিওরিটা খুব সহজ—স্যার জন যার হাতটা তলোয়ার দিয়ে কেটেছিলেন, সে মরে নি। তার একটা হাত গেছে কিন্তু অন্য হাতটি ছিল, সেটি দিয়েই লোকটি কাজ সেরেছে। তবে, যদি বলেন কিভাবে, সেটার উত্তর আমি দিতে পারবো না। সম্পূর্ণ ঘটনাটাই একরকমের ভেনডেটা।

—না, একজন মহিলা চাপা স্বরে বলেন, অসম্ভব।

—আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম, আমার থিওরী আপনাদের মনমত হবে না। হাসতে হাসতে ম্যাজিস্ট্রেট গল্প শেষ করলেন।

গী দ্য মঁপাসা

ফরাসী দেশের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং ছোট গল্পকার; বলা যেতে পারে সর্বযুগের সর্বকালের ছোট গল্পের শ্রেষ্ঠ রূপকার। যিনি অনায়াস অবহেলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী সভ্যতার খন্দরে খাঁজে জমে থাকা বিচিত্র জীবনের নগ্ন নিথর শুর অন্বেষণ করেছেন। অতি আশ্চর্য নিদাঘ অভিজ্ঞতার অদ্বিতীয় মানুষ এই মঁপসা।

তাঁর অলৌকিক গল্পে উন্মোচিত হয়েছে মঁপাসা প্রতিভার এক অনুদ্ঘাটিত দিক। ঈষৎ বিচ্ছুরিত আতঙ্কের ঘনঘটা তাই পাঠক চিত্তকে বার বার মুগ্ধ করে।

লেভিটেশান

জোসেফ পি ব্রেনান

'কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের পাথরের মত দেহ আরও ওপরে উঠতে লাগলো। ওপরে ওপরে.....তারা দেখলো ফ্র্যাঙ্কের শরীরটা আঁকাশে ভাসতে ভাসতে ক্রমে একটা বিন্দুর আকার হলো।'

* * *

মরগ্যানের বিচিত্র মেলা এক রাতের জন্য এলো রিভারভিলে। গ্রামের সীমান্তে যে বিশাল পার্কটা আছে সেখানে তাদের পসরা সাজিয়ে তাঁবু খাটিয়ে বসলো। সময়টা অক্টোবরের শুরুর এক উষ্ণ আরামের সন্ধ্যে। ফলে সাতটা বাজতে না বাজতেই সেই হৈ-হুল্লোড় আমোদ-প্রমোদের মেলায় লোকের ভিড় জমে গেলো।

এই ভ্রাম্যমান মেলা খুব যে বড় বা জমকালো তা নয়, তবে রিভার-ভিলে এর কদর আছে। কারণ সিনেমা, থিয়েটার, খেলার মাঠ, শহুরে সবকিছুর থেকে দূরে এক পাহাড়ী এলাকায় নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিভারভিল।

রিভারভিলের স্থানীয় অধিবাসীরা খুব উঁচু দরের খেলা দেখতে হয়তো চায় না: সুতরাং, সেই পুরোনো 'মোটা মেয়ে,' 'উল্কিকাটা মানুষ' এবং 'বাঁদর খোকা' দেখেই ওরা খুসি হয়, মুগ্ধ হয়ে আলোচনা করতে থাকে নিজেদের মধ্যে। চিনেবাদাম ও মাখন দেওয়া পপ্‌কর্ন্ খেতে ওরা ব্যস্ত, একই সঙ্গে কাপের পর কাপ গোলাপী লেমোনেডে চুমুক দিয়ে চলেছে, আর রঙ-চঙে চকলেটের গা থেকে কাগজের মোড়ক খুলতে খুলতে ওদের আঙুল চটচটে হয়ে উঠেছে।

সবাই বেশ আরামে দিলখুশ হয়ে খেলা দেখছিলো, তখনই এক ম্যাজিসিয়ানের দালাল ফলাও করে চিৎকার শুরু করলো। বেঁটে, মোটা,

পরণে চেক কাপড়ের স্যুট, মুখে লম্বা এক চোঙ। দালালটা প্রাণপণে চেঁচালেও, ম্যাজিসিয়ান তাঁবুর সামনে তৈরী কাঠের মঞ্চের পেছনে একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেমন যেন নির্বিকার, অবজ্ঞার ভাব, এবং ভিড় করে জমায়েত হওয়া জনতার দিকে সে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ পরে, যখন প্রায় জনাপঞ্চাশ লোক মঞ্চের সামনে জড়ো হয়েছে, তখন আলোয় এসে দাঁড়ালো ম্যাজিসিয়ান। জনতার মধ্যে থেকে শোনা গেলো চাপা গুঞ্জন।

ওপর থেকে ঠিকরে পড়া কর্কশ আলোয় ম্যাজিসিয়ানকে ভীষণ অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ক্ষয়ে আসা লম্বা রোগা চেহারা, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, এবং গর্তে বসা কুচকুচে কালো দুটো চোখ আকারে বিশাল ও ধকধক করে জ্বলছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই একদৃষ্টে চেয়ে রইলো তার দিকে। ম্যাজিসিয়ানের গায়ে ঘন কালো স্যুট ও সেকেলে সরু টাই—সব মিলিয়ে সাক্ষাৎ শয়তানের ছাপ।

শীতল দৃষ্টিতে জনতাকে জরিপ করলো সে, অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠলো তাচ্ছিল্য এবং চাপা বিদ্বেষ।

তার গমগমে স্বর সহজেই পৌঁছে গেলো ভিড়ের শেষ সারি পর্যন্ত। সে বললো, 'আপনাদের মধ্যে থেকে যে কোন একজনের সাহায্য আমার দরকার। যদি দয়া করে কেউ স্টেজে আসেন—'

সবাই আশেপাশে তাকাতে লাগলো, ঠেলতে লাগলো একে অপরকে কিন্তু মঞ্চের দিকে কেউই এগিয়ে এলো না।

ম্যাজিসিয়ান কাঁধ ঝাঁকালো। ক্লান্ত গলায় সে বললো, 'আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ না এলে এ খেলা দেখানো সম্ভব নয়। আমি আপনাদের হলফ করে বলছি, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, এই খেলায় ভয়ের কিছু নেই। এ নেহাৎই নিরীহ খেলা।'

প্রত্যাশা নিয়ে চারপাশে তাকালো সে, আর ঠিক তখনই জনৈক যুবক কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে লাগলো মঞ্চের দিকে।

হাত বাড়িয়ে তাকে মঞ্চে উঠতে সাহায্য করলো ম্যাজিসিয়ান, এবং ছেলেটিকে একটা চেয়ারে বসালো।

'আরাম করে বসুন,' ম্যাজিসিয়ান বললো, 'এক্ষুণি আপনাকে আমি হিপনোটাইজ করে ঘুম পাড়িয়ে দেবো। তখন আপনাকে যা বলবো আপনি তাই শুনবেন।'

ছেলেটি চেয়ারে বসে ছটফট করতে লাগলো, দর্শকদের দিকে, তাকিয়ে সপ্রতিভ ভাবে হাসলো।

ম্যাজিসিয়ান তার বিশাল চোখ যুবকের চোখে স্থির রেখে তার মুখ ফেরালো, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেলো।

হঠাৎই ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন রঙীন পপকর্ণের একটা বিরাট প্যাকেট ছুড়ে মারলো মঞ্চের দিকে মঞ্চের আলোর ওপর দিয়ে উড়ে এসে সেই প্যাকেটটা খপ্ করে পড়লো চেয়ারে বসে থাকা যুবকের ঠিক মাথায়।

ছেলেটি চকিতে ঝাঁকুনি দিলো একপাশে, আরেকটু হলেই সে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলো এবং একটু আগের নিশ্চুপ হয়ে থাকা জনতা গলা ফাটিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলো।

ম্যাজিসিয়ান রাগে কাঁপতে লাগলো। মুখচোখ লাল করে ভয়ংকর ক্রোধে সে তাকিয়ে রইলো দর্শকদের দিকে।

'কে ছুড়লো এটা?' হোঁচট খাওয়া গলায় জানতে চাইলো সে।

সবাই আস্তে আস্তে চুপ করে গেলো।

ম্যাজিসিয়ান তখনও তাদের দিকে লাল চোখে তাকিয়ে। অনেকক্ষণ পরে তার মুখ আবার ফ্যাকাসে হলো এবং বন্ধ হলো শরীরের কাঁপুনি কিন্তু তার উজ্জ্বল চোখ দুটো একই ভাবে জ্বলতে লাগলো।

অবশেষে মঞ্চে বসা যুবকটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো ম্যাজিসিয়ান, ছোট্ট করে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে বিদায় দিলো, তারপর আবার ফিরে তাকালো দর্শকদের দিকে।

'মাঝ পথে বাধা পড়ার জন্য খেলা আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।' নীচু গলায় ঘোষণা করলো ম্যাজিসিয়ান, 'আর তার জন্য নতুন কাউকে দরকার। পপ্কর্ন্ এর প্যাকেটটা যিনি ছুড়ে মেরেছেন আশা করি মঞ্চে আসতে তাঁর আপত্তি নেই?'

প্রায় ডজন খানেক লোক একসঙ্গে ঘুরে তাকালো ভিড়ের পেছন

দিকে, আলো-আঁধারেতে দাঁড়িয়ে থাকা জনৈকের দিক।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখতে পেলো ম্যাজিসিয়ান; তার কালো চোখ যেন ধিকিধিকি জ্বলে উঠলো। গম্ভীর ঠাট্টার সুরে সে বললো, 'এ খেলায় যিনি বাধা দিয়েছেন তিনি হয়তো আসতে ভয় পাচ্ছেন। ছায়ায় লুকিয়ে পপকর্নের ঠোঙা ছুড়তেই তাঁর বোধহয় ভালো লাগে।'

অপরাধীর ঠোঁট চিরে আকস্মিক ভাবেই বেরিয়ে এলো এক অস্ফুট চিৎকার, এবং সে দুহাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে লাগলো মঞ্চের দিকে। তার চেহারায় তেমন কোন বিশেষত্ব নেই। বরং প্রথম যুবকের সঙ্গে যেন অনেকটা মিল আছে। দুজনেকেই দেখে সাদামাটা ক্ষেতী-মজুর বলে মনে হয়।

তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে দ্বিতীয় যবক মঞ্চের ওপর চেয়ারে গিয়ে বসলো এবং স্পষ্টই দেখা গেলো, প্রায় কয়েক মিনিট ধরে সে ম্যাজি-সিয়ানের 'আরাম-করে-বসার' নির্দেশকে অগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করলো। তবে একটু পরেই তার এক রোখা ভাব মিলিয়ে গেলো এবং অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মতো সে তাকিয়ে রইলো তার চোখের সামনে স্থির হয়ে থাকা জ্বল-জ্বল দুটো চোখের দিকে।

মিনিট খানেক পরেই ম্যাজিসিয়ানের আদেশে সে উঠে দাঁড়ালো এবং মঞ্চের শক্ত পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়লো চিৎ হয়ে। শোনা গেলো দর্শকদের দ্রুত শ্বাস নেবার শব্দ।

'এবারে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ুন,' ম্যাজিসিয়ান সুর করে বলতে লাগলো, 'ঘুমিয়ে পড়ুন ধীরে ধীরে। এই তো, আপনার চোখে ঘুম নেমে আসছে। গভীর ঘুমে আপনি এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। এবার আপনাকে যা যা আদেশ করবো, সব আপনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। আমার প্রতিটি আদেশ আপানাকে শুনতেই হবে। যা বলবো তাই ....।'

একঘেয়ে সুরে বেজে চললো তার কথাগুলো। একই শব্দ সে বার বার বলতে লাগলো। জনতার মুখে টু শব্দটি নেই। সবাই চুপচাপ ছবির মতো দাঁড়িয়ে।

হঠাৎই ম্যাজিসিয়ানের সুর পালটে গেলো, এবং দর্শকরা টানটান হয়ে

উঠলো উত্তেজনায়।

'উঠে দাঁড়াবেন না—আস্তে আস্তে ওপরে ভেসে উঠুন!' ম্যাজিসিয়ান আদেশ দিলো. 'ভেসে উঠুন ওপরে!' তার কালো চোখ বন্য আগুনের মতো স্বপ্রভ হয়ে জ্বলতে লাগলো। দর্শকরা শিউরে উঠলো।

'উঠুন ওপরে!'

তখন চমকে উঠে একসঙ্গে শব্দ করে শ্বাস টানলো জনতা।

মঞ্চে টান টান হয়ে শুয়ে থাকা যুবকের একটি পেশীও নড়লো না, কিন্তু সে ঐ অবস্থায় ভেসে উঠতে লাগলো ওপরে। প্রথমটা এতো ধীরে যে ঠিক বোঝাই গেলো না, কিন্তু পরক্ষণেই তার গতি ক্রমে বাড়তে লাগলো। 'উঠুন!' গমগম করে উঠলো ম্যাজিসিয়ানের কণ্ঠস্বর।

ছেলেটি ভাসতে ভাসতে ক্রমশ মঞ্চ থেকে বেশ কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেলো এবং তখনও তার গতি থামেনি।

দর্শকদের মনে তখন দৃঢ় বিশ্বাস যে এটা এক ধরণের ম্যাজিক ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে দেখতে লাগলো। ছেলেটি যেন বাতাসে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে, নিরাবলম্ব হয়ে দোল খাচ্ছে সামান্য।

হঠাৎই দর্শকদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হলো. নিবদ্ধ হলো অন্য জনের ওপর। ম্যাজিসিয়ান একহাতে নিজের বুক চেপে ধরেছে, কয়েক পা টালমাটাল পায়ে এগিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মঞ্চের ওপর।

ডাক্তার-ডাক্তার করে সবাই চেঁচিয়ে উঠলো। চেকস্যুট পরা দালাল তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো, ঝুঁকে পড়লো মঞ্চে পড়ে থাকা নিথর দেহটার ওপর।

সে নাড়ী দেখলো, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কেউ এক বোতল হুইস্কি এগিয়ে দিলো তার দিকে, কিন্তু সে শুধুই কাঁধ ঝাঁকালো।

হঠাৎই জনতার ভিড় থেকে একটি মহিলা চিৎকার করে উঠলো।

সবাই ফিরে তাকালো তার দিকে. এবং পরক্ষণেই মহিলাটির দৃষ্টি অনুসরণ করে তারা ওপরে তাকালো।

সঙ্গে সঙ্গে আরও চিৎকার শোনা গেলো—কারণ ম্যাজিসিয়ানের ঘুম পাড়ানো ছেলেটি এখনও ওপরে উঠে চলেছে। সবাই যখন মরনাপন্ন ম্যাজিসিয়ানের দিকে তাকিয়েছিলো, তখনও তার গতি থামেনি। এখন মঞ্চ থেকে সে প্রায় সাত ফুট ওপরে এবং অবাধে ভেসে চলেছে। ম্যাজিসিয়ান মরে যাবার পরও সে তার শেষ আদেশ, 'উঠুন!' অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে।

ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ নিয়ে দালালটা পাগলের মতো লাফ দিলো ওপর দিকে, কিন্তু বেঁটে হওয়ায় তার হাত পৌঁছলো না। শূন্যে ভেসে চলা শরীরটাকে তার আঙুল কোন রকমে স্পর্শ করলো মাত্র. তারপরই সে বিকট শব্দে পড়ে গেলো মঞ্চের ওপর।

যেন কোন অদৃশ্য দড়ির টানে ছেলেটি কাঠ হয়ে শুয়ে থাকা ভঙ্গীতে ভেসে চললো ওপরে।

মেয়েরা পাগলের মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো; পুরুষরা চিৎকারে দিশেহারা। কেউই বুঝতে পারছে না কি করবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা দালালের চোখে আস্তে আস্তে জন্ম নিলো আতঙ্ক। মঞ্চে লুটিয়ে পড়ে থাকা ম্যাজিসিয়ানের দিকে মরিয়া হয়ে একবার তাকালো সে।

'নেমে এসো. ফ্র্যাঙ্ক! নেমে এসো!' জনতা চিৎকার করে উঠলো. 'ফ্র্যাঙ্ক! জাগো. নেমে এসো। থামো, ফ্র্যাঙ্ক!'

কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের পাথরের মতো দেহ আরও ওপরে উঠতে লাগলো ওপরে, ওপরে, একসময় মেলার তাঁবুর মাথায় পৌঁছে গেলা, তারপর বিশাল বিশাল গাছ ছাড়িয়ে উঠে গেলো ওপরে, অবশেষে পৌঁছে গেলো নরম চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া আকাশে।

দর্শকদের অনেকে ভয়ে মুখ ঢাকলো হাতে, মুখ ফিরিয়ে নিলো। যারা তখনও তাকিয়ে ছিলো, তারা দেখলো ফ্র্যাঙ্কের শরীরটা আকাশে ভাসতে ভাসতে ক্রমে একটা বিন্দুর আকার নিলো. যেন একটা ছোট্ট কয়লার টুকরো ভেসে চলেছে চাঁদের দিকে।

তারপর সেটা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

জোসেফ পি, ব্রেনান॥ ইংরাজী সাহিত্যে রহস্য গল্পের ইতিহাসে জোসেফ পি, ব্রেনান এক উজ্জ্বল নাম। লেখক ভৌতিক তথা রহস্য গল্পকে মানব মনের গহন প্রদেশের কোন এক হারিয়ে যাওয়া ঘটনার ঘনঘটায় প্রস্ফুটিত করেন। আমাদের এযুগের অবক্ষয় ও হিংসাশ্রয়ী জীবনের প্রাত্যহিকতার আলেখ্য রচনায় পি ব্রেনান এক উল্লেখ্য নাম। লেখক তাঁর রহস্য ও ভৌতিক গল্পগুলিতে পাঠক পাঠিকাদের মনের গোপন গহন অঞ্চলের যুগসঞ্চিত জটগুলি উন্মোচিত করার চেষ্টায় ব্রতী। ফলে পি ব্রেনান আজকের দিনে ওদেশের ভৌতিক গল্পের সকল অভিজাত সংকলনে এক অপরিহার্য স্থান অধিকার করেছেন। আমরা এখানে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প "লেভিটেশন"কে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করতে পেরে আনন্দিত।
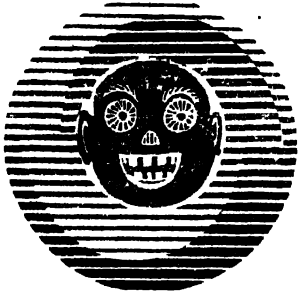
শবের মুখ

DEAD MAN'S FACE

এইচ বারোজ

'লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। এ যে একটা মরার মুখ নিশ্চল নিস্প্রাণ দুটি চোখের তারা ফ্যাকাসে মুখের বর্ণ।'

রাত তখন এগারোটা কি বারোটা হবে।

ছোট্ট একটা গলির মোড় ঘুরে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন এক ভদ্রলোক। রাস্তায় একমাত্র উনিই পথিক। না, আরেকজন ছিল। একজন যুবতী। তাঁর বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসছে। আর তার কাছাকাছি আরও একজন হেঁটে চলেছে, তারই দিকে।

মেয়েটি লোকটির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এলো। চকিতে পেছন ফিরে একবার তাকালো, লোকটিকে লক্ষ্য করলো। তারপর ভীত চোখে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে গেল একটা গলির মধ্যে, দেয়ালের গায়ে মুখ আড়াল করে থরথর করে কাঁপছে সে।

হঠাৎ মেয়েটির এমন আচরণে ভদ্রলোক অবাক হলেন। কি ব্যাপার? দেখে মনে হচ্ছে, মেয়েটি ভীষণ ভয় পেয়েছে? তবে কি লোকটিকে দেখে···

তিনি আর সময় নষ্ট না করে পিছু ধরলেন লোকটির। লোকটি ধীরপায়ে এগিয়ে যাচ্ছে একটি বাড়ির দিকে।

ভদ্রলোক লক্ষ্য করলেন, লোকটি নির্দ্দিষ্ট বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর পকেট থেকে চাবি বের করে ভেতরে ঢুকলো।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ালেন লোকটির সামনে। লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। এ যে একটা মড়ার মুখ···নিশ্চল নিষ্প্রাণ দুটি চোখের তারা······ফ্যাকাসে মুখের বর্ম

মুহূর্তের জন্য বিচলিত হলেও নিজেকে সামলে নিলেন ভদ্রলোক। চটপট বাড়ীর নম্বরটা ডাইরীতে টুকে নিয়ে ফিরে এলেন।

সারারাত ভদ্রলোকের চোখের পাতা দুটি বন্ধ হলো না। বিছানায় অস্থির ভাবে ছটফট করতে লাগলেন। কেবলই চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই মৃতদেহের মুখটা। অপেক্ষা করে রইলেন ভোর হবার আশায়।

সকাল হতেই বেরিয়ে পড়লেন নিজের আবাস থেকে। বাড়ীটা খুঁজে বের করতে তার বেশী সময় লাগলো। সামনের সদর দরজা বন্ধ। বড় বড় অক্ষরে দরজায় লেখা—ঘর ভাড়া দেওয়া হবে।

কলিং বেল টিপতেই এক মহিলা এসে দরজা খুললেন। মুখেচোখে তার অত্যধিক উত্তেজনা মাখানো।

মহিলার কাছে জিজ্ঞসা করে ভদ্রলোক জানতে পারলেন, কতকগুলো ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। ভদ্রলোক ঘরগুলো দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

মহিলা ঘর দেখাতে নারাজ—আজ দেখানোর ঝামেলা আছে আপনি বরং...............

—ঘরগুলো আজ দেখলেই ভাল হত। লণ্ডন ছেড়ে আজই বহুদূরে চলে যাচ্ছি। আজ যদি ঘরগুলো দেখে ব্যবস্থা না করে যাই, পরে হয়তো ভাড়া পাওয়া যাবে না।

কি আর করা যায়। অগত্যা মহিলা রাজী হলেন। দোতলায় পা বাড়াতেই নজরে পড়লো চমৎকার সাজানো ঘরগুলো। সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র পরি পাটি করে সাজানো। এখানে আগে কেউ যে বাস করেছেন এবং তিনি যে বিলাসী ও আরামপ্রীয় ছিলেন তা স্পষ্ট বোঝা গেল।

—বাঃ বেশ বড় বড় ঘর। কিন্তু এই জিনিস পত্র গুলো? ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

—ওগুলো সেই ভদ্রলোকের, এখানে যিনি থাকতেন।

—এখন তিনি কোথায় আছেন?

ব্যাপারটা প্রথমে চাপা দিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন বাড়িউলি। কিন্তু

একসময় কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং বললেন—অনেকদিন ধরে আমার এই ভাড়াটে ভদ্রলোকটি আছেন খুব আমুদে ও দয়ালু ছিলেন। আমাদের সঙ্গে দারুন ভাব হয়ে গিয়েছিল, একেবারে আপন লোকের মত।

…তাঁর সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে আমরা তাঁর পাশে থাকতাম। প্রতি বছর তিনি এই সময় মন্টিকার্লোতে যান। এবারও একমাস আগে সেখানে গেছেন।

কিন্তু…আবার মহিলা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তারপর ভদ্রলোকের হাতে একটা টেলিগ্রাম তুলে দিলেন। বললেন—এটা আজ সকাল আটটায় পেয়েছি।

ভদ্রলোক চোখ দিলেন টেলিগ্রামের পাতায়—গত রাতে প্রায় সোয়া বারোটা নাগাদ তাকে গুলীবিদ্ধ অবস্থায় চেয়ারে বসে থাকতে দেখা গেছে তার হাতে একটা রিভলবার ছিল।

ভদ্রলোকের মনে পড়ে গেল গতরাত্রের দেখা সেই মৃতদেহের মুখটির কথা। তখন কার সময় এবং লোকটির মৃত্যুর সময় এক।

এইচ বারোজ

যে সমস্ত গল্পকার গল্পের রূপ, রস ও আঙ্গিককে ভৌতিক গল্পের রহস্য ও ভীতির শিহরণে জারিত করে পরিবেশন করেন এইচ বারোজ তাঁদের অন্যতম। লেখক গল্পের গল্পত্বের সাথে রহস্যময় এক কুহেলী সৃষ্টি করে আমাদের মনে ভীতি বিহ্বল এক কল্পজগতের আস্তারণ বিস্তার করেন। আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানপুষ্ট জিজ্ঞাসু মনেও এক অনাদিকালের ভৌতিক মনস্কতা সৃষ্টি লেখকের এক বিশেষ গুণ। কুশলী বিষয় বিন্যাসে বিধৃত তাঁর ভৌতিক গল্পগুলি আজ বহুভাষায় অনুদিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আসীন।

অপার্থিব

উইলিয়াম ফকনার

'দীর্ঘক্ষণ ধরে আমরা দেখছি, শুধুই দেখছি, সংজ্ঞাহীন মুখের অদ্ভুত গম্ভীর হাসি। ওর শোয়ার ভঙ্গী দেখে মনে হয়, একদিন কাউকে ও ওর বাহু-ডোরে বেঁধেছিল, কিন্তু এখন ওর দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন ঘুম প্রেমকে পার হয়ে যায়, মিলন মুহূর্তটিও নিঃশেষে মুছে যায়।'

মিস এমিলি গ্রিয়ারসনের একজন পুরোনো চাকর ছিল। যে একাধারে রান্নাঘরের পাচক, অন্যদিকে বাগানের মালী। সে ছাড়া আর কেউ গত দশ বছর এমিলির বাড়ীর ভেতর ঢোকেনি।

যখন মিস এমিলি গ্রিয়ারসন মারা গেলেন, তখন তাঁর অন্তেষ্টীক্রিয়া দেখার জন্য সারা শহরের মানুষ ছুটেছিল—পুরুষেরা গিয়েছিল ভেঙে পড়া এক স্মৃতি স্তম্ভকে সম্মান ও ভালবাসা জানাতে, মেয়েরা এমিলির বাড়ির ভেতরটা দেখতে চেয়েছিল।

বিরাট বড় বাড়ী, এককালে চৌকোনা ফ্রেমের দেয়ালগুলো সাদা ছিল, গোল গম্বুজ, বুরুজের আকাশ ছোঁয়া ছুঁচলো চূড়া, গুটানো পার্চমেণ্টের মত ঝুলবারান্দা ১৮নং এর বাড়ী তৈরীর স্টাইল—ভারিক্কী অথচ অপলকা।

এই রাস্তাটা ছিল আমাদের শহরের সবচেয়ে অভিজাত পাড়া। কিন্তু আজ এই এলাকার স্মরণীয় নামগুলো মুছে গেছে। তার মূলে মোটর গ্যারেজ এবং কার্পাস তুলো থেকে বীজ ঝাড়াই করার মেসিন। কার্পাস তুলোর ওয়াগন ও পেট্রল পাম্পগুলোর মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে আছে মিস এমিলির বাড়ীটা—অবাধ্য একগুঁয়ে বাজে স্বভাবের মেয়ের ভাঙা

শরীরের মত। ওয়াগান ও পাম্পগুলো যেন চোখের বালি।

এখন, সীজারের ছায়ায় গোরস্থানে যেখানে জেফারসনের যুদ্ধে দুপক্ষের নিহত যত সৈনিক শুয়ে আছে, যাদের আমরা নাম জানি না, পদ মর্যাদা জানি, সেখানে আরও অনেক স্মরণীয় নামের প্রতিনিধিদের পাশে মিস এমিলিও শুয়ে থাকবে।

এই শহরে মিস এমিলি বহু বছর ধরে আছে। উনি আমাদের শহরের ঐতিহ্য, দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতীক। ১৮৯৪, সেদিন থেকে শহরের মেয়র কর্ণেল সারটেরিস, সেদিন থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সে দায়িত্ব আমাদের কাঁধে চেপেছে—হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোকের প্রথম দরজা ভাঙার প্রচণ্ড আলোড়নে ঘরটা ধুলোয় ভরে গেল। একটা ক্ষীণ, তীক্ষ, গন্ধ স্নায়ুতে ভেসে এলো, যেন আমরা কোন কবরের মধ্যে প্রবেশ করেছি।

তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কোন নিগ্রো মেয়ে অ্যাপ্রন না পরে রাস্তায় বের হতে পারতো না। অথচ উনিই বললেন, ওর বাবার মৃত্যুর সময় থেকে যতোদিন পর্যন্ত এমিলি বাঁচবে ততদিন তাকে কোন ট্যাক্স দিতে হবে না।

জটিল একটা গল্প আবিষ্কার করেছিলেন মেয়র কর্ণেল সারটেরিস—মিস এমিলির বাবা আমাদের শহরের পৌর কতৃপক্ষকে টাকা ধার দিয়েছিলেন, ব্যবসায়িক স্বার্থে এইভাবে টাকাটা ফেরত দিচ্ছে শহরের মানুষ।

কর্ণেল সারটোরিসের যুগে একজন মানুষের পক্ষেই এমন অদ্ভুত একটা আবিষ্কার সম্ভব। এবং একজন রমনী ছাড়া কেউ কি এটা বিশ্বাস করতো? অথচ মিস এমিলি করেও করুণার পাত্রী হতে চায়নি। সে বিশ্বাস করেছিল কর্ণেল সারটোরিস যা বলেছেন তাই সত্যি।

এলো নতুন যুগ এবং আধুনিক চিন্তাধারা—এই নতুন ব্যবস্থাটা নতুন মেয়র আর আল্ডারম্যানদের মনের মত হলো না। বছরের প্রথমে মিস এমিলিকে ট্যাক্সির নোটিশ পাঠানো হলো। ফেব্রুয়ারী মাসেও চিঠির কোন উত্তর এলো না। ওরা নিয়ম-কানুন অনুযায়ী চিঠি দিলেন এমিলিকে, জানালেন, তার সুবিধা মত শেরিফের অফিসে দেখা করতে।

এক সপ্তাহ পরে মেয়র নিজে চিঠি পাঠালেন—উনি কি এমিলির

বাড়ী যাবেন, না গাড়ী পাঠালে মিস এমিলি আসবেন ?

এবার উত্তর এলো। সেকেলে অদ্ভুত ধরনের কাগজে অস্পষ্ট কালিতে সরু ফুলকাটা অক্ষরে লেখার আজকাল এমিলি বাড়ীর বাইরে যায় না। সঙ্গে ট্যাক্স নোটিশটা বিনা মন্তব্যে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

অল্ডারম্যানদের বিশেষ মিটিং ডাকা হল। তারপর এক প্রতিনিধি দল ওর সঙ্গে দেখা করতে গেল। আট দশ বছর আগে এমিলি চীনে মাটির ওপরে কারুকার্য আঁকার ক্লাস নিতো। সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আর কেউ কখনও তার বাড়ীতে ঢোকেনি।

ওরা দরজায় ধাক্কা দিলে বুড়ো নিগ্রো চাকর দরজা খুলে দিলো। হল ঘরের আবছা আলো থেকে গাঢ়তর ছায়ার দিকে সিড়ি চলে গেছে। ধুলো এবং অব্যবহৃত ঘরের গন্ধ—বন্ধ ঘরের স্যাঁতে সেঁতে গন্ধ। নিগ্রো চাকরকে অনুসরণ করে ওরা বসবার ঘরে গেল। চাকরটি একটা জানলার পর্দা সরালো।

ভারী চামড়ায় মোড়া আসবাবপত্র ওঁদের নজরে পড়লো কিন্তু চামড়ায় ফাটল দেখা দিয়েছে। ওঁরা বসলেন। জানলা দিয়ে সূর্য কিরণ সূক্ষ্মভাবে ওদের উরুর কাছাকাছি এসে পড়েছে, তার মধ্যে ধুলিকণা ঘুরছিল। ইমেলের গিল্ট সময়ের দাগ, সেখানে রঙীন খড়ি পেন্সিলে আঁকা মিস এমিলির বাবার ছবি।

এমিলি ঘরে ঢুকলো, ওঁরা উঠে দাঁড়ালেন। এমিলির পরনে কালো পোশাক, বেঁটে মোটা চেহারা, সোনার সরু চেন কোমরে নেমে এসে বেল্টের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। যে ছড়িতে ভর দিয়ে সে হাঁটছিল, সেটি আবলুশ কাঠের তৈরি, ছড়ির মাথাটা সোনা দিয়ে বাঁধানো, তাতে ময়লা দাগ। তার শরীরের হাড়গুলো ছোট্ট, রোগা। তাই যে চেহারায় অন্য কাউকে গোলগাল মনে হতো, এমিলিকে বিশ্রী মোটা লাগে।

কোন স্রোতহীন জলে অনেকদিন ডুবে থাকলে যেমন হয় তেমনি এমিলির মুখ চোখ ফোলা ফোলা ভাব। যেন তার চামড়ায় জলে ডোবা শবদেহের ফ্যাকাশে রং। মুখে অসংখ্য চর্বির স্তরের মধ্যে চোখদুটো হারিয়ে গেছে। যেন একতাল ময়দার মধ্যে দুটো কয়লার কুচি বসানো।

এমিলি দরজায় দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনছিল। আল্ডারম্যানের কথা বলতে বলতে জড়িয়ে যাচ্ছিল বার বার হোঁচট খাচ্ছিল একসময়ে উনি চুপ করে গেলেন।

তারপর ওরা এমিলির পোশাকের আড়ালে সোনার চেনের প্রান্তে অদৃশ্য ঘড়ির টিক-টিক শব্দ শুনতে পেলেন।

—জেফ্যারসনে আমি কোন ট্যাক্স দিই না। এমিলির কণ্ঠস্বর শুকনো এবং ঠাণ্ডা। কর্ণেল সারটোরিস আমাকে বুঝিয়েছিলেন, আমার কাছে এ শহরের কোন ট্যাক্স পাওনা নেই। যদি কেউ সিটি রেকর্ডস খুঁজে দেখেন, তাহলে দেখবেন—

—আমরা দেখেছি। মিস এমিলি, আমরা শহরের নতুন প্রশাসক। শেরিফের নোটিশ কি আপনি পাননি. ?

—হ্যাঁ, আমি একটা কাগজ পেয়েছি। যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি হয়তো মনে করছেন, তিনিই শেরিফ। জেফ্যারসন শহরে আমাকে ট্যাক্স দিতে হয় না।

কিন্তু রেকর্ডে তেমন কিছু উল্লেখ নেই আইন আনুযায়ী আমাদের—

—কর্ণেল সারটেরিসের সঙ্গে আপনরা দেখা করুন। (অথচ কর্ণেল সারটেরিসর প্রায় দশ বছর আগে মারা গেছেন) আমি জেফরসনে ট্যাক্স দিই না। টোবে, !

ডাক শোনা মাত্র নিগ্রো চাকরটা এগিয়ে এলো,—এদের বাইরে নিয়ে যাও।

দুই

ওরা পরাজিত। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে মিস এমিলির বাড়ী থেকে যখন অদ্ভুত একটা দুর্গন্ধ হাওয়ায় ভাসতো, তখনও একই ভাবে হার মেনেছিল ওদের পূর্বপুরুষেরা, তার দুবছর আগে এমিলির বাবা মারা গেছেন, সামান্য কদিন আগে এমিলির প্রেমিক ওকে ছেড়ে গেছে। অথচ আমরা মনে করেছিলাম, হোমার ব্যারনের সঙ্গেই এমিলির বিয়ে হবে।

বাবার মৃত্যুর পর এমিলি খুব একটা বাইরে যেতো না। যেদিন

হোমার ব্যারন তাকে ছেড়ে চলে যায়, সেদিন থেকে এমিলিকেও লোকে দেখতে পায়নি। দু' একজন মহিলা সাহসে ভর করে তার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, কিন্তু এমিলি দেখা করেনি। ঐ প্রকাণ্ড বাড়িতে প্রাণের একমাত্র অস্তিত্ব ছিল নিগ্রো চাকর টোবে। বাজারের ঝুড়ি হাতে সে বাইরে যেতো, ভেতরে ঢুকতো।

—রান্নাঘর পরিষ্কার রাখা কি পুরুষ মানুষের পক্ষে সম্ভব? মেয়েরা বলতো।

তাই এমিলির বাড়ী থেকে যখন বাজে পচা গন্ধ ভেসে এলো, তখন ওরা অবাক হয়নি। দুর্গন্ধটা হাওয়ায় ছড়াচ্ছিল। বাইরের স্থূল অতি-সাধারণ জনবহুল পৃথিবী এবং অভিজাত গ্রিয়রস পরিবারের মধ্যে যোগাযোগের আর একটা সূত্র।

প্রতিবেশিনী এক মহিলা মেয়রের কাছে নালিশ জানালেন। তখন ঐ শহরের মেয়র প্রাক্তন বিচারপতি সিটভেনসের বয়স আশি বছর।

—কেন, মিস এমিলিকে খবর পাঠান। এভাবে আশে পাশে বদ গন্ধ ছড়ানো আইন বিরুদ্ধ—

তার আর প্রয়োজন নেই। খুব সম্ভব, ঐ নিগ্রো চাকরটা বাড়ীর আশে পাশে সাপ বা ইদুঁর মেরে ফেলে রেখেছে।

—আমি ওকে বলবো—

কিন্তু পরের দিন মেয়রের কাছে আরও দুটো নালিশ এলো।

এক ভদ্রলোক দুঃখিত এবং লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, কিছু একটা করা দরকার। আমি মিস এমিলিকে বিরক্ত করতে চাইনা। কিন্তু বদ গন্ধটা—

সেদিন রাতে অল্ডারম্যানদের মিটিং বসলো—তিনজন পাকা দাড়ি বুড়ো এবং নতুন যুগের একজন কম বয়সী সদস্য। ব্যাপারটা খুবই সোজা। অল্প বয়সী ভদ্রলোক বোঝাচ্ছিলেন, মিস এমিলিকে লোক পাঠিয়ে বলে দিন, বাড়ীর আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। ওকে কিছুটা সময় দিন, যদি উনি একেবারেই—

—পাগল নাকি মশায়। মেয়র লাফিয়ে উঠলেন, একজন অভিজাত পরিবারের ভদ্রমহিলাকে আপনি বলবেন, ওর বাড়ী থেকে বদ গন্ধ ছড়াচ্ছে?

তাই পরের দিন, মধ্য রাতের কিছু পরে, মিস এমিলির লন পেরিয়ে চারজন লোক চুপি চুপি অতি সন্তর্পণে ওর বাড়ির চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর ফেলে ঘুরলো, ইটের গাঁথুনির নীচের দিক, ও মাটির নীচের ভাঁড়ার ঘর থেকে কোন বিশ্রী গন্ধ আসছে কিনা, তা ওরা শুঁকে পরীক্ষা করলো। ওদেরই একজন কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে চুন ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছিল।

ওরা যখন লন পেরিয়ে ফিরে এলো, তখন ওপরের একটা ঘরে আলো জ্বাললো। জানালা দিয়ে দেখা গেল আলোর পেছনে মিস এমিলির বাজু ও অনমনীয় শরীরের কাঠামো স্থির, নিশ্চল, স্ট্যাচুর মত ছায়া। যারা মিস এমিলির বাড়ীর আশপাশ পরিষ্কার করতে এসেছিল তারা তাড়াতাড়ি সারিবদ্ধ গাছের ছায়ায় আত্মগোপন করলো। এক হপ্তা কেটে গেল, তারপর থেকে বাড়ীটা থেকে আর কোন গন্ধ হাওয়ায় ভেসে বেড়াতো না।

এই ঘটনাই জেফারসনের মানুষের মনকে তিক্ত করে দেয়। তারা এমিলির কথা ভেবে দুঃখ পেতো। এমিলির দূর সম্পর্কের ঠাকুমা মিসেস ওয়াট শেষ বয়সে বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। শহরের লোকেরা মনে করে, গ্রিয়ারসনরা নিজেদের বড়ো বেশী উঁচু মহলের লোক ভাবে, আসলে যা তার থেকেও বেশী। এমিলির বাবা মেয়ের পাত্র হিসেবে শহরের কোন যুবককেই মানতে রাজী হননি।

অনেক সময় আমরা কল্পনায় দেখেছি মুকাভিনয়ের একটা নাটকীয় দৃশ্য পেছনের পটভূমিতে সাদা পোশাক পরা তরুণী এমিলি এবং মঞ্চের সামনের দিকে এমিলির বাবার কুৎসিত ছায়া, তার হাতে ধরা চাবুক, সামনের দরজাটা হাঁ করে খোলা। অপমানিত কোন প্রেমিক সেখান দিয়ে একটু আগেই বেরিয়ে গেছে।

তাই যখন এমিলি তিরিশের কোঠায় পা দিলো, বিয়ে হলো না তখন আমরা দুঃখ পেয়েছিলাম। তবে ওদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা সঠিক প্রমাণ হলো। যতই পরিবারে পুরোনো পাগলামীর ইতিহাস থাক না কেন, তবু এমিলির বিয়ে হতো যদি সুযোগগুলো ঠিকমত ব্যবহার করা যেতো।

ওর বাবা মারা যাওয়ার পর জনরব শোনা গেল, ভদ্রলোক মেয়ের জন্য

এই বাড়ীটা ছাড়া কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। একদিক থেকে লোকে আনন্দিত হলো। এমিলি একা নিঃস্ব, এমিলি আমাদের আর পাঁচ জনের মত। এক পেনি কম বা বেশী থাকার নৈরাশ্য বা আনন্দ এখন এমিলিও ভোগ করবে।

আমাদের সামাজিক কানুন অনুযায়ী মহিলারা সহানুভূতি ও সাহায্যের উদ্দেশ্যে মিস এমিলির কাছে গেলেন। এমিলির মতই আগের মত মুখে বিষাদের ছায়া নেই। তার মুখে চোখের এমনই ভাব যে, আমার বাবা বেঁচে আছেন। মৃত দেহটা তিনদিন পর্যন্ত ছিল, কবর দেওয়া গেল না। পাদ্রী এবং ডাক্তাররা অনেক বুঝালো এমিলিকে। কিন্তু শেষে ফল না হওয়ায় জোর করে মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থা হলো, হঠাৎ এমিলি মুসড়ে পড়লো। আমরা খুব তাড়াতাড়ি মৃতদেহটা গোরস্থানে নিয়ে গেলাম।

এমিলি যে পাগল হয়ে যাবে, সেটাই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা তখনও বলিনি। পরপর অনেক যুবক এমিলির মনের মানুষ হতে চেয়েছে কিন্তু সকলেই তার বাবার তাড়নায় চলে গেছে, তারা অপমানিত হয়েছে।

কিন্তু এখন সে রিক্ত, অসহায়, একা। সে কাকে ধরে বেঁচে থাকবে? যিনি জীবনের সমস্ত সম্পদ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন, তাকে, তারই স্মৃতিকে।

তিন

এমিলি অনেকদিন অসুখে ভুগেছিল। তারপর একদিন তাকে দেখলাম, চুলগুলো ছোট্ট করে ছাঁটা, ছোট্ট মেয়ের মত গীর্জার জানলার রঙীন কাঁচের ওপরে আঁকা দেবদূতের মত শান্তি ও শোক দিয়ে গড়া তার মুখচ্ছবি।

শহরের ফুটপাথ গুলো বাঁধানোর কনট্রাক্ট দেওয়া কাজগুলো এমিলির বাবার মৃত্যুর পর শুরু হলো। নিগ্রো শ্রমিক, খচ্চরের পাল, যন্ত্রপাতি এবং একজন ইয়াংকি ফোরম্যান কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর সঙ্গে এলো। ইয়াংকি ফোরম্যানের নাম হোমার ব্যারন।

লম্বা ঋজু দেহ, শ্যামল গায়ের রং, কৌশলী, দক্ষ এবং উদ্যোগী পুরুষ

হোমার ব্যায়ন। সে দরাজ গলায় কথা বলে, চোখের তারা দুটি কালো, কিন্তু চামড়ার রঙের মতো অত গাঢ় নয়। তার পেছনে পেছনে নিগ্রো বাচ্চা ছেলেরা দল বেঁধে হাঁটে—সে নিগ্রো মজুরদের গালাগালি দেয়, গাঁইতির ওঠানামার তালে তালে মজুররা গান গায়। পার্ক বা চৌরাস্তার কাছাকাছি শহরের কোথাও যদি অল্প মানুষের হাসির শব্দ শোনা যেতো ভীড়ের কেন্দ্র জুড়ে হোমার ব্যারনকে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যেতো।

তারপর একদিন দেখা গেল, প্রতি রবিবার বিকেলে হলুদ ঘোড়ায় টানা হলুদ চাকাওলা বগী গাড়ীতে বসে হোমার ব্যারন ও এমিলি গ্রিয়ার-সন হাওয়া খেতে বেরোয়। হোমারের সম্বন্ধে এমিলি আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। আমরা তাই দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। মহিলাদের অবশ্য ধারনা ছিল, গ্রিয়ারসন পরিবারের কোন মেয়ে উত্তরের স্টেট থেকে আসা একজন ইয়াংকি দিনমজুরের সঙ্গে গুরুতর কোন ব্যাপারে কখনই নিজেকে জড়াবে না।

আর অন্যেরা, বিশেষ করে বৃদ্ধদের মত ছিল, অভিজাত পরিবারের কোন মহিলা যতই দুঃখ কষ্ট ভোগ করুক না কেন, আভিজাত্যের দায়িত্ব কখনও ভোলে না। ওরা কেবল বলতো, এমিলির আত্মীয় স্বজনদের উচিত, ওকে বোঝানো।

ক্লপ-ক্লপ-ক্লপ—হলুদ ঘোড়ায় টানা হলুদ চাকাওয়ালা বগী গাড়িটা রাস্তা দিয়ে চলে যেতো :

রবিবার বিকেলের রোদ যেন বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে না পারে, তাই আশেপাশের বাড়ীগুলোর জানালা বন্ধ। বন্ধ খড় খড়ির আড়ালে রেশম ও স্যাটিনের শব্দ হয়—বেচারা এমিলি!

কিন্তু যখন সে মাথা উঁচু করে হাটাচলা করতো তখনই তার নৈতিক অবনতির কথা মনে করছি। যেন গ্রিয়ারসন পরিবারের শেষ প্রতিনিধি আমাদের কাছে তার আভিজাত্যের স্বীকৃতি চাইছে, যেন মাটির পৃথিবীর সঙ্গে তার এই নতুন যোগাযোগের স্পর্শ আর একবার প্রমাণ করলো, কোন কিছুতে ভীত বা প্রভাবিত না হওয়াই আভিজাত্যের আসল প্রতীক।

যেমন ধরা যাক, অবশ্য সেটা এক বছর পরের কথা, এমিলি যখন

ইঁদুর মারার সেঁকো বিষ কিনলো। তখন সবাই বলেছে—বেচারা এমিলি!

সেই সময় এমিলির দুই মামাতো দিদি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, অ্যালাবামা থেকে।

—আমি বিষ কিনতে চাই। এমিলি ওষুধের দোকানের সেলস-ম্যানকে বলেছিল।

লাইট হাউসের আলো জ্বেলে রাতের সমুদ্রে নাবিককে পথ দেখায় যে মানুষ তার মুখের মত—বয়স তিরিশের কাছাকাছি, আগের চেয়ে আরো রোগা, মাথার রগ ও দুই চোখের কোটরের আশেপাশে মুখের চামড়া টানটান, চোখের দৃষ্টি স্থির ও উদ্ধত।

—নিশ্চয়ই। সেলসম্যান বলেছিল। কিন্তু মিস এমিলি, আপনি কোন্ ধরনের বিষ চান? ইঁদুর মারার জন্যে—

—যেটা তোমার দোকানের সবচেয়ে ভালো বিষ, তাই দাও। কোন্ ধরনের, অতশত জেনে তোমার কাজ কি?

দোকানদার অনেকগুলো বিষের নাম করলো। —ওগুলো হাতী মারার পক্ষেও যথেষ্ট। কিন্তু আপনি যা চাইছেন—

—আর্সেনিক? বিষটা কি কড়া নয়?

—আর্সেনিক? হ্যাঁ, ম্যাডাম। কিন্তু আপনি যা চাইছেন—

—আমি আর্সেনিক চাইছি।

এমিলির দিকে দোকানদার তাকিয়ে থাকে। এমিলিও তাকায়, শিরদাঁড়া সোজা ও ঋজু, মুখের চামড়া হাওয়ায় ওড়া নিশানের মত টানটান।

—কিন্তু, ম্যাডাম আপনাকে বলতে হবে, আপনি কি কারণে বিষটা চাইছেন? এটাই আইন।

মাথাটা পেছনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে বড় বড় চোখে তাকালো এমিলি, চোখে চোখ রাখলো, এক সময়ে চোখ নামিয়ে দোকানী ভেতরে গেল। আর্সেনিকটা প্যাকেটে মুড়ে দিয়ে নিগ্রো ডেলিভারী বয়ের হাতে দিয়ে এমিলির কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। দোকানী নিজে আর আসে নি।

এমিলি বাড়ীতে ফিরে এলো, প্যাকেটটা খুললো। বাক্সের ওপর মড়ার মাথা ও হাড়ের ছবি, নীচে লেখা—

"ইঁদুরের জন্যে"।

চার

পরের দিন আমরা সবাই বলেছিলাম, এমিলি আত্মহত্যা করবে এবং সেটাই আমাদের কাছে ভালো ছিল। প্রথম যখন আমরা ওকে হোমার ব্যারনের পাশে দেখেছি তখন আমাদের ধারনা ছিল, এমিলি ব্যারনকে বিয়ে করবে। কিন্তু এল্কস ক্লাবে ছোঁড়াদের সঙ্গে মদ খেতে দেখে হোমার বলেছে, বিয়ে-ফিয়ে তার দ্বারা হবে না। তবুও আমরা আশা করেছি, এমিলির চাপে পড়ে ও বিয়ে করতে বাধ্য হবে। তারপর প্রতি রবিবার বন্ধ খড়খড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে আমরা বলেছি—বেচারা এমিলি!

বগীগাড়ী রাস্তা দিয়ে ছুটে গেছে—হোমার ব্যারনের মাথায় হ্যাট তেরছা ভাবে লাগানো, ঠোঁটের ফাঁকে সিগার, হাতের হলুদ দস্তানার মুঠোয় ঘোড়ার লাগাম ও চাবুক, মিস এমিলির মাথা উঁচু।

মহিলারা বললেন, এমিলির অত্যাচারে এই শহরের মান মর্যাদা ধুলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ছেলে ছোকরাদের পক্ষে এ ধরনের ব্যাপার খুবই খারাপ। পুরুষেরা এমিলির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইলো না। কিন্তু মহিলাদের তাগিদে পাদ্রী এমিলির সঙ্গে দেখা করলেন।

এমিলি এবং পাদ্রীর মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল, সেটা পাদ্রী প্রকাশ করেন নি এবং তিনি আর কখনও এমিলির সঙ্গে দেখা করতে যান নি। পরের রবিবার রাস্তা দিয়ে বগীগাড়ী চালিয়ে এমিলি আর ব্যারন বেড়াতে গেল।

অবশেষে পাদ্রীর স্ত্রী অ্যালবামায় মিস এমিলির আত্মীয়দের চিঠি লিখলেন। যাদের সঙ্গে এমিলির রক্তের সম্পর্ক আছে ওরাই ওর কাছে এসেছে। দেখাই যাক, এখন কি হয়। প্রথমে কিছুই পরিবর্তন চোখে পড়লো না, পরে আমরা নিশ্চিত হয়ে উঠলাম যে এমিলি ও হোমারের

বিয়ে হতে চলেছে। গয়নার দোকানে পুরুষদের টয়লেট সেটের অর্ডার দিয়েছে এমিলি, রুপোর তৈরী প্রতিটা জিনিষের ওপর হোমার ব্যারনের নামের প্রথম দুই অক্ষর খোদাই করা থাকবে—এইচ, বি,।

দুদিন পরে কানে এলো—এমিলি নাইট শার্ট সমেত এক সেট পুরুষের পোষাক কিনেছে। তাহলে বিয়ের আয়োজন চলছে। আমরা খুশী হলাম।

এর মধ্যে রাস্তা বাঁধানোর কাজ শেষ। হোমার ব্যারন হঠাৎ শহর থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এ খবরটা পেয়ে আমরা একটুও বিস্মিত হই নি।

আমরা জানতাম, বিয়ের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত কিংবা এমিলির মামাতো বোনেদের অ্যালবামায় ফিরে যাওয়ার অপেক্ষা করছে।

এক সপ্তাহ পরেই অ্যালবামায় ওরা ফিরে এলো। আর তার তিনদিন পরেই হোমার ব্যারন শহরে ফিরে এলো। সন্ধ্যার সময় নিগ্রো চাকরটা ওকে পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দিল। এটা একজন প্রতিবেশীর নজরে পড়ে গেল।

কিন্তু তারপরে আর একদিনের জন্যেও আমরা হোমার ব্যারনকে চোখে দেখিনি। মিস এমিলিকেও নয়। কেবল পেছনের দরজা দিয়ে নিগ্রো চাকর বাজারের ঝুড়ি নিয়ে বাইরে বেরিয়েছে আর ঢুকছে।

পরের দু'মাস এমিলি হয়েছিল অন্তঃপুরবাসিনী, রাস্তায় বেরোয়নি। কখনও কখনও ওকে জানালায় দেখা যায়, যেমন সেদিন রাতে পৌর-কর্মচারীরা যখন দুর্গন্ধ দূর করার জন্য বাড়ীর আশেপাশে চুন ছড়াচ্ছে। আমরা জানতাম, এমন একটা কিছু ঘটবে এবং এটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ এমিলির স্বভাবে আছে ওর বাবার জ্বলন্ত ও তীব্র গুণ বা দোষের অংশ, যা এমিলির জীবনের সব স্বপ্নকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে, আজও তা জ্বলছে।

আবার যখন এমিলিকে আমরা দেখলাম, তখন তার বয়েস হয়েছে, চুল পেকেছে, মোটা হয়েছে। এরপরে আরও কয়েক বছর কেটে গেল, চুল আরও পাকলো। অবশেষে চুলের রঙ হল নুন মিশ্রিত গোল মরিচের গুঁড়োর রং, লোহাচুরের রং। তারপর আর চুলের রঙ পাল্টায় নি।

চুয়াত্তর বছর বয়সেও তার চুল ছিল লোহাচুরের মত রং, পরিশ্রমী শক্তিশালী কোন প্রৌঢ় পুরুষের মত, যখন সে মারা গেল।

সেই সময় থেকেই সামনের দরজা আর খোলা হতো না। মাঝে নীচের তলার একটা ঘরে স্টুডিও সাজিয়ে চীনেমাটির ওপর ছবি আঁকার ক্লাস নিতো এমিলি. এভাবে ছ-সাত বছর কেটেছিল। তখন সে চল্লিশের কোঠায়। কর্ণেল সারটেরিস ও তার বন্ধু বান্ধবের মেয়ে ও নাতনীদের সেখানে প্রত্যহ পাঠানো হতো, যে অনুভূতির প্রেরণায় তাদের দান পাত্রের জন্যে পঁচিশ সেণ্টের মুদ্রা হাতে রবিবার গীর্জায় পাঠানো হয়, । সেই একই কর্তব্যের খাতিরে। এর মধ্যেই এমিলির ট্যাক্স তুলে নেওয়া হয়েছিল।

তারপর এলো নতুন যুগ, সেই সঙ্গে নতুন মানুষ। তারাই হলো শহরের অন্ধের যষ্টি ও জীবন। যারা চীনেমাটির কাজ শিখেছিল, তা ক্রমে হলো মা। কিন্তু আর তাদের মেয়েদের রঙের বাক্স, তুলি ও মেয়েদের ম্যাগাজিন থেকে কাটা ছবি নিয়ে পাঠানো হলো না এমিলির কাছে। শেষ যাত্রী চলে যাওয়ার পর সামনের দরজাটা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল।

ক্রমে ক্রমে দিন কেটেছে, মাস এসেছে, বছর গেছে। নিগ্রো চাকরের বয়েস হয়েছে, চুল পেকেছে, কুঁজো হয়ে গেছে, বাজারের ঝুড়ি হাতে বাইরে যায় আর ভেতরে আসে। মাঝে মধ্যে নীচের তলার একটা জানালায় এমিলির মুখ দেখা যায়। ওপর তলাটা নিশ্চয়ই ও বন্ধ করে রেখেছে।

দেয়ালের খোপে রাখা পাথরের খোদাই করা যেন এক মূর্তি—তার দৃষ্টি কি আমাদের দিকে ? এভাবেই সে যুগ যুগ কাটিয়ে দেয়। আমাদের প্রিয় রমনী—যার অস্তিত্বকে না মেনে উপায় নেই, কোন কিছুতেই সে ভীত হয় না, যেন শান্ত নীরব মনোবিকারের প্রতিচ্ছবি।

তারপর একদিন সে মারা গেল। সে অসুস্থ হয়ে পড়লো, ঐ ধুলো ও ছায়া ঢাকা বাড়ীতে তার সঙ্গে দেখা করার মত একজন ছাড়া কেউ ছিল না—সে হলো ঐ নিগ্রো চাকর। আমরা জানতাম না, এমিলি অসুস্থ,

সে কারো সঙ্গে কথা বলে না, হয়তো এমিলির সঙ্গেও নয়। লোহা যেমন অনেকদিন ব্যবহার না করলে মরচে পড়ে যায় তেমনি তার কণ্ঠস্বর বহুদিন নীরব থাকায় জং পড়ে গিয়েছে।

নীচের তলার একটা ঘরে-পড়ে আছে এমিলির মৃতদেহ। ওয়াল-নাটের ভারী খাট, পর্দা ঘেরা, মাথা ভর্তি পাকা চুল, যে বালিশে মাথা দিয়ে এমিলি চিরজীবনের মত ঘুমুচ্ছে সেটা আলো ও সময়ের অভাবে হলুদ রঙে পরিণত হয়েছে।

পাঁচ

নিগ্রো চাকরটা দরজা খুলে দিতে মহিলারা ভেতরে প্রবেশ করলেন। তাদের গলায় চাপা কণ্ঠস্বর, ওদের দ্রুত ও উৎসুক দৃষ্টি চারদিকে পাক খাচ্ছিল। নিগ্রো চাকরটা বাড়ীর ভেতরে ঢুকলো তারপর পেছনের দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে গেল। এরপর ঐ শহরে কেউ ওর দেখা পায় নি।

এমিলির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অ্যালবামা থেকে ওর দুই মামাতো বোন এসেছিল। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থা হলো। বাজর থেকে কিনে আনা হলো ফুল, এমিলির শরীরের ওপর অজস্র ফুলের সমারোহ, এমিলির বাবার ক্রেয়ন পেন্সিলে আঁকা মুখ গম্ভীর ও চিন্তান্বিত, মহিলাদের কণ্ঠস্বর অদ্ভুত ভীষণ। জনাকয়েক বুড়ো মানুষ এসেছে। তাদের পরনে কন্‌ফেডারেট সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম। ওরা লন ও বারান্দায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে মিস এমিলির গল্প করছিল, মনে হয় ওরা যেন মিস এমিলির সমবয়সী। হয়তো ওরা সত্যিই বিশ্বাস করে যৌবনে ওরা এমিলির হাত ধরে পার্টিতে নেচেছে, প্রেম করেছে।

সময় অঙ্কের নিয়ম মেনে চলেনা ওদের স্মৃতিতে, ওদের স্নায়ুতে অতীত কোন ক্ষীয়ান পথ নয়, ওদের স্নায়ু ও স্মৃতি হলো ঘাসে ঢাকা এক বিশাল প্রান্তর, যাকে শীতের হিমতুষার সম্পূর্ণ স্পর্শ করতে পারে না। একেবারে সাম্প্রতিক একটা যুগ বোতলের সরু মুখের মত ওদেরও অতীতের মাঝ-খানে ব্যবধান রচনা করে।

ওপরের তলার ঘরটায় গত চল্লিশ বছর ধরে কেউ কোনদিন প্রবেশ করে নি। আমরা জানতাম, দরকার হলে দরজা ভেঙ্গে ওখানে ঢুকতে

হবে। এমিলির মৃতদেহ যতোক্ষণ না যথাযথ সম্ভ্রমে কবরস্থ হলো, ততক্ষণে আমরা অপেক্ষা করছিলাম।

দরজা ভাঙার প্রচণ্ড আলোড়নে ঘরটা ধূলোয় ভরে গেল, একটা ক্ষীণ তীক্ষ্ণ গন্ধ স্নায়ুতে ভেসে এলো, যেন আমরা কোন কবরের ভেতরে ঢুকেছি।

এই ঘর নববধূর বাসর সজ্জার জন্যে সাজানো। পর্দায় ঝরা গোলাপের বিবর্ণ রং, আলোয় গোলাপী শেড।

সব কিছু থেকে কবরের কটু গন্ধ ভেসে আসছে। ড্রেসিং টেবিলে রাখা সফটিকের পানপাত্র থেকে, জং ধরা রূপোর তৈরী পুরুষের টয়লেট সেট থেকে রূপোর এতো কালো দাগ, মনোগ্রামে নামের আদ্যক্ষর দুটো নজরেই পড়ে না।

জিনিযপত্রের ভীড়ে একটা কলার এবং টাই—যেন কেউ এখুনি ও দুটো খুলেছে, তুলতে যেতেই ধূলোর ওপরে আধো চাঁদের আকারের দাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সযত্নে চেয়ারের পেছনে ভাঁজ করা স্যুট, নীচে একজোড়া জুতো মোজা—নীরব এবং পরিত্যক্ত।

বিছানার ওপরে পুরুষ শুয়েছিল।

দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখছি, শুধু দেখছি মাংসহীন মুখের অদ্ভুত গম্ভীর হাসি। ওর শোয়ার ভঙ্গী দেখে, মনে হয়, একদিন কাউকে ও ওর বাহুডোরে বেঁধেছিল। কিন্তু এখন ওর দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন ঘুম প্রেমকে পার হয়ে যায়, মিলন মুহূর্ত্তটিও নিঃশেষে মুছে যায়। সেই ঘুমের আড়ালে প্রেমিক তার দয়িতার কাছে প্রতারিত হয়েছে।

নাইট শার্ট তার যেটুকু অবশিষ্ট শরীরকে ঢেকে রেখেছে, তার আড়ালে রয়েছে গলাপচা শবদেহ, তাকে আর বিছানা থেকে আলাদা করা যাবে না। তার মৃতদেহের ওপরে এবং যে বালিশে সে মাথা রেখেছে সেটাতেও রাশিকৃত ধূলো জমেছে—যা কখনও অধৈর্য হয় না এবং চির জীবন জেগে থাকে।

ঐ বিছানার শবদেহের বালিশের পাশে আর একটা বালিশ আমরা লক্ষ্য করলাম, মানুষের মাথার ছাপ, যেন কেউ মৃতদেহের পাশে ঐ

বালিশে মাথা রেখে শুয়েছিল। বালিশ থেকে একজন কি একটা তুললো।

সূক্ষ্ম, প্রায় চোখে দেখা যায় না, এমন একপাশ ধুলো আমাদের বুকে জমাট বাঁধলো, লক্ষ্য করলাম মেয়েলি মাথার একগাছি লম্বা ধূসর লোহা-চুর্ণের রঙের মত পাকা চুল।

উইলিয়াম ফকনারঃ জন্ম ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ খৃঃ নিউ অ্যালবেনি ; ইউ, এস, এ। কৃষ্ণকায়, কৃষ্ণকুন্তল কৃশ চেহারার শেতাঙ্গ মানুষটি জীবনে কখনও কোন নিয়ম ও শৃঙ্খলায় বাঁধা পড়েন নি। ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন তিনি কোন নিয়মের দ্বারা শাসিত হন নি, সাহিত্য জীবনেও তেমনি কোন বিশেষ নিয়ম বা আঙ্গিক ধরে এগোননি। অসাধারণ প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হলেও তাঁর তীব্র, তীক্ষ্ণ, স্পর্শাতুর অনুভূতি প্রবণ লেখাগুলি অনেক সময় সাধারণ পাঠক পাঠিকার বুদ্ধি ও বোধের অতীত। হিংসা, দ্বেষ ও অবক্ষয়ের ভাষ্যকার হিসাবে উইলিয়ম ফকনার আমাদের কালের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। ফকনারকে এক কথায় ক্ষুদে বালজ্যাক বলা যায়। ফকনারের গদ্যশৈলী যত জটিল তাঁর কবিতা তত সরল। His Prose is Compl - cated Lut poetry is flat.

অনেকের মতে ফকনারের ঔপন্যাসিক স্বত্ত্বা আর গল্পকার স্বত্ত্বার মধ্যেও অনেক ফারাক। গল্পকার হিসাবে ফকনার যেন প্রতিভাদীপ্ত এক রুদ্ধশ্বাস চমকপ্রদ গল্পের অফুরণ ভাণ্ডারী। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রখ্যাত এই আমেরিকান ঔপন্যাসিককে যখন সাহিত্য স্বীকৃতির শ্রেষ্ঠ শিরোপায় ভূষিত করা হয় তখন তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—মানুষ শুধু সহ্য করবে না, সে জয় করবে। জীবনের প্রতিটি সাহিত্যকর্মে তিনি এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—দি সাউণ্ড এণ্ড দি ফিউরিও অথবা শ্রেষ্ঠ গল্প দি বেয়ার এ-এর প্রতিফলন দেখা যায়।

'অপার্থিব' গল্পে ফকনার দুর্গের মত দুর্গম এক প্রাচীন প্রাসাদে মৃত প্রেমিকের কঙ্কাল আলিঙ্গন করে শুয়ে থাকা বিগত যৌবনা রমনীর কাহিনী বিবৃত করেছেন।

রঙিন কাঁচের জানলা

THE MAN IN UPSTAIRS

রে ব্রাডবুরি

মুরগীর নাড়ীভুঁড়ি কিভাবে পাকা হাতে কেটে কুটে বাদ দেয় ঠাকুমা, কিভাবে ভেতরকার বিস্ময় টেনে বার করে চোখের সামনে—ডগলাস তা জীবনে ভুলবে না। ভিজেভিজে চকচকে মাংস গন্ধগুলো জটপাকানো অস্ত্র, একদলা পেশীময় হৃদ্‌পিণ্ড, বীজভর্তি পাকস্থলী। নিপুণ হাতে মুরগী চিরে একটার পর একটা দেহযন্ত্র টেনে বার করে আনে ঠাকুমা স্থূল হাত ভেতরে ঢুকিয়ে। তারপর এদের ভাগ করা হবে। একটা ভাগ যাবে জলভর্তি গামলায়, আরেকটা ভাগ কাগজে মুড়ে রেখে দেওয়া হবে পরে কুকুরকে খেতে দেওয়ার জন্যে। তারপর শুরু হবে ট্যাক্সিডার্মি—অর্থাৎ মরা পশুপাখীর ভেতরে খড়কুটো ঠেসে দেওয়ার মত কাজ, জলে ভেজা মশলা মাখানো রুটি ভেতরে ঠেসে দিয়ে দ্রুত হাতে ছুঁচ দিয়ে একটার পর একটা টাইট টান মেরে বেমালুম জুড়ে দেওয়া হবে চেরা জায়গাটা

ডগলাসের এগারো বছরের জীবনে সবচেয়ে বড় রোমাঞ্চ এইটা।

ঠাকুমা যেন একটা সাদাচুলো হাসিমুখী মিষ্টি স্বভাবের ডাইনি—ম্যাজিক দেখাতে ওস্তাদ। ম্যাজিকের সাজসরঞ্জাম থাকে রান্নাঘরের ম্যাজিক টেবিলে। ডগলাস গুণে দেখেছিল সাজ সরঞ্জামগুলো। সবশুদ্ধ কুড়িটা ছুরি। এ-ড্রয়ারে সে ড্রয়ারে রেখে দেয় ঠাকুমা। ড্রয়ারগুলো টানলে আবার আওয়াজ হয় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে।

ডগলাসকে কিন্তু মুখে চাবি এঁটে থাকতে হয়। ঠাকুমার সঙ্গে এক টেবিলে দাঁড়াতে আপত্তি নেই। নাক উল্টে ঠাকুমার কীর্তিকাহিনী দেখতেও আপত্তি নেই। কিন্তু ছেলেমানুষের মত কথা বলে ফেললেই কেটে যাবে ম্যাজিকের মোহ। মুরগীর লাশের ওপর রুপোর ছুরি কাঁটা চালানোর সেই দৃশ্য সত্যিই দেখবার মত—মনে মনে নিশ্চয় মন্ত্রও আওড়ায় ঠাকুমা

—দন্তহীন মুখ কিন্তু নড়ে না। হয়তো ম্যমী করার ধুলোও ছিটিয়ে দেয়, হাড়ের গুঁড়োও মিশিয়ে দেয়—নইলে কি ডাইনিগিরি মানায় ?

একদিন আর থাকতে না পেরে ফস করে ফেলেছিল ডগলাস—'ঠাম্মা, আমার ভেতরটাও ঐ-রকম ?' বলে আঙুল তুলে দেখিয়ে ছিল মুরগীর ভেতর দিকটা।

'প্রায় তাই। তবে অনেক বেশী সাজানো গুছোনো।'

'নাড়িভুঁড়ি ? অনেক বেশী তো ?'

'হ্যাঁ।'

'দাদুর তাহলে আমার চেয়েও বেশী আছে ? ভুঁড়ি তো ঠেলে বেরিয়ে থাকে সামনে।'

হেসে ফেলে ঠাকুমা।

ডগলাস সাহস পেয়ে বলে—'রাস্তার মোড়ে ঐ যে মেয়েটা থাকে, ওরও কি—' 'চোপরাও !'

'কিন্তু ওর যে—'

'ওর যাই থাক না কেন, তোকে ভাবতে হবে না। মেয়েরা আলাদা হয়।'

'কেন আলাদা হয় ?'

'তোর মুখটা এবার সেলাই করে দোবো !'

একটু থেমে ফের বলে ডগলাস—'কি করে জানলে আমার ভেতরেও সব আছে ?'

'তুই যাবি ?' ঘণ্টা বাজল সামনের দরজায়।

দৌড়োলো ডগলাস। সামনের দরজার কাঁচের ওদিকে দেখল একটা স্ট্র-হ্যাট। আবার বেজে উঠল ঘণ্টা। আবার। আবার।

'গুড মর্নিং, খোকা। বাড়িউলি আছেন ?'

কাঠ-রঙের লম্বাটে মুখের ওপর একজোড়া ধূসর, শীতল চোখ অনিমেষে চেয়ে রইল ডাগলাসের মুখের দিকে। লোকটা লম্বা, রোগা, হাতে একটা স্যুটকেশ, একটা ব্রীফকেশ, একটা ছাতা, আঙুল-ঢাকা মোটা পুরু দামী দস্তানা, মাথায় বিদিগিচ্ছিরি নতুন একটা স্ট্র-হ্যাট।

এক-পা পেছিয়ে এল ডগলাস। বললে—'ব্যস্ত আছে।'

'বিজ্ঞাপন দিয়েছেন ওপরতলার ঘরটা ভাড়া দেবেন। আমি ভাড়া নিতে এসেছি।'

'দশজন বোর্ডার আছে এ-বাড়ীতে। ঘরটাও ভাড়া হয়ে গেছে। আপনি যান।'

'ডগলাস!' আচমকা পেছন থেকে দাবড়ানি দিল ঠাকুমা। বললে আগন্তুককে—'আসুন, বাচ্চা ছেলে—ওর কথায় কান দেবেন না!'

একটুও না হেসে আড়ষ্টভাবে পা ফেলে ভেতরে এল আগন্তুক। সিঁড়ি বেয়ে তাকে ওপরে উঠে যেতে দেখল ডগলাস, শুনল ঠাকুমা বলছেন ওপর তলার ঘরখানার বৃত্তান্ত। তারপরেই দুদ্দার করে নেমে এল নিচে। চাদর-টাদর রাখবার আলমারী খুলে ডগলাসের হাতে বোঝা চাপিয়ে পাঠিয়ে দিল ওপরে।

দরজার চৌকাঠে থমকে দাঁড়াল ডগলাস। ঘরটা যেন অদ্ভুতভাবে পালটে গিয়েছে—গিয়েছে শুধু আগন্তুকের আবির্ভাবে। লোকটা ঘরের মধ্যে রয়েছে বলেই যেন ঘরখানাকে অদ্ভুত রকম লাগছে। বিছানার ওপর রেখে দেওয়া স্ট্র-হ্যাটকে পলকা আর ভয়ংকর লাগছে। কোণে দাঁড় করানো ছাতাটাকে মনে হচ্ছে যেন ডানা মুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কালো মরা বাদুড়।

চোখ পিট পিট করে ছাতাটার দিকে চেয়ে রইল ডগলাস।

পালটে যাওয়া ঘরের ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে রইল আগন্তুক। বড় বেশী করে তাই চোখে পড়ল তালঢ্যাঙা বপুটা।

চাদর-ফাদরগুলো বিছানায় গাদা করে রাখল ডগলাস। বললে—'এই রইল। ঠিক দুপুরে খেতে বসি আমরা—একটুও নড়চড় হয় না। দেরী করে এলে কিন্তু ঠাণ্ডা ঝোল খেতে হবে।'

দশ-দশটা নতুন তামার পেনি মুদ্রা গুণে বার করল অদ্ভুত লম্বা লোকটা। টং টং করে বাজিয়ে নিলে। ঢেলে দিল ডগলাসের জামার পকেটে। মুখ গম্ভীর করে বললে—'বন্ধু হয়ে গেলাম দুজনে—আজ থেকে। কেমন?'

বেশ মজা তো! পেনি ছাড়া আর টাকাকড়ি নেই লোকটার পকেটে। তামার পেনিতে ঠাসা রয়েছে পকেট। রুপোর মুদ্রার বালাই নেই—একদম না। শুধু তামার পেনি—ঝকঝকে, নতুন।

বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল ডগলাস। বললে—'টাকা জামানোর একটা বাক্স আছে আমার। পেনিগুলো তাতেই ফেলব। রুপোর চাকতি করে নেব অনেকগুলো জমলে। সবশুদ্ধ ছটা ডলার আর সত্তরটা সেণ্ট আছে আমার। সামনের আগাস্টে বেড়াতে যাবো এই টাকায়।'

অদ্ভুত লম্বা লোকটা শুধু বললে—'এবার মুখ হাত ধোব।'

অনেক দিন আগে মাঝরাতে একবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ডগলাসের—ঝড়ের আওয়াজে। কনকনে ঠাণ্ডা জোরালো হাওয়ার ঝাপটায় থর থর করে কেঁপে উঠেছিল বাড়ী। জানালায় আছড়ে পড়েছিল বৃষ্টি। তারপরেই বিদ্যুৎ চমকে উঠল। একবারই। জানলার বাইরেটা সাদা হয়ে গেল সেই আলোয়। সারা বাড়ীটা যেন কেঁপে উঠেছিল—কিন্তু কোনো শব্দ শোনা যায়নি—কানের পর্দা চৌচির হয়ে যায়নি। খুব ভয় পেয়েছিল ডগলাস। নিজের ঘরের মধ্যেও কোথায় কি আছে, চোখ খুলে দেখবার সাহস হয় নি। পলকের জন্যে অদ্ভুত এবং ভয়ংকর সেই আলোকবন্যায় উদ্ভাসিত ঘরটাকে মনে হয়েছিল যেন অন্যরকম।

আজও হল ঠিক সেই রকম। এই ঘরের মধ্যে। আগন্তুকের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডগলাস। নামহীন ভয়ে গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। ঘরখানা সত্যিই যেন পালটে গিয়েছে, আগের মত আর নেই। অনেক আগে বিদ্যুতের আলোয় ঘরের চেহারা যেমন হঠাৎ পালটে গিয়েছিল—চকিতে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল—আজও অদ্ভুত এই লোকটার আবির্ভাবে যেন বিদ্যুৎচমক ঘটেছে—বিচ্ছুরিত অলোক সম্পাতে ঘরের চেহারা পালটে দিয়েছে—চেনা ঘরখানাকে এখন অচেনা লাগছে। পায়ে পায়ে পেছিয়ে এল ডগলাস। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল আগন্তুক।

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা দুটো মুখের ওপর।

আলু সেদ্ধ উঠে এল কাঠের কাঁটা চামচ গাঁথা হয়ে—কাঁটা চামচ নেমে এল শূন্য অবস্থায়। অদ্ভুত আগন্তুক কাঠের কাঁটা চামচ আর কাঠের

ছুরি নিয়ে নেমে এসেছে দোতলার ঘর থেকে, দুপুরের খানা তৈরী হতেই। লোকটার নাম মিঃ কোবারম্যান।

খানা তৈরী, এবার খেতে আসা হোক—এ খবর পাঠিয়েছিল ঠাকুমা। কোবারম্যান তাই ঠাকুমাকেই বলেছিল—'মিসেস স্পলডিং, ছুরি চামচ নিজেই আনব। লাঞ্চ আজ খাব বটে, কিন্তু কাল থেকে খাব কেবল ব্রেকফাস্ট আর রাতের খাবার।'

ঠাকুমা নতুন বোর্ডারকে খুশী করার জন্যে গরম খানা নিয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলে, ডগলাস কিন্তু রুপোর ছুরি কাঁটা চামচ নিয়ে ঠুনঠুন শব্দে নাড়াচাড়া করতে লাগল নিজের প্লেটে—উদ্দেশ্য কোবারম্যানকে উত্যক্ত করা। এতে যে অদ্ভুত আগন্তুকের মেজাজ খিঁচড়ে যায় ও তা লক্ষ্য করেছে।

বললে—'আমি একটা কায়দা জানি। এই দেখুন।'

বলে, একটা লম্বা কাঁটা চামচ তুলে নিয়ে নখ নিয়ে টান মারল কাঁটায়। তারের বাজনার মত কাঁপতে লাগল কাঁটা। ম্যাজিশিয়ানের মত কম্পমান কাঁটা টেবিলের যেদিকে ফেরাল টিনটিনে ভুতুড়ে আওয়াজ বেরিয়ে এল সেইখান থেকে। হ্যাণ্ডেলের ওপর বসিয়ে দিল টেবিলের ওপর—কাঠের টেবিল থেকে ধাতব ভুতুড়ে আওয়াজ শোনা গেল। সত্যিই যেন ম্যাজিক। হাসিমুখে আবার কাঁটা টেনে ধরে এবার টিপ করে ধরল কোবারম্যানের ঝোলের বাটির দিকে। আওয়াজ শোনা গেল বাটির ভেতরে।

শক্ত হয়ে গেল কোবারম্যানের কাঠ রঙের মুখ। দেখলে ভয় লাগে—এমনি কঠোর হয়ে উঠল মুখচ্ছবি। এক ঝটকায় ঠেলে সরিয়ে দিলে ঝোলের বাটি। বেঁকে গেল ঠোঁট। হেলে বসল চেয়ারে।

ঠিক এই সময়ে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল ঠাকুমা—'কি হল মিঃ কোবারম্যান?'

'এ-ঝোল খাওয়া যাবে না।'

'কেন?'

'পেট ভরে গেছে—আর পারছি না। ধন্যবাদ।'

কটমট করে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল কোবারম্যান।

ঝাঁঝালো গলায় ডগলাসকে এক হাত নিলেন ঠাকুমা—'কি করেছিলি?'

'কিছু না। লোকটা কাঠের কাঁটা চামচেতে খায় কেন?'

'সেটা তোর দেখার দরকার নেই! স্কুল কবে খুলছে? কবে যাবি?'

'সাত সপ্তাহ পরে।'

'জ্বালিয়ে মারলে!'

মিঃ কোবারম্যান কাজ করতো রাত্রে। সকালে ঠিক আটটার সময়ে রহস্যজনক ভাবে ফিরে আসতো বাড়ীতে, সামান্য একটা ব্রেকফাস্ট গলা দিয়ে নামিয়েই মোষের মত ঘুমোতে সমস্ত দিন—রাত্রে অন্যান্য বোর্ডারদের সঙ্গে খেতো পেট ঠেসে।

মিঃ কোবারম্যানের এ-হেন ঘুমোনোর রুটিনে মহা অসুবিধে হল ডগলাস বেচারীর। সমস্ত দিনটা চুপচাপ থাকতে হয়—যার মত ঝকমারি আর কিছু নেই। অসহ্য! অসহ্য! তাই, যেদিন ঠাকুমা কারও সঙ্গে গল্প করতে বেরোতো, অমনি ড্রাম বাজাতে বাজাতে সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করত ডগলাস, দুম দাম করে বল আছড়াতো মাটিতে অথবা মিঃ কোবার-ম্যানের দরজার সামনে নাহক মিনিট তিনেক ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে যেত অথবা পর পর সাতবার সিসটার্ন টেনে হু-উ-স হু-উ-স করে জল ঢালত পাইখানার প্যানে।

মিঃ কোবারম্যান কিন্তু পাশ ফিরেও শুয়েছে বলে মনে হত না। ঘর নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার। নালিশও করেননি কখনো। শব্দটব্দও করতেন না। ঘুমিয়েই যেতেন। একি ঘুম রে বাবা! ভারি অদ্ভুত তো!

কোবারম্যানকে মনে প্রাণে ঘেন্না করতে আরম্ভ করল ডগলাস। ঘেন্নার আগুনে ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল। মিস্ স্যাডলা যখন ছিল ও ঘরে, সৌন্দর্য ছিল সেখানে। ফুলের মত ঔজ্জ্বল্য ছিল। এখন ও-ঘর কোবারম্যানের সম্পত্তি। ঘরের যেখানে যা থাকবার সবই আছে, অগোছালো কিছুই নয়। অথচ যেন ন্যাড়া। শীতল, অচেনা, অজানা এবং ঠুনকো।

কোবারম্যান ঘর দখল করার চারদিন পরে সকাল বেলা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল ডগলাস।

দোতলায় ওঠার মাঝামাঝি জায়গায় একটা রোদ্দুর ঝকঝকে জানলা আছে। কমলা, বেগুনি, নীল, লাল, বাদামী রঙের ছ-ইঞ্চি কাঁচ বসানো ফ্রেমের মধ্যে। সকালের রোদ জানলা দিয়ে ঢুকত, হরেক রঙে রঙিন হয়ে পড়ত চাতালে, সেখান থেকে সিঁড়ি আর রেলিং বেয়ে নিচে। মন্ত্র মুগ্ধের মত জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রঙ বেরঙের দুনিয়া দেখত ডগলাস। সেদিনও জানলায় গিয়ে দাঁড়াল রঙিন পৃথিবী দেখবে বলে।

নীল কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখল নীল পৃথিবী, নীল আকাশ নীল লোকজন, নীল গাড়ী ঘোড়া আর নীল লেড়িকুত্তা।

এবার চোখ রাখল বাদামী কাঁচে। দুনিয়াটা বাদামী হয়ে গেল চোখের নিমেষে। ফু-মাঞ্চুর দুহিতার মত দুটি কমলা রঙের মেয়ে সড় সড় করে চলে গেল রাস্তা বেয়ে! খি-খি করে হেসে উঠল ডগলাস। রোদ্দুরটাকে পর্যন্ত আরো খাঁটি সোনালি মনে হচ্ছে কাঁচের মধ্যে দিয়ে।

আটটার সময়ে নৈশ ডিউটি শেষ করে ফিরতে দেখা গেল মিঃ কোবার-ম্যানকে। ছাতাটা ঝুলছে কনুই থেকে, তেল চকচকে মাথায় বসানো স্ট হ্যাট।

আবার অন্য কাঁচে চোখ রাখল ডগলাস। মিঃ কোবারম্যান এখন লাল দুনিয়ায় হাঁটছে, সে দুনিয়ার গাছপালা লাল, ফুল লাল—কিন্তু দেখা যাচ্ছে আরও একটা দৃশ্য।

দৃশ্যটা মিঃ কোবারম্যান সংক্রান্ত।

সিঁটিয়ে গেল ডগলাস।

লাল কাঁচ পালটে দিয়েছে কোবারম্যানকে। পালটে গেছে পোশাক, মুখ, হাত। পোশাক যেন আর নেই—বাতাসে মিলিয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্যে ডগলাসের মনে হল কোবারম্যানের ভেতর পর্যন্ত যেন সে দেখতে পাচ্ছে। সেকী ভয়ংকর মুহূর্ত! যা দেখল, তা এমনই ভয়ানক যে নাক চোখ মুখ লাল কাঁচের ওপর চেপে ধরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তো রইলই।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওপর দিকে চোখ তুললে কোবারম্যান। ডগলাসকে দেখে রেগে আগুন হয়ে এমনভাবে ছাতা আছড়ালো বাতাসে যেন সামনে

পেলে পিটিয়েই শেষ করে দিত ডগলাসকে। দৌড়ে পেরিয়ে গেল লাল লন—পৌঁছে গেল সামনের দরজায়।

সিঁড়ি বেয়ে তীরবেগে উঠে আসতে আসতে বললে হেঁড়ে গলায়—'হ্যারে ছোঁড়া! করছিস কি ওখানে?'

'দেখছি,' মিন মিন করে বললে ডগলাস।

'ব্যস? আর কিছু না?' মিঃ কোবারম্যানের গলায় যেন বাজ ডেকে উঠল।

'আবার কি? রঙবেরঙের কাঁচের মধ্যে দিয়ে তাকাতে কত মজা জানেন? কখনো নীল, কখনো লাল, কখনো বাদামী! কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। কত রঙের কত পৃথিবী।'

'কত রঙের কত পৃথিবী!' দাঁত খিঁচিয়ে ভেংচে উঠে ফ্যাকাশে মুখে রঙিন কাঁচের জানলার দিকে চেয়ে রইল কোবারম্যান। কিন্তু চকিতে সামলে নিল নিজেকে। রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে জোর করে হাসবার চেষ্টাও করল। বললে—'তা বলেছিস মন্দ নয় কত রঙের কত পৃথিবী। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই।' বলতে বলতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে—'যা, যা, পালা, খেলা করগে যা।'

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। হলঘরে আর কেউ নেই। মিঃ কোবারম্যান এখন ঘরে।

অন্য এক কাঁচে চোখ রাখল ডগলাস।

বললে আপন মনে—'আরে সব্বোনাশ! এ-যে সমস্তই বেগনি!'

আধঘণ্টা পর। বাড়ীর পেছনে বালির গাদায় খেলা করছিল ডগলাস। দমাস শব্দের পর ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ার আওয়াজ ভেসে এল কানে। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল আওয়াজ শুনেই।

পর মুহূর্তেই পেছনের উঠোনে দৌড়ে এল ঠাকুমা। হাতে লিকলিকে বেত।

'ডগলাস, বলেছি না বাড়ীর দিকে বাস্কেটবল ছুঁড়বি না'?

'আমি তো এখানে বসে আছি।'

'পাজী ছেলে! এসে দেখে যা কি করেছিস!'

ওপরকার চাতালে খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে আছে বিশাল রঙিন জানলাটা পাশেই পড়ে তার বাস্কেটবল।

বলটা তার হলেও কুকমটি যে তার নয়, ডগলাস তা বলবারও অবসর পেল না। সপাং সপাং করে বেত পড়ল পিঠে, মাথায়, হাতে, পায়ে। এঁকে বেঁকে পাশ কাটিয়ে গড়িয়ে গিয়েও রেহাই পেল না বেচারী।

কিছুক্ষণ পর অস্ট্রিচ পাখীর মত বালির গাদায় মুখ লুকিয়ে বেতের জ্বালা ভোলবার চেষ্টা করল ডগলাস। কাঁদতে কাঁদতে প্রতিজ্ঞা করল মনে মনে, বাস্কেটবল যে ছুঁড়েছে তাকে একহাত সে নেবে। সে কে, ডগলাস তা জানে। মাথায় তার স্ট্র-হ্যাট, হাতে আড়ষ্ট ছাতা, ঘর খানা ঠাণ্ডা অন্ধকারে ঠাসা। দাঁড়াও না, তোমায় মজা দেখাচ্ছি!

ভাঙা কাঁচ ঝাঁট দিচ্ছে ঠাকুমা—ঝাঁটার আওয়াজেই বুঝল ডগলাস। দেখল, ডাস্টবিনে রঙিন কাঁচের টুকরোগুলো ফেলে দিয়ে গেল ঠাকুমা। ঠিক যেন একরাশ খসে পড়া তারার মত ঝরে পড়ল নীল, গোলাপী, হলদে কাঁচের টুকরো।

ঠাকুমা বাড়ী ফিরে যেতেই যন্ত্রণায় কোঁকাতে কোঁকাতে উঠে পড়ল ডগলাস। অবিশ্বাস্য কাঁচের তিনটে টুকরো তুলে নিলে ডাস্টবিন থেকে। রঙিন কাঁচের জানলা পছন্দ করে না মিঃ কোবারম্যান। তাই এই টুকরো গুলো রেখে দেওয়া দরকার।

টাকা বাজানোর মত আঙুলে কাঁচের টুকরোগুলো বাজিয়ে নিল ডগলাস।

অন্যান্য বোর্ডাররা বাড়ী ফেরার একটু আগেই বিকেল পাঁচটা নাগাদ রোজ খবরের কাগজের অফিস থেকে বাড়ী ফিরত ঠাকুদ্দা। হলঘর পেরিয়ে আসত মন্থর পদক্ষেপের ভারি আওয়াজ। পুরু মেহগনী ছড়িটা ঠকাস্ করে রাখা হত ছড়ির র‍্যাকে। সেদিন এইসব আওয়াজ শুনেই দৌড়ে এল ডগলাস। বিশাল ভুঁড়িটা জাপটে ধরে উঠে বসল ঠাকুদ্দার দুই হাঁটুর ওপর—সান্ধ্য দৈনিক নিয়ে তন্ময় হয়ে রইল ঠাকুদ্দা।

'এই দাদু।'

'কি দাদা।'

'আবার আজকে ঠাকুমা মুরগী কেটেছে। কি মজাই না লাগে দেখতে।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঠাকুদ্দা বললে—'হপ্তায় দুবার মুরগী কাটতেই হবে। তোর ঠাকুমাটা মুরগীরও অধম। মুরগী কাটা দেখতে মজা লাগে কিরে?'

'দেখতে ইচ্ছে করে যে!'

'সেদিনের সেই ব্যাপারটা মনে আছে? রেলে কাটা পড়েছিল একটা মেয়ে—তুই গিয়ে রক্ত-টক্ত সব হাঁ করে দেখছিলি। কাটা মেয়েটাকেও দেখেছিস। একটুও ভয় পাসনি। ভালই তো। ঠিক এই রকমটাই যেন থাকতে পারিস। ভয় পাবি না—জীবনে কোনো ব্যাপারে ভয়ে সিঁটিয়ে যাবি না। ঠিক তোর বাপের মত হয়েছিস মনে হচ্ছে। মিলিটারী তো—গত বছর ছুটি কাটিয়ে যাওয়ার সময়ে এখানে বাপের সঙ্গও পেয়েছিস।' আবার কাগজ পড়ায় মন দিল ঠাকুদ্দা।

অনেকক্ষণ পর—'এই দাদু।

'আবার কী।'

'কোনো মানুষের যদি হৃদ্‌পিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী না থাকা সত্বেও হেঁটে চলে বেড়ায় জ্যান্ত লোকের মত, তাহলে কি হয়?"

'তাহলে বলতে হবে সেটা একটা পরমাশ্চর্য ব্যাপার।'

'না-না। আমি তা জানতে চাইছি না। আমি বলছি, তার ভেতরটা একেবারে অন্যরকম হয়? এই আমার ভেতরের মতন যদি না হয়?'

'তাহলে তোকে তো আর মানুষ বলা যায় না।'

'দাদু, তোমার হৃদ্‌পিণ্ড আছে? ফুসফুস আছে?'

হাসলে দাদু—'কি করে বলব বল? কোনোদিন তো ডাক্তারের চৌকাঠ মাড়াইনি—এক্স-রে ফটোও তুলিনি। আলুর মত নিরেটও হতে পারি।

'তামার পাকস্থলী আছে?'

'নিশ্চয় আছে।' রান্নাঘর থেকে চিৎকার শোনা গেল ঠাকুমার।

'পাকস্থলীটাকে দুবেলা ভরাতে হয় আমাকে তো! ফুসফুসও আছে বইকি—চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করিস কি করে? একজোড়া নোংরা হাতও আছে—যা এখুনি হাত ধুয়ে আয়। খানা তৈরী!'

হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বোর্ডাররা। অদ্ভুত আলাপটা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও আর সুযোগ পেল না ঠাকুদ্দা। যা মেজাজ ঠাকুমার—খেতে দেরী হলেই আলুর মত চটকে ছাড়বে।

খেতে বসে হাসিঠাট্টা কথায় মশগুল হয়ে রইল বোর্ডাররা—কোবারম্যান বাদে। গুম হয়ে বসে নীরবে কাঠের কাঁটা চামচ চালিয়ে গেল ভদ্রলোক। কেশে গলা সাফ করে নিয়ে ঠাকুদ্দা রাজনীতি নিয়ে কথা বলল কিছুক্ষণ। তারপর সুরু করল শহরের সাম্প্রতিক অদ্ভুত মৃত্যুর বিবরণ। বিষয়টা চাঞ্চল্যকর।

বললে—'যে কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদকের টনক নড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট ঘটনাগুলো। মিস্ লারসনের ব্যাপারটাই দেখুন না কেন। তরুণী। সুন্দরী। তিনদিন আগে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল। মৃত্যুর কারণটা জানা গেল না। শুধু দেখা গেল সারা গায়ে অদ্ভুত উল্কি কাটার মত অজস্র ফুটকি। মুখের চেহারা ভয়াবহ—দেখলে গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়—কোথায় লাগে দান্তের নরক বর্ণনা। তারপর গেল আর একজন তরুণী। কি যেন নামটা? হুইটলী? সে তো বেমালুম অদৃশ্যই হয়ে গেল। একদম নিপাত্তা।'

মোটর গাড়ীর মিস্ত্রী ব্রিজ বললে—'ও রকম তো হামেশাই ঘটছে। পুলিশের মিসিং পিপল্স্ ব্যুরো-তে ফাইল ক্রমশঃ ফুলছে।'

ঠাকুমা মাঝখান থেকে উদার হস্তে মুরগীর মাংস নিয়ে এগিয়ে এল—'আর কারও কিছু চাই? আপনার? আপনার?' স্থির চোখে দেখছিল ডগলাস। মুরগীর নাড়িভুঁড়ি দুরকমের হয় তাহলে। কাটবার সময়ে বেরিয়েছে একরকম—ঠাকুমা পুর ঠেসে নাড়ীভুঁড়ি বানিয়েছে আর একরকম।

তিন রকমের হয়না কেন?

নিশ্চয় হয়।

অব্যাহত রইল রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে কথাবার্তা। এই তো হপ্তা-খানেক আগে মারা গেছে ম্যারিয়ান নামে আর একটি মেয়ে। ডাক্তার বলছে, হার্টফেল করে মারা গেছে। কিন্তু কে জানে অন্যান্য রহস্যজনক মৃত্যুর সঙ্গে এটারও যোগসূত্র আছে কিনা। অবিশ্বাস্য? আরে মশাই, বিশ্বাস্য হোক আর না হোক, খাবার টেবিলে এসব নিয়ে আলোচনা না করলেই কি নয়?

মোটর মিস্ত্রী ব্রিজ বললে—'যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে। কে জানে শহরে ভ্যামপায়ারের উৎপাত আরম্ভ হয়েছে কি না।'

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল মিঃ কোবারম্যানের।

ঠাকুদ্দা বললে '১৯৭২ সালে ভ্যামপায়ার? কি যে বলেন।'

দমবার পাত্র নয় ব্রিজ। বললে সোৎসাহে—'উড়িয়ে দেবেন না অত চট করে। ভ্যামপায়াররা আছে বই কি! ধরুন আর মারুন রুপোর বুলেট দিয়ে। রুপোর তৈরী যে কোনো জিনিস হলেই হল। রুপো জিনিসটা একদম সইতে পারে না ভ্যামপায়াররা। বইতে পড়েছি।'

কোবারম্যানের দিকে চাইল ডগলাস। লোকটা কাঠের কাঁটা চামচ ছাড়া খায় না—পকেটেও রাখে কেবল তামার পয়সা।

ঠাকুদ্দা বললে—'এটা কিন্তু অন্যায়। ভূত প্রেত ভ্যামপায়ার কি জিনিস আজও যখন তা জানা যায়নি—রহস্যজনক কোনো ব্যাপার ঘটলেই কি তাদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে হবে? আমার আপনার মত মানুষেরাই এসব করে বেড়াচ্ছে—ভ্যামপায়ার নয়।'

উঠে দাঁড়াল কোবারম্যান—'মাপ করবেন,' বলে হনহন করে বেরিয়ে গেল নৈশ কাজ সারতে।

রাতের তারা উঠল, চাঁদ কিরণ বিতরণ করে গেল, ঘড়ি টিকটিকিয়ে গেল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিজেকে জাহির করে রাত ভোর করে দিলে। শুরু হ'ল আরও একটা দিন। নৈশ ডিউটি শেষ করে ফুটপাত বেয়ে ফিরে আসতে দেখা গেল মিঃ কোবারম্যানকে। সূক্ষ্ম চোখে সব কিছু লক্ষ্য

করে গেল ক্ষুদে ডগলাস – ক্ষুদে মেশিনের মতই।

দুপুর হল। বাজারে গেল ঠাকুমা কেনাকাটা করতে।

ঠাকুমা বেরোলেই রোজ মিনিট তিনেক কোবারম্যানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচায় ডগলাস। আজও চেঁচিয়ে গেল। সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না ঘরের ভেতর থেকে। ভয়াবহ এই নৈঃশব্দ বেশীক্ষণ সহ্য করা যায় না।

দৌড়ে নেমে এল ডগলাস। চাবির গোছা, রুপোর একটা কাঁটা চামচ, আর রঙিন কাঁচের ভাঙা টুকরো তিনটে নিয়ে উঠে এল ওপরতলায়। এই সেই কাঁচ যা সে উদ্ধার করেছে ডাস্টবিন থেকে।

চাবি লাগিয়ে খুলল দরজা। পাল্লা ফাঁক করল খুব আস্তে আস্তে।

আধা অন্ধকার বিরাজ করছে ঘরের মধ্যে। জানলার খড়খড়ি বন্ধ। বিছানায় শুয়ে মিঃ কোবারম্যান। পরনে রাত্রিবাস। শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে মৃদুছন্দে—তালে তালে ওঠানামা করছে বুক। একদম নড়ল না ডগলাস ঘরে ঢোকবার পর। নিস্পন্দ রইল মুখ।

'হ্যালো, মিঃ, কোবারম্যান!'

বিরক্ত দেয়াল থেকে ফিরে এল প্রতিধ্বনি – ছন্দ-পতনও ঘটল না নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের।

দুমদাম করে বল নাচাতে নাচাতে এগিয়ে গেল ডগলাস। গলার শির তুলে চেঁচাল কিছুক্ষণ। তা সত্ত্বেও নড়ল না, জবাবও দিল না কোবারম্যান।

রুপোর কাঁটা চামচটা কোবারম্যানের গালে চেপে ধরল ডগলাস।

চোখের পাতা কেঁপে উঠল কোবারম্যানের। ঈষৎ মোচড় মেরে গুঙিয়ে উঠল অস্পষ্ট স্বরে।

যাক, তাহলে সাড়া পাওয়া গেছে।

পকেট থেকে নীল কাঁচের টুকরোটা বার করল ডগলাস। নীল কাঁচের মধ্যে তাকিয়ে দেখল দুনিয়াটা নীল হয়ে গেছে। যে দুনিয়াকে সে চেনে জানে – এ-দুনিয়া নয়। ঠিক লাল দুনিয়ার মতই ভিন্ন প্রকৃতির। আসবাবপত্র নীল, শয্যা নীল, কড়িকাঠ নীল, দেওয়াল নীল, নীল তাকের ওপর রাখা খানা-খাওয়ার প্লেট গেলাস কাঁটাচামচগুলোও নীল। নীলবর্ণ

এই দুনিয়ার মাঝে নিস্পন্দ রয়েছে কোবারম্যানের নীল মুখ, উঠছে নামছে নীল বুক। আর···

প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে দু'টো পুরোপুরি খোলা চোখ। ক্ষুধার্ত তমিস্রা প্রকটিত সেখানে।

চকিতে পেছিয়ে এল ডগলাস। নীল কাঁচ নামালো চোখের সামনে থেকে।

বন্ধ হয়ে গেছে কোবারম্যানের দু-চোখের পাতা।

আবার নীল কাচ দিয়ে দেখল ডগলাস—চোখ আবার খুলে গেছে। নীল কাচ সরিয়ে নিতেই বন্ধ হয়ে গেল চোখ। আবার নীল কাঁচ—চোখ খোলা। নীল কাঁচ সরিয়ে নিতেই—চোখ বন্ধ। নীল কাঁচ—চোখ খোলা। নীল কাঁচ সরিয়ে—চোখ বন্ধ। নীল কাঁচ না থাকলেই যেন দু-চোখের পাতা চেপে বন্ধ—নীল কাঁচ লাগালেই দু-চোখের পাতা পুরো-পুরি খোলা।

মজা তো মন্দ নয়!

এবার তাহলে দেখা যাক কোবারম্যানের দেহের বাকী অংশগুলো। নীল কাচ চোখে লাগিয়ে তাকাল ডগলাস। কোবারম্যানের রাত্রিবাস যেন গলে মিলিয়ে গেল বাতাসে। নীল কাঁচের একি ম্যাজিক! জামা কাপড় পর্যন্ত ভ্যানিশ্ করে দেয়! শুধুই কি জামাকাপড়? আরও কিছু ভ্যানিশ্ করছে না তো? একী? একী! একী দেখছে ডগলাস!

কোবারম্যানের পেটের দেওয়াল ভেদ করে সব কিছুই যে দেখা যাচ্ছে। একেবারে ভেতর পর্যন্ত!

নিরেট মানুষ এই কোবারম্যান।

অথবা, তার কাছাকাছি।

অদ্ভুত আকার আর আয়তনের জিনিসপত্রে ঠাসা রয়েছে ভেতরটা।

মিনিট কয়েক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডগলাস। মনে পড়ল রঙিন কাচের জানলা দিয়ে রঙ বেরঙের দুনিয়াগুলো। কখনো নীল, কখনো কমল, কখনো হলুদ। একটার থেকে আর একটার কোনো মিল নেই—একেবারে আলাদা। ঠিকই বলেছিল তাহলে মিঃ কোবারম্যান!

রঙিন কাঁচের জানলাটাও ভাঙা হয়েছে তাহলে এই কারণেই।

'উঠুন মিঃ কোবারম্যান। উঠে পড়ন!'

জবাব নেই।

'মিঃ কোবারম্যান, সারারাত কোথায় কাজ করেন? কি কাজ করেন? ও মিঃ কোবারম্যান? বলুন? জবাব দিন?'

মৃদু হাওয়া কাপিয়ে দিয়ে গেল জানলার নীল খড়খড়ি।

'কোন্ দুনিয়ার মানুষ আপনি, মিঃ কোবারম্যান? লাল দুনিয়ার? সবুজ দুনিয়ার? না, হলদে দুনিয়ার?'

জবাব নেই। নীল নৈঃশব্দ টুঁটি টিপে স্তব্ধ করে দিল যেন প্রতিটি শব্দ।

'দাঁড়ান, দেখাচ্ছি মজা।'

নিচে নেমে এল ডগলাস। গেল রান্নাঘরে। বিরাট ড্রয়ারটা টেনে বার করে হাতে তুলে নিল সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ধারালো ছুরিটা।

খুব শান্ত ভাবে ফিরে এল হলঘরে, উঠল সিঁড়ি বেয়ে, ঢুকল মিঃ কোবারম্যানের ঘরে, বন্ধ করল দরজা—হাতের মুঠিতে রইল সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ধারালো ছুরিটা।

গামলায় ময়দা মাখছে ঠাকুমা, এমন সময়ে রান্নাঘরে টেবিলের ওপর কি যেন একটা জিনিস রাখল ডগলাস।

'এটা কি জিনিস, ঠাকুমা?'

চশমার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে ঠাকুমা বললে—'জানি না।'

জিনিসটা চৌকোনা, বাক্সের মত, নমনীয়। উজ্জ্বল কমলা রঙের। চারধারে চারটে নীল রঙের চৌকোনা নল লাগানো। গন্ধটা অদ্ভুত।

'ঠাকুমা, এ জিনিস কখনো দেখেছো?'

'না।'

'জানতাম তুমি দেখোনি।'

জিনিসটা টেবিলে রেখেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডগলাস।

পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এল আরেকটা জিনিস নিয়ে—'এটা ?'

উজ্জ্বল গোলাপী রঙের একটা শেকল। শেকলের এক প্রান্তে ঝুলছে একটা বেগনি রঙের ত্রিভুজ।

'বকাস্ নি। শেকল দেখতে পাচ্ছিস না ? বকে ওঠে ঠাকুমা।

এরপর যখন ফিরে এল ডগলাস, দুটো হাত ভর্তি নানান জিনিসে। একটা আংটির মত গোল জিনিস, একটা চতুর্ভুজ, একটা ত্রিভুজ, একটা পিরামিড, একটা আয়তক্ষেত্র—এছাড়াও রকমারি আকারের বহু বস্তু।

প্রতিটা বেশ নমনীয়, চকচকে যেন জিলেটিনের মত নরম উপাদান দিয়ে তৈরী। টেবিলের ওপর দু-হাত উজাড় করে দিয়ে বললে—'আরও আছে ঠাকুমা—যেখান থেকে আনলাম—এমনি আরও জিনিস রয়েছে সেখানে।'

খুব ব্যস্তভাবে অন্যমনস্ক স্বরে ঠাকুমা শুধু বললে—'আচ্ছা রে আচ্ছা।'

'তুমি কিন্তু ভুল বলেছো, ঠাকুমা।'

'কি ভুল বলেছি রে ?'

'সব মানুষের ভেতরটা একরকম।'

'বাজে বকবকানি থামা।'

'আমার পয়সা জমানোর কৌটোটা কোথায় ?'

'ফায়ার প্লেসের ওপর।'

'থ্যাংকস্।'

কৌটোটা হাত বাড়িয়ে নামিয়ে আনল ডগলাস।

ঠিক পাঁচটায় বাড়ী ফিরল ঠাকুদ্দা।

'দাদু ওপরে একটু আসবে ?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু কেন দাদা ?'

'একটা জিনিস দেখাবো। দেখলে খারাপ লাগবে—কিন্তু দেখবার মত জিনিস।'

খুক্ খুক্ করে হেসে নাতির পেছন পেছন মিঃ কোবারম্যানের ঘরের সামনে এল ঠাকুদ্দা।

'ঠাকুমাকে বলো না যেন। দেখলে ভিরমি যাবে,' বলে ঠেলা মেরে পাল্লা খুলে দিল ডগলাস—'ঐ ছাখো।'

এর পরের কয়েকটা ঘন্টা যা-যা ঘটেছিল, সারা জীবন তা মনে রেখেছিল ডগলাস। মিঃ কোবারম্যানের নগ্ন দেহের পাশে দাঁড়িয়ে অপঘাত মৃত্যুর তদন্তকারী বিচারক এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা। নিচের তলায় একনাগাড়ে একটা কথাই জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে ঠাকুমা—'কি কাণ্ড চলছে ওপরে?' ভাঙা ভাঙা গলায় ঠাকুদ্দা বলছে—'ডগলাসকে নিয়ে লম্বা ছুটিতে যেতে হবে দেখছি। নইলে বীভৎস এই ব্যাপার মন থেকে মুছবে না। কী ভয়ানক। কী ভয়ানক!'

'ভয়ানক কেন হবে?' বারবার বলছে ডগলাস—'ভয়ানক কিসের? আমি তো খারাপ কিছু দেখছি না।'

শিউরে উঠে বিচারক বলেছে—'কোবারম্যান যে বেঁচে নেই, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।'

ঘামতে ঘামতে তার চ্যালাচামুণ্ডারা বলেছে 'জলের গামলায় আর কাগজ মোড়া ঐ জিনিসগুলো দেখেছেন?'

'দেখেছি। দেখেছি! কী ভীষণ!'

'ও গড!'

মিঃ কোবারম্যানের দেহের ওপর আর একবার ঝুঁকে পড়ল বিচারক —'এ খবর যেন পাঁচকান না হয়। বেমালুম চেপে যাও। খুন তো নয়—ছেলেটা বরং ওকে বাঁচিয়েছে। যদি না করত, ঈশ্বর জানেন কি ঘটত।'

'কোবারম্যান তাহলে কী? ভ্যামপায়ার? না, রাক্ষস?'

'হলেও হতে পারে। আমার জানা নেই। আর যাই হোক—মানুষ অন্ততঃ নয়।' অপঘাত মৃত্যুর তদন্তকারী বিচারক ক্ষতস্থানের সেলাইয়ের জোড়ের ওপর হাত বুলিয়ে গেল নিপুণভাবে।

ডগলাসের তো বুক দশহাত নিজের কীর্তিতে। অনেক ঝক্কি তো গেল মাথার উপর দিয়ে। দিনের পর দিন নজর রাখতে হয়েছে ঠাকুমার

ওপর—মনে রাখতে হয়েছে সব কিছু। ঠিক যেভাবে ছুঁচসুতো দিয়ে পরিপাটি ভাবে মুরগীর চেরা পেট সেলাই করে দেয় ঠাকুমা, সেইভাবে কোবারম্যানকে সেলাই করেছে কোথাও এতটুকু ফাঁক না রেখে।

গামলার জলে ভাসমান পিরামিড, ত্রিভুজ, শেকল ইত্যাদি জিনিস-গুলোর দিকে চেয়ে আরেক দফা শিউরে উঠে বিচারক বললে—'ছেলেটাকে বলতে শুনলাম, ভেতর থেকে জিনিসগুলো বার করে নেওয়ার পরেও নাকি বেঁচে ছিল কোবারম্যান! কী ভয়ানক! কী ভয়ানক!'

'তাই নাকি?'

'বলল তো তাই।'

'কোবারম্যান তাহলে মরল কিসে?'

তদন্তকারী বিচারক টান মেরে খানিকটা সেলাই খুলে ফেলে দেখাল বুকের ভেতরটা—'এই জন্যে।'

বুকের ভিতর ঠাসা রয়েছে ছটা রুপোর ডলার আর সত্তরটা রুপোর সেন্ট মুদ্রা। রোদ্দুর ঠিকরে গেল ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত সেই গুপ্তধন থেকে।

ক্রুত হাতে ফের ফোঁড় দিতে দিতে বলল বিচারক—'ডগলাস টাকা-গুলো জমা রেখেছে ভাল জায়গাতেই—সুদটা কী কল্পনা করতে পারেন?'

* * *

রে ব্রাডবুরী ঃ রহস্য গল্প ও অলৌকিক গল্পের জাল বুনে বুনে পাঠক পাঠিকাকে যে সমস্ত বিদেশী লেখক সম্মোহনের শীর্ষে আরোহণ করান রে ব্রাডবুরী তাঁদের অন্যতম। তাঁর লেখায় আমাদের আশাহত ব্যথা বেদনা মণ্ডিত প্রাত্যহিক জীবনের নানা ঘটনার পারম্পার্যের সাথে এক লৌকিক ও অলৌকিক অনুভূতির আস্তারণ যেন অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত হয়ে আছে।

লেখক তাঁর বিষয় বস্তুকে ক্রমে ক্রমে বিস্তার করে বিস্ময় বিমূঢ় এক বিভৎসতার প্রতীক হিসাবে এগিয়ে নিয়ে চলেন। ফলে তার লেখায় রহস্য গল্পের স্বাদ ছাড়াও যা সমগ্র গল্পকে ব্যাপ্ত করে আমাদের আপ্লুত করে তা এক মহান অনুভূতি।

প্রুফ

PROOF

হেনরী সিসিল

'...যদি না আপনি সেই দুজনের কারো প্রেতাত্মা হয়ে থাকেন—

ঠিক ধরেছেন—ছোট্ট মানুষটি বলল এবং সকলের চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।'

সারাটা সন্ধ্যে লণ্ডনের সেই আত্মম্ভরী ছোটোখাটো চেহারার উকিল ভদ্রলোক সমানে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন এবং তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করে আমি প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছি। উকিলদের আমি এমনিতেই পছন্দ করি না, তার ওপর এই ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্তিকর এক উদাহরণ। তাকে আরও বেশি অপছন্দ হওয়ার কারণ উপস্থিত আর সকলেই গভীর মনোযোগে তার কথা শুনছে এবং বলতে গেলে কথাবার্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একমাত্র তার ওপরেই তুলে দিয়েছে।

লেকল্যাণ্ড হোটেলের পানশালায় আমরা বসে আছি। হোটেলটা খুব বড় না হলেও আমার অতি প্রয়োজনীয় ছুটির দিনগুলো কাটাতে এই হোটেলটাই বেছে নিয়েছি। অন্তত কয়েকটা দিন সারা দেশ ঘুরে এই নতুন প্রাকৃতিক গবেষণা সমিতি প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বিক্রীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সুতরাং আন্তরিক প্রার্থনা করছিলাম যে কোন আকস্মিক ঘটনা এই ব্যস্ত ক্ষুদে উকিল ভদ্রলোকের সামনে উপস্থিত হয়ে তার অহঙ্কারকে খর্ব করুক, কিন্তু কার্যত কিছুই হল না। তার কথার স্রোত অব্যাহত ভাবে এগিয়ে চলল।

এমন সময় দুজন আগন্তুক হঠাৎই ভেতরে এসে ঢুকল এবং সকলের মনোযোগ আকর্ষিত হল সেই দিকে। এই প্রথম ভীষণ স্বস্তি পেলাম।

লোক দুটিকে দেখতে খুবই সাধারণ, কিন্তু ভেতরে ঢোকার সময় ওরা বেশ শব্দ করে ঢুকেছে এবং ওদের মুখ আমাদের কাছে অপরিচিত হওয়ায় ওদের প্রবেশ আমাদের আলোচনাকে সেই মুহূর্তেই স্তব্ধ করেছে। ওরা সোজা এগিয়ে গেল পানশালার দীর্ঘ টেবিলের কাছে, তারপর এক-এক বোতল বিয়ার নিয়ে নিঃশব্দে পান করতে লাগল; প্রথম বোতল শেষ হলে দ্বিতীয় বোতল এলো। দ্বিতীয় বোতল শূন্য হওয়ার পর ওরা যেন একটু সহজ হল। অবশেষে ওদের একজন আমাদের দিকে ফিরে বলল, আমরা গ্রিমস্টোন ক্র্যাগের চূড়ো পর্যন্ত এত কষ্ট করে উঠলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। পুরো সময়টা ফালতু বরবাদ হ'ল।

ওরা সাধারণ পর্বতারোহী হতে পারে না, কারণ সে রকম কোন আরোহী কোন আরোহণকেই সময় নষ্ট বলে মনে করে না, তা সে বিশেষ কোন দৃশ্য দেখতে পাক আর না-ই পাক। অতএব ব্যাপারটাকে আমাদের কেউই তেমন আমল দিল না। ভয় পেলাম যে ক্ষুদে উকিল ভদ্রলোক হয়তো আবার তার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করবেন। যাই হোক, দ্বিতীয় আগন্তুক এবার বলে উঠল, এত কষ্ট করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেয়ে ওঠা—পুরো সময়টা নষ্ট হল।

পানশালার দীর্ঘ টেবিলের শেষ প্রান্ত থেকে একটি ছোটখাট মানুষ উত্তর দিল, সময় নষ্ট কাকে বলে আপনারা জানেন না।

সকলেই তাকাল বক্তার দিকে। লোকটিকে এতক্ষণ আমিও খেয়াল করিনি।

সময় নষ্ট—সে আবার বলল, তাহলে আপনাদের সময় নষ্টের একটা কাহিনী শোনাই, তখন বুঝবেন, আপনাদের পাহাড়ে ওঠার প্রতিটি মুহূর্ত কি সুন্দর ভাবেই না কেটেছে।

কাহিনী শোনাবার আমন্ত্রণ বা উৎসাহের অপেক্ষা না করেই সে বলে চলল, ঘটনাটা বেশ কয়েক বছর আগের, এবং ঘটেছিল এই এলাকাতেই। বহু দিন ধরে ফেরার এক অপরাধীকে ধরবার জন্যে একজন ডিটেকটিভ তার পিছনে তাড়া করেছিল। যখন সে প্রায় তাকে ধরে ফেলেছে তখন লোকটা রাতের অন্ধকারে ঢুকে পড়ে পাহাড়ী এলাকায়। আকাশে

চাঁদের আলো ছিল, এবং ডিটেকটিভও ছিল একরোখা, সুতরাং সেও অনুসরণে ক্ষান্ত দিল না। সৌভাগ্য বশতঃ আকাশের পর্দায় অপরাধীর ছায়া শরীর সে দেখতে পেল এবং অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে কিছুটা বেয়ে ওঠে চিৎকাব করে লোকটাকে আত্মসমর্পণ কবতে বলল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ডিটেকটিভের পা পিছলে গেল এবং পরিণাম স্বরূপ ঈশ্বরের করুণা বশতঃ নিজেকে সে আবিষ্কাব করল পায়ের গোড়ালি ভাঙা কিংবা মচকানো অবস্থায় এক সরু পাহাড়ী কার্নিশে। নিচে কয়েক শো ফুট গভীর খাদ ; আর ওপরে খাড়া পাহাড়। অনুসবণে তাড়াহুড়ো করার জন্যে তার এখন আফশোষ হল। সে যখন ভাবছে কেউ কখনও তাকে উদ্ধার করবে কিনা তখন হঠাৎই সে শুনতে পেল অপরাধী তাকে চিৎকার করে ডাকছে।

শুনছেন—অপরাধী লোকটা বলল, আমি একটা দড়ি নিয়ে আসছি।

এক মুহূর্ত ডিটেকটিভ চুপ করে রইল, তারপর চিৎকার করে প্রশ্ন করল, তুমি কি উইলিয়াম টার্নার ?

হ্যাঁ।

নিডনিব্লাণ্টকে খুনের অপরাধে তোমার নামে গ্রেপ্তারি পরেয়ানা আছে।

থাকলেই বা—কি করবেন আপনি ? টার্নার প্রশ্ন করল।

তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম। ডিটেকটিভ বলল।

কই, মনে তো হচ্ছে না। টার্ণার বলল।

শোন- -ডিটেকটিভ বলল, এখান থেকে আমি নিশ্চয়ই বাঁচতে চাই, তবে আমাকে দড়ি দিয়ে টেনে তোলাব আগে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, তুমি আমাকে টেনে তোলা মাত্রই আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করব।

থামুন—অপরাধী বলে উঠল। তার নীতিজ্ঞানও শুধুমাত্র খুনের ব্যাপারটুকু ছাড়া কিছু কম ছিল না।—আমি দড়ি আনতে যাচ্ছি—বলে সে চলে গেল।

বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে, ডিটেকটিভ যখন তার ফেরার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে অপরাধী তখন ফিরে এলো। সেই যে মাঝ রাতে বৃষ্টি

শুরু হয়েছে, পরদিন সকালেও তা থামেনি এবং টার্নার চলে যাবার পর একটি মানুষও ডিটেকটিভের নজরে পড়েনি।

এখনও বেঁচে আছেন? টার্নার চিৎকার করে বলল, না থাকলে শুধু আমি সময় নষ্ট করতে চাই না।

হ্যাঁ, বেঁচে আছি। চিৎকার করে জবাব দিল ডিটেকটিভ।

আমি এখানে একা—টার্নার বলল, তার কারণটা তো আপনি ভালোই জানেন বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে।

ডিটেকটিভ কারণটা বুঝল, কিন্তু একই সঙ্গে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, একটা লোক একা কি করে তাকে উদ্ধার করবে, তা সে দড়ি দিয়ে হলেও।

একটু অপেক্ষা করুন, আমি নামছি—বলল টার্নার, এবং নামতে শুরু করল। আপনাদের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে সেই অসুবিধে ও বিপদের বর্ণনা আর দেব না—লোকটি বলল, তবে এটুকু ধরে নিতে পারেন, আপনাদের কাছেও সে কাজ এক কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিত। ঘটনাচক্রে টার্নার কিংবা ডিটেকটিভ, কেউই পর্বতারোহী ছিল না, এবং নিতান্তই আশ্চর্য বলতে হবে যে টার্নার শেষ পর্যন্ত ডিটেকটিভের কাছে পৌঁছতে পেরেছিল। যাই হোক, কিছুক্ষণ পর, ডিটেকটিভের কাছাকাছি পৌঁছে সে তার দিকে দড়ি ছুঁড়ে দিল। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কতখানি তীব্র আর ভয়ঙ্কর ছিল ওদের নিরাপদে উঠে আসার প্রচেষ্টা। ওদের শরীরের এক এক আউন্স শক্তি ও স্নায়ু তার পিছনে নিয়োজিত হল। অবশেষে, অনেক পরে ওদের অমানুষিক পরিশ্রম পুরস্কৃত হল এবং নিরাপদ আশ্রয়ে ওরা উঠে এসে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যন্ত্রণা ও অবসাদে ডিটেকটিভের প্রায় অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা, কিন্তু শক্তি সঞ্চয় করে এটকু সে বলতে পারল, ধন্যবাদ। আমি দুঃখিত…এবং এই কথা বলে টার্নারকে ধরাশায়ী করার উদ্দেশ্যে তার চোয়াল লক্ষ্য করে এক ঘুষি চালাল। ডিটেকটিভ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল, যদি সে একাজ না করে তাহলে টার্নার তার কবল থেকে সহজেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। সে তাকে গ্রেপ্তার করবে

বলে আগেই সাবধান করে দিয়েছে, এবং একজন আদর্শ ডিটেকটিভের মতো নিজের প্রতিজ্ঞা রাখতে সে বদ্ধপরিকর। দুর্ভাগ্যবশত প্রতিজ্ঞা পূরণের সাধ থাকলেও প্রয়োজনীয় শক্তি তার ছিল না; টার্নার তার ঘুষিটা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতেই ডিটেকটিভ টলে গেল একপাশে, এবং খাদ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। যেহেতু একই দড়িতে সে ও টার্নার বাঁধা ছিল, সেহেতু টার্নারকেও সে টেনে নিয়ে চলল নিজের সঙ্গে। কয়েক শো ফুট গভীর খাদে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ওরা মারা গেল। আর আপনারা দু' ভদ্রলোক সময় নষ্টের কথা বলছেন!

অদ্ভুত কাহিনীই বটে—উকিল সাহেব আবার বলতে শুরু করলেন এবং সমস্ত মনোযোগ আবার কেন্দ্রীভূত হল তার দিকে,—কিন্তু আপনি কি বলতে চান এ কাহিনী সত্যি?

পুরোপুরি সত্যি—গম্ভীরভাবে জবাব দিল ছোট্ট মানুষটি।

ভদ্রমহোদয়গণ, নাটকীয় ভাবে বললেন উকিল ভদ্রলোক, আমার মনে হয় আমি নিশ্চিত ভাবে আপনাদের কাছে প্রমাণ করতে পারব যে এ কাহিনী সত্যি হতে পারে না। একটু থেমে তিনি ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। ছোট্ট মানুষটিকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার কাহিনী থেকে এ সিদ্ধান্ত করলে নিশ্চই ভুল হবে না যে ওই দুর্ঘটনার কোন সাক্ষী ছিল না?

ঠিক ধরেছেন।

দুজনেই কি সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিল?

ঠিক ধরেছেন।

তাহলে—উকিলসাহেব বললেন, কেউ তাদের মরতে দেখেনি, এবং কাউকে এ গল্প বলা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সেহেতু এ ঘটনা যে আপনার বর্ণনা মতোই ঘটেছে তা আপনার পক্ষে হলফ করে বলা সম্ভব নয়। একটু থামলেন তিনি। বিজয়ীয় দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন উপস্থিত দর্শকদের ওপর।

অবশ্য—তীব্র ব্যঙ্গভরে তিনি যোগ করলেন, যদি না আপনি সেই দুজনের কারো প্রেতাত্মা হয়ে থাকেন—

ঠিক ধরেছেন—ছোট্ট মানুষটি বলল এবং সকলের চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

হেনরী সেসিল—ইংরাজী সাহিত্যের বিশ্বব্যাপী বিরাট ও বিস্তৃত পরিধিতে ভৌতিক গল্পের জমজমাট বাজার। আজকের দিনের সাহিত্যের পসরায় ভৌতিক তথা রহস্য গল্পকে যে সকল সাহিত্যসেবী সামান্য সূত্র হতে অসামান্য সার্থকতায় উত্তীর্ণ করেছেন হেনরী সেসিল তাঁদের অন্যতম।

লেখক তাঁর গল্পে এক বিশেষ সরস রচনাভঙ্গী অনুসরণ করে পাঠককে এক বিশেষ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জগতে প্রবেশ করান।

পুতুল

THE DOLL

লেডি সিনথিয়া অ্যাসকুইথ

'পুতুলটা উঠে বসে মানুষের মতন ভীষণ নিষ্ঠুর রূপ ধরে তার গলায় মুখ লাগিয়ে রক্ত শুষে খাচ্ছে।'

কখনো কখনো কোন কোন রাত একটু বেশীই অন্ধকার থাকে। এ অন্ধকার অন্যান্য দিনের রাতের অন্ধকার থেকে সম্পূর্ণ অন্য জাতের। তাই এই অন্ধকার দেখে যেন গা কেমন ছমছম করে—। এ রাতকে যেন কেমন রহস্যময়ী বলে মনে হয়—আর এই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শরীরের ভেতর থেকে শিউরে শিউরে ওঠে একটা তৃতীয় সত্তা সে যেন তীব্র অনুভূতি দিয়ে জানাতে চায় কিছু একটা ঘটবে,—কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে যেন এই অমা রাতের অশুভ-অন্ধকারে।

এই অন্ধকারে যেন মানুষ কান পেতে থাকে বাইরের নিশুতি রাতের আকস্মিক কোন সঙ্কেতের জন্যে। বাংলোর বাইরে যদি টুপ করে একটা পাতা ঝরে পড়ে তাহলেও মানুষের পদশব্দ ভেবে ঘরের বাসিন্দারা চমকে

ওঠে : আর মনে করে বাড়ীটা ছেড়েই যেতে হবে। বাইরে বিরাট বাগান দিয়ে বেষ্টিত বলেই বাড়ীটাকে এত নিঃসঙ্গ মনে হয়।

একটা নভেম্বরের শীতের রাতের কথা বলছি। বাড়ীর মালিক করনেল মাষ্টার। তিনি বহুদিন ইণ্ডিয়া রেজিমেণ্টে ছিলেন। এখন অবসর নিয়ে নিজের বাড়ীর শান্ত পরিবেশে অবসর যাপন করছেন। স্ত্রীকে তিনি বহুদিন আগেই হারিয়েছেন। অবলম্বন একটি ছোট মেয়ে মণিকা। মা-মরা মেয়েটার যত্ন-আত্তি একেবারেই হয় না তাই তাকে দেখবার জন্যে পোলিশ এক মহিলাকে রেখেছেন। তাঁর নাম ডজস্কা। এ ছাড়া বাড়ীতে রান্না করবার লোক এবং বাড়ী দেখাশুনো করবার একজন পরিচারিকা তো আছেই। ভদ্রলোকের পুরো নাম করনেল হেমবার মাষ্টার সবাই তাঁকে করনেল মাষ্টারই বলে।

রাতটা খুবই অন্ধকার। তার ওপর করনেল বাড়ী নেই। বাইরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি নেমেছে। কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার যেন কুয়াশায় ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে অন্ধকারটাকে জমাট বেঁধে দিচ্ছে।

হঠাৎ রাত দশটার সময় ভীষণ জোরে আর বিশ্রীভাবে দরজার ঘণ্টাটা বাজতে লাগলো। ওপরে মণিকা একা শুয়ে আছে—এমন ঘণ্টার শব্দে হয়তো ভয় পেতে পারে সে, তাই ভেবে রান্না করবার লোকটি নিচে নেমে চট করে দরজাটা খুলে দিতেই ওর বুকটা দপ করে উঠলো। দরজায় দাঁড়িয়ে মিশকালো দীর্ঘাঙ্গ রোগা একটা বিকট চেহারার লোক। তার হাতে একটা পারসেল।

লোকটা আরব বা নিগ্রোর মত দেখতে। তার পরনে একটা ঘোর কালো আলখাল্লার মত জিনিষ, মাথায় বিবর্ণ একটা টুপী। সে হাত বাড়িয়ে পারসেলটা ডজস্কার হাতে দিয়ে কেমন পিশাচের মত দাঁত বার করে হেসে বললে : এটা করনেল হেমবার মাষ্টারের জন্যে। বলেই তার আগুনের ভাটার মত চোখ দুটো দিয়ে একবার দরজায় দাঁড়ান ডজস্কাকে দেখে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য সে যে বৃষ্টির মধ্যে এসেছে তার গা বা পারসেলটা একটুও ভেজেনি। রাঁধুনে আর ডজস্কা ছুটে ঘরের মধ্যে চলে গিয়ে

কাঁপতে লাগলো : ওর চোখ দুটো দেখেছ ? যেন জ্বলন্ত চুল্লী। কাঁপতে কাঁপতে ডজস্কা বললো : গলার আওয়াজ ! উঃ কী ভীষণ কর্কশ ! ওর যেমন বিশ্রী দৃষ্টি তেমনি আঙুলগুলো। তাকে যেন সাক্ষাৎ যমদূত বলে মনে হচ্ছিল।

পরের দিন সকালে করনেল বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে ওরা মণিকাকে লুকিয়ে দরজা এঁটে বন্ধ করে দিয়ে পারসেলটা খুললো। ব্রাউন পেপারে ভাল করে জড়ান একটা পুরানো পুতুল। পুতুলটা হতশ্রী।

লোকটা দেখতে যতই ভয়ানক হোক পুতুলটার মধ্যে তো আর সে সব কিছু নেই। ওরা দুজন পুতুলটা বেশ করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। কিন্তু উপহার দেবার আর কি অন্য জিনিষ ছিল না। আশ্চর্য।

পুতুলটা কারু খেলা করবার সঙ্গী ছিল বলে মনে হয়। ওর চুলগুলো বেশ খানিকটা ছেঁড়া। একটা হাত ভাঙ্গা। ওরা পুতুলটা বেশ করে দেখে টেখে আবার সেই ব্রাউন পেপারে যেমন করে পারসেলটা জড়ান ছিল তেমনি করে জড়িয়ে রাখলো। করনেল রোজ সন্ধ্যায় তাসের আড্ডায় বেরিয়ে যান ফেরেন রাত প্রায় এগারটায়। তখন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ থাকেন না তিনি। সুতরাং সে সময় ওটা তাঁকে দেওয়ার কোন মানে হয় না।

পরদিন সকালেই তাঁর উপহার তাঁকেই দেওয়া হবে। সেটাই ভাল। সুতরাং সে পুতুলটা করনেলের পড়ার ঘরের ডেসকে রেখে দিয়ে এল।

সামান্য একটা ভাঙ্গা পুতুল তার ওপর অমন একজন লোক দিয়ে গেছে বাড়ীর পরিচারিকা ওরাইলী ওটা সম্পর্কে করনেলকে অবহিত করবার কোন প্রয়োজনই বোধ করলো না। তারপর কাজে কর্মের ব্যস্ততার মধ্যে পুতুলটার কথা সে একেবারেই ভুলে গেছে।

ডজস্কা একদিন তাকে বললো : পুতুলটার কথা তুমি করনেলকে বলেছ ?—

: না। ওটার কথা আর কী বলবো। ওটা তো এমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয় যে বলবো। তাছাড়া আমার মনেও ছিল না। হঠাৎ ওপর থেকে ডাক এলো : করনেল এখুনি ডাকছেন। ওরা ছুটে যেতেই করনেল তার

ড্রয়ার থেকে টেনে পুতুলটা বের করে বললে : এটা কী ?—করনেল সেই ব্রাউন পেপারের মোড়ক খুলে পুতুলটা বের করলেন। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে যেন তিনি থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন : এটা কে দিল ?

: একটা অন্ধকার ঝড়ের রাতে এক মিশকালো ভীষণ চেহারার লোক এসে আপনাকে ওটা দিয়ে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমরা তাকে অনেক ডাকলাম—, খুঁজলাম। কিন্তু পেলাম না। আপনার কাছে দেব বলেই ওটা ড্রয়ারের ভেতর রেখে দিয়েছি।

করনেল যেন জমে বরফ হয়ে গেলেন। তিনি কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন : এটা এখান থেকে এখুনি নিয়ে গিয়ে একেবারে পুড়িয়ে ফেল। কিন্তু খুব সাবধান যেন মণিকা জানতে না পারে। ওকে এটার কথা জানতে দিও না বা কখনও পুতুল কিনে দিও না। মনে রেখ তাহলেই সর্বনাশ হবে। ধর—নিয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে—করনেল চিৎকার করে উঠলেন।

ডজস্কা পুতুলটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। পেছনে পেছনে ছুটলো ওরেইলী।

ওরা রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে ওটা পোড়াতে যেই যাবে রাঁধুনে বললে : ওটা পুড়িও না। আমায় দিয়ে দাও।

: করনেল জানতে পেলে আমাদের শেষ করে দেবেন। ডজস্কা বললো।

: আরে জানবে কী করে। আমি যখন বাড়ীর বাইরে যাব ওটা ফেলে দিয়ে আসবো।

: ঠিক তো ?—

: ঠিক। মণিকাকে খাবারটা দিয়ে আসি তারপরই ফেলে দেব। রাঁধুনে মণিকাকে খাবারটা দিতে গেল।

মেয়েটি বিছানায় চুপ করে শুয়ে ছিল। ছেলেপুলেদের কাছে কত খেলনা পুতুল থাকে কিন্তু ওর ঘরে কিছুই নেই। মেয়েটি যেমন বিমর্ষ তেমনি নিঃসঙ্গ। তাকে দেখলেই কষ্ট হয়। রাঁধুনে খাবারটা টেবিলে রেখে পোরিজের পাত্রটা নামাতে যেতেই পুতুলটা তার পকেট থেকে ঠক্

করে মাটিতে পড়ে গেল।

: ওটা কী দেখি ?—বলেই মণিকা পুতুলটা কোলে তুলে নিল।

: আমি এটা দেব না। আমার কাছে থাকবে এটা।

: সেকি ?—এটা আমার যে।

: না ! না ! আমি দেব না। এটা কেড়ে নিলে আমি এখুনি বাবাকে বলে দেব।

রাঁধুনে থর-থর করে কাঁপতে লাগলো : তাহলে ওটা থাক, কিন্তু তুমি পুতুলের কথা করনেলকে কখনও বলো না। বললে কিন্তু বিপদ হবে খুব।

দুহাতে পুতুলটাকে বুকে জড়িয়ে মণিকা বললে : আমি একা একা থাকি দিনরাত। আমার কোন খেলনা নেই। একটা পুতুল কতকরে বাবার কাছে চেয়েছি কিন্তু তিনি দেননি। আমার এ পুতুলের কথা কেউ জানবে না।

করনেল পারসেলটার জন্যে ডজস্‌কাকে এমনভাবে বকেছেন যে তাতে স্বভাবতঃই সে ভয় পেয়ে গেছে। একটা পারসেল-এর মধ্যে এমন কী গোপনীয় বা ভীতিকর জিনিষ থাকতে পারে যাতে তাকে এমন করে ভয় পেতে হবে। ডজস্‌কা ভাবলো, আশ্চর্য ভদ্রলোক, স্ত্রী মারা গিয়ে একা একা থাকার ফলেই হয়তো এই অবস্থা হয়েছে ওঁর। পুরো মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে।

কিন্তু যার বাড়ীতে কাজ করছে সেই প্রভুকে তো কিছু বলা যাবে না। কাজেই অত্যন্ত শঙ্কিত হয়েই রইলো সে।

যে কখনও একটা খেলনা পায় নি সে একটা পুতুল পেল। তাই মণিকার আনন্দের আর অবধি নেই। বাঘ বা ভালুক পেলে সে এত খুশী হত না কারণ তার মধ্যে মানবীয় আবেদন তেমন কিছুই নেই। কিন্তু একটা পুতুল তো একটি মানুষের প্রতিভূ। তাই তাকে পেয়ে যেন মণিকা বেঁচে গেল।

সারাদিন তার পুতুলটা নিয়েই কাটে। তাকেই নাওয়ায়-ধোওয়ায়, খাওয়ায় তারপর নিজের বিছানার পাশে শুইয়ে পুতুলকে ঘুম পাড়াতে

পাড়াতে নিজেই ঘুমিয়ে পড়ে কখন তা সে নিজেও জানে না।

ডজস্কা তাকে খেতে দিতে এসে চমকে ওঠে। পুতুলটা সে বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে।—যদি করনেল দেখতে পায় তাহলে তো তারা আর আস্ত থাকবে না।

করনেল সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়ে যান তাসের আড্ডায়। ফেরেন অনেক রাতে। পথ-ঘাট তখন প্রায় নির্জন হয়ে যায়। অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় নেশার ঘোরে সেদিনও টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন নিজের বাড়ীর দিকে। পেছনে পেছনে কে যেন আসছে দ্রুত পায়ে নিঃশব্দে।

ঃ কে ?—করনেল থামলেন।

শব্দও থামলো। কিন্তু কোন উত্তর নেই।

আবার চলতে লাগলেন তিনি।

আবার সেই শব্দ। পেছনে কে চলছে।

তিনি ছুটতে লাগলেন ; যখন বাড়ী প্রায় ধর ধর ঠিক সেই সময় একটা নিকষ কালো লোক। পরণে কালো আলখাল্লা, অট্টহাসিতে আকাশ ভরে দিয়ে বললেন ঃ প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা চাই। করনেল ছুটে বাড়ীর ভেতর ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তখনও লোকটা দরজা ধাকাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে—প্রতিশোধ নেবই।

আর সেই মুহূর্তে মণিকার দরজার কাছে ডজস্কা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে। কেন ? সে কি দেখে জ্ঞান হারালো ?

মণিকা ঘরের ভেতর একা শুয়ে আছে। তার ওপর মা-হারা মেয়ে। কান্নাকাটি করছে কি না বা ঠিকমত ঘুমাচ্ছে কিনা দেখতে গিয়ে যা দেখলো তাতে তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল এবং মুহূর্তে চেতনা হারালো।

সে দেখলো ঃ মণিকা অঘোর ঘুমে অচৈতন্য আর পুতুলটা ঠিক উঠে বসে মানুষের মত ভীষণ নিষ্ঠুর রূপ ধরে তার গলায় মুখ লাগিয়ে রক্ত শুষে খাচ্ছে আর তার ঠোঁট বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে বালিশের সাদা ওয়াড়ের ওপর। সাদা বালিশের ওয়াড় লাল হয়ে যাচ্ছে।

পরদিন সকালে উঠে ডজস্কা বললে ঃ করনেল, আমি বাড়ী যেতে

চাই। আমার বাবা অসুস্থ।

ঃ তুমি বলছিলে না মণিকা অসুস্থ,—কেমন রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে। সে তোমাকে ভালবাসে,—মা নেই তুমিই তার মায়ের মত। এই অবস্থায় তাকে রেখে চলে যাওয়া কী তোমার উচিত হবে?—করনেল চিন্তিত হলেন।

ঃ এ সব কথা সবই ঠিক। কিন্তু তবু আমাকে যেতেই হবে, আমার খুব দরকার।

সে কাঁপতে লাগলো। করনেল ভাবলেন হয়তো সত্যিই বিপদ তাই এমন বিচলিত হয়ে পড়েছে ডজস্কা। তাই বললেন ঃ যাও— : তবে তাড়াতাড়ি এস।

ডজস্কা বাড়ী চলে গেল।

কিন্তু তার মন পড়ে রইলো মণিকার ওপর। কী জানি কী হয় ওর। মেয়েটা যেমন দুঃখী—ওর কপালে যেন কী আছে।

বাড়ী সে গেল বটে তবে থাকতে পারলো না। তার সৎ-বাবা তাকে দেখেই চটে গেল। আবার আপদটা এসেছে জ্বালাতে ঃ দূর হয়ে যাও। যেখান থেকে এসেছ সেখানেই চলে যাও। আমার বাড়ীতে তোমার স্থান হবে না।

অতএব তাকে আবার ফিরতে হলো। সম্পূর্ণ নিজের অনিচ্ছায়। এই দীর্ঘ সাত দিনে বাড়ীর কী অবস্থা হয়েছে ডজস্কা জানে না। কিন্তু এটা ঠিক বুঝতে পেরেছে, ওদের বাড়ীর ওপর সমূহ সর্বনাশ অচিরেই নেমে আসবে।

সে বাড়ীতে যখন ফিরে এল তখন রাত হয়ে গেছে। করনেল যথারীতি তাসের আড্ডায়। ঝি এবং রাঁধুনে অত্যন্ত বিচলিতভাবে কথা-বার্তা বলছে।

রাতে মণিকা ঘুমোলে তারা দুজনে চুপি চুপি এসে পুতুলটা তার বুকের থেকে সরিয়ে নেবে বলে দরজা খুলতেই দেখলো ; একটা বিকট নারী-মূর্তি —ধীরে ধীরে পুতুলের মধ্যে থেকে বেরুচ্ছে। তারপর ঘরের ভেতর পাগলের মত কী যেন খুঁজছে। মণিকা ঘুমের মধ্যেই ওর সঙ্গে কথা বলে চলেছে স্বাভাবিক গলায়।

: ওটা আমার ঘরে নেই। তুমি বৃথাই খুঁজছ।

: নিশ্চয়ই আছে,—তোমরা লুকিয়ে রেখেছ। যতদিন না আমি ওটা ফিরে পাই ততদিন তোমার রক্ত শুষে তোমাকে নিঃশেষ করবো; তারপর তোমার বাবার পালা। আমাকে প্রতিশোধ নিতেই হবে।

: তুমি যাও।—

: না। আমাকে যখন একবার স্থান দিয়েছ তখন আমি তোমাদের শেষ না করে এ বাড়ী ছাড়বো না। বলেই সে পাগলের মত কী যেন খুঁজে না পেয়ে রেগে গিয়ে শ্বাপদের মত থাবা বার করে মণিকার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

: তোকে একবারে মারবো না ধীরে ধীরে চুষে খেয়ে খেয়ে একেবারে ছোবড়া করে ফেলবো।—

ডজস্কা সব শুনলো। সে সহজেই বুঝলো এ পুতুলটা মন্ত্রপুত পিশাচ। করনেলের ওপর প্রতিহিংসা নেবার জন্য ওই কালো নিগ্রোটা ওকে চালান করে গেছে। ও আগে মণিকাকে মেরে শেষে করনেলকে মারবে।

: করনেল আমি এসেছি। চেয়ারের ওপর বসে থাক।

করনেল বললেন: আমি খুব খুশী হয়েছি। আমার মণিকা যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে—। মনে হচ্ছে ওর গায়ে আর একবিন্দু রক্ত নেই—কথা বলতে পারে না।

ডজস্কা চুপ করে শুনছিল আর চোখের জল মুছছিল।

হঠাৎ করনেল আর্তনাদ করে উঠলো: ডজস্কা আমার মণিকার কী হলো বল তো? সে কী বাঁচবে না। যত ডাক্তার দেখাচ্ছি নিরাশ হচ্ছি। কী যে রোগ কেউ ধরতে পারছে না।

ডজস্কা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। না, আর চুপ করে থাকা চলবে না। এবার সত্য প্রকাশ করতেই হবে। এমন করে যার নুন খাচ্ছে তাদের ধ্বংসের মুখে—সর্বনাশের কাছে ঠেলে দেওয়া যায় না।

ডজস্কা বললে: করনেল, একটা কথা আপনাকে অনেক দিন ধরে বলি বলি করে বলা হয়নি। এখন দেখছি চারদিকে অমঙ্গলের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। আর চুপ করে থাকলে আপনার প্রাণ সংশয় হবে

তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি।

আপনি যে পুতুলটাকে উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন সেটা আপনি আমাদের পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলেন। কিন্তু ওরেইলীর হাত থেকে মণিকা ছিনিয়ে নেয়। তারপর সে 'ওটা তার বিছানার পাশেই শুইয়ে রাখে। নাওয়ায়, খাওয়ায়, ভালবাসে নিজের সঙ্গীর মত। প্রতি রাত্রে ও ঘুমের মধ্যে ওই পুতুলটার সঙ্গে কথা বলে আর পুতুলটা তখন মানুষের আকার নিয়ে—

করনেল চীৎকার করে উঠলো ঃ ও হোঃ—হোঃ—তোমরা আমার একি সর্বনাশ করলে। আমি কি গরীব যে মেয়েকে পুতুল কিনে দিতে পারি না, না কোন খেলনা দিতে পারি না। ওসব দেওয়া ওকে বারণ। তাছাড়া আমার আদেশ অমান্য করে তোমরা পুতুলটাকে পুড়িয়ে না ফেলে ওর হাতে দিয়েছ যখন মেয়েকে আর কোন মতেই বাঁচান যাবে না।

ডজস্কা কাঁদতে কাঁদতে বললে ঃ আজ রাতে আমি আপনাকে মণিকার ঘরে নিয়ে যাব ও ঘুমোলে।

করনেল কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কি দেখবো ওর ঘরে--বল—বল।

বাইরে অশান্ত এলোমেলো হাওয়া বইছে। লনের ঝাউগাছগুলো বুক চাপড়ে যেন হাহাকার করে চলেছে একটানা। করিডোরের ভেতর যেন কেমন কালো কালো উড়ন্ত কিসের ছায়া পড়ছে।

ডজস্কা ধীরে ধীরে এসে করনেলকে ডাকলো।

ঃ আসুন। দেখবেন আসুন।

ওরা খুব ধীরে—আলতো পায়ে এগিয়ে চললো। দরজার কাছে আসতেই ওরা থমকে দাঁড়ালো। খোলা দরজায় পরদার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—মণিকা অঘোরো ঘুমাচ্ছে। আর ঘরের ভেতর যেন একটা তুষার ঝড় বইছে। আর মণিকার বিছানার ওপর তার মাথার কাছে বালিশের ওপর শুইয়ে রাখা পুতুলটার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে সেই কালো—ঘোর কালো সারা শরীর অন্ধকার আলখাল্লায় ঢেকে বেরিয়ে এল সেই পিশাচমূর্তি লোকটা।

মণিকা আজই তোমার জীবনের শেষ রাত। সে তার জান্তব

আঙ্গুলগুলো দিয়ে মাথা একবার চুলকে নিলো। তোমার বাবা যুদ্ধে গিয়ে আমার স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে খুন করেছিল। আমার একমাত্র শিশুকন্যা মার বুকের দুধ না পেয়ে মারা যায়। এ পুতুল আমার সেই মৃত কন্যার পিশাচের রূপ। আমিও স্ত্রীর মৃতদেহ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম পিশাচ তন্ত্র সাধনা করে আমার জীবন যেমন তোমার বাবা নষ্ট করে দিয়েছে আমিও তার জীবন নষ্ট করে প্রতিশোধ নেব। তাই আমি আমার মৃত কন্যাকে মন্ত্রপূত করে পিশাচ বানিয়ে তোমার বাবাকে উপহার দি—। তোমার বাবা এসব খবর জানতেন তাই তিনি তোমার খেলার জন্যে কোন পুতুল বা খেলনা এনে দিতেন না। আমি অনেকবার ওর কাছে পুতুল পাঠাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সব বারই ব্যর্থ হয়েছি। তিনি আমার কোন উপহার গ্রহণই করতেন না। আর কেউ করলেও তা তখুনি পুড়িয়ে ফেলতেন। কিন্তু এবার আমি কৃতকার্য হয়েছি। তুমি মৃত্যুর জন্যে তৈরী হও।

মণিকা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেঃ আমি তো নিরপরাধ। আমি তোমাকে ভালবাসি তুমি আমাকে মারবে কেন?

ঃ ওসব কথা থাক। আমার মেয়ে এবং স্ত্রীও নিরপরাধ ছিল। তারা মরলো কেন? আর নয়—আমাকে প্রতিহিংসা নিতেই হবে, বলেই সে ছুটে গিয়ে মণিকার টুঁটি কামড়ে ধরলো।

সঙ্গে সঙ্গে করনেল ঘরে ঢুকে হাতের পিস্তল দিয়ে ওকে আক্রমণ করলো।

পিস্তল থেকে দুম-দুম করে দুটো গুলি বেরোতেই—চারদিকে যেন প্রবল তুষার ঝড়ের সৃষ্টি হলো। আর তারই মধ্যে সেই কালো মূর্তিটা ছুটে এসে করনেলের গলায় কালো কালো পিশাচের দাঁত লাগিয়ে মুহূর্তে ধড় থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে সেই ক্ষতে মুখ লাগিয়ে রক্ত শুষে খেতে লাগলো।

তারপর মুখ তুলে মণিকার শবের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো প্রতিশোধ—প্রতিশোধ। আমার শত্রু আজ শেষ হয়েছে। কী আনন্দ,—কী আনন্দ!

এখন সকাল। করনেলের নিঃশব্দ বাড়ীর মধ্যে দুটি মৃত শবের কাছে বসে কাঁদছে ডজস্‌কা, ওরেইলী আর বাড়ীর রাঁধুনে। তাদের দেখে যেন মনে হয় তারা কেউ-ই বেঁচে নেই। সবাই রক্তহীন গলিত মৃতদেহ একটা শ্মশানে বসে আছে।

লেডি সিনথিয়া অ্যাসকুইথ—ইংরাজী ভৌতিক গল্পের ক্রমবিবর্তনে যে সমস্ত লেখক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন লেডি সিনথিয়া অ্যাসকুইথ তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। ভৌতিক ও রহস্য গল্পের রূপ, রস ও আঙ্গিকের পরিধি বিস্তারে মার্কিন সাহিত্যিক এড্‌গার অ্যালেন পো ও ইংরাজ গোয়েন্দা সাহিত্যিক কোনান ডয়েল সাহেবের মত পুরুষ লেখকদের স্থান সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু ভয়াল, বীভৎস ভৌতিক রস সৃষ্টির ব্যাপারেও যে ইংরাজী সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিকাগণের ভূমিকা কোন অংশে গৌণ নহে তার প্রমাণ লেডি সিনথিয়া অ্যাসকুইথ। লেখিকা ভৌতিক গল্পের সার্থক বিন্যাসে যে দক্ষ রচনা শৈলী ও অসামান্য পারিপাট্যের পরিচয় দিয়েছেন তা বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ।

আমরা সিনথিয়া অ্যাসকুইথের The Doll ও Shadow নামক দুটি শ্রেষ্ঠগল্প পাঠকদের পরিবেশন করতে পেরে আনন্দিত। ভৌতিক গল্পও যে সার্থক ছোট গল্প হয়ে উঠে গল্প দুটি তার উজ্জল প্রমাণ।

ছায়াময়ী

SHADOW

লেডি সিনথিয়া অ্যাসকুইথ

'মেরি তাকে কোন দিনই ভালবাসেনি। শুধু ভালবাসার অভিনয় করে চলেছে।...আর তাকে খুন সেই করেছে।'

সারারাত ধরে পেঁজা তুলোর মত বরফ পড়ে পড়ে রাস্তা-ঘাট সব জমে গেছে। ঘরের ওপরের চিমনিগুলোর মাথায় মাথায় সুন্দর বরফ জমে একেবারে সাদা ধপধপ করছে। ফিলিপ তার ঘরের ঘোলাটে জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল একটা দীর্ঘ কালো পাখাওয়ালা পাখী বারবার তার কাঁচের জানালার ওপর এসে আছড়ে পড়ছে। আবার কাঁচের বাধা পেয়ে উড়ে যাচ্ছে।

স্বর্ণ গাছগুলো, আইভি লতাগুলো বরফের শৈত্যে কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কাল রাতে সে এ বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ী, পথ তার নুড়ির। আর তার ওপর শ্যাওলা পড়ে পড়ে দারুণ পেছল। এক নজরে দেখলেই বোঝা যায় এ পথে দীর্ঘ দিন কেউ হাঁটেনি। শ্যাওলার ওপর তারই প্রমাণ—তাই এ পথে দীর্ঘ দিন পরে মানুষের পদক্ষেপ বলা যায়।

সারাদিন ধরে সে কী যে করবে ভেবে পেল না। একবার ঘরের মেজেতে পড়ে থাকা একগোছা মরচে পড়া চাবির গোছা নিয়ে অন্য ঘরগুলোর দরজা খুলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কেমন বিশ্রী ক্যাচ্-ক্যাচ্ শব্দ করে তালার ভেতর চাবিটা ঘুরতে লাগলো খুললো না। সব মরচে পড়ে জং ধরে গেছে।

ফিলিপের শোবার ঘরটা সে নিজেই পরিষ্কার করে নিলো। তারপর খাবার টেবিল নিজেই গুছিয়ে সঙ্গে যে খাবার ছিল তাই টেবিলে সাজিয়ে

রাখলো। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে খাবে এই তার ইচ্ছে।

কত বছর পরে সে এ বাড়ীতে ফিরে এলো আবার? প্রায় দশ বছর। খাবার টেবিলে বসে সে বারবার নিজের ভাবনার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিল। অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল বারবার। অশ্রুভারাক্রান্ত স্মৃতিগুলো তাকে বারবার বিমর্ষ করে দিচ্ছিল।

মেরীর সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয় এই বাড়ীতে থাকতেই, ছোট্ট কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে সে একা একা চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে চলেছিল। ফিলিপ পেছন থেকে ডাকলোঃ কোথায় যাচ্ছ?

ঃ বেড়াতে—; সংক্ষেপে মেরী বললে।

ঃ চল, আমিও যাব।

ফিলিপ ওর সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে লাগলো। কখনও আগে কখনও পরে কখনও পাশাপাশি ওরা হেঁটে চললো। মেরী বললেঃ আজকাল কী করছো? ওর গলার আওয়াজ খুবই নির্বিকার।

ঃ চাকরী? একটা কেমিকাল ফারমে কেমিস্টের কাজ।

ঃ তাই বুঝি খুব ব্যস্ত আমাদের বাড়ী আর আস না। মেরীর গলায় যেন কেমন ঠাট্টার সুর।

ঃ তোমার বাবা মা তো আমাকে একেবারে পছন্দ করেন না। গিয়ে কী হবে? গেলেই তো অপমানিত হতে হবে।

ঃ আমি তো তোমাকে কোনদিন কিছু বলিনি। বরং তোমাকে প্রত্যাশাই করেছি। স্বরে কৌতুক মেশান।

ঃ তার মূল্য কতটুকু? তোমার বাবা মার কাছে হৃদয়ের কী মূল্য-- তাঁরা টাকাটাই চেনেন। তাছাড়া তোমার জন্যে অনেক ধনী—সম্পন্ন পাত্র অপেক্ষা করে আছে। তাদের ছেড়ে তুমি আমাকে বিয়ে করে চির দারিদ্র্যই বরণ করবে কেন?—বলেই ফিলিপ একটু থেমে মেরীর মুখে তার প্রতিক্রিয়া দেখে মনটা জানতে চাইল।

কিন্তু নিষ্ঠুর চৌকো চোয়াল শক্ত করে মেরী দূরে একটা ফ্লাইং ফক্স একটা গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে যাচ্ছিল সেই দিকে চেয়ে রইল মেরী। যেন সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। ফিলিপ বিস্মিত হল। তাহলে

ভালবাসাটা কী একান্তই একপেশে—মেরী তাকে কোনদিনই ভালবাসে নি। শুধু ভালবাসার অভিনয় করে চলেছে—, আর সে কিছুই না বুঝেই তাকে সর্বস্ব দান করে নিঃস্ব হয়ে গেছে। মেয়েরা সত্যি আশ্চর্য জীবই বটে।

ফিলিপ আবার খাবারে মন দিল। রুটিগুলো খুবই শুকনো তবু আজকের দিনটা তাকে চালিয়ে নিতেই হবে। কোন উপায় নেই। ফিলিপের হাতটা হঠাৎ চমকে থেমে গেল। মুখে রুটির যে টুকরোটা দেবে বলে তুলেছিল সেটা খসে পড়ে গেল। তার মনে হলো—আলতো পায়ে পায়ে কে যেন তার কাছে খুব মৃদু স্বরে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে। চঞ্চল পায়ে ঘুরছে ফিরছে—কখনও বাতাসে ভর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে, কখনও সে আমার চারপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বাতাসে তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছে ফিলিপ। কখনও কখনও তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এ কি বিচিত্র অনুভূতি!

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল ফিলিপের। সে উঠে পড়লো। তারপর হালকা একটা কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো ব্যাপারটা কী?—হয়তো এ সবই তার অসুস্থ মনের চিন্তার ছায়া। এ সব বাজে কথা ভেবে লাভ কী?

একটু ঘুমুতে চেষ্টা করা যাক। কিন্তু এলো না, একটা আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে ঘুরে ঘুরে মেরীর কথাই তার মনে হতে লাগলো।

মেরী খুব খেলোয়াড় মেয়ে ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। তার সামান্য যা কিছু সঞ্চয় ছিল সবই সে গ্রাস করেছিল কায়দা করে, তারপর একরাতে যখন সে পাশের বাড়ীর তার এক প্রেমিকের সঙ্গে পালাচ্ছিল তখন—ভাবতে গিয়ে বারবার চমকে উঠলো ফিলিপ।

খুন!—হ্যাঁ, খুনই হয়েছিল। আর তাকে খুন সেই করেছে।

কথাটা সে ভাবতে গেলেই পাগলের মত হয়ে যায় কেন। তার মধ্যে যেন আর একটা সত্তা জেগে ওঠে—সেটা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি ভয়ঙ্কর। খুনের পর আজ দশ বছর ধরে নানা জায়গায় ঘুরেছে সে, কিন্তু শান্তি পায়নি। পুলিশের চোখ এড়িয়েছে ঠিকই কিন্তু নিজের মনের

চোখ? শেষে আবার এ বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছে। এ ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। অন্য জায়গায় সে ধরা পড়ে যাবে।

রাত ঘনিয়ে এল। আবার মনে হল হাজার হাজার গলায় কারা যেন কথা বলে চলেছে বাইরে। চারদিকেই একটা ফিসফিসানি আর ষড়-যন্ত্রের বিচিত্র আভাস যেন।

রাত আরো গভীর হলো। ফিলিপ হাতে বেহালাটা নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বসলো। একটা অপূর্ব সুর সে বাজাতে লাগলো বেহালায়—তার সুরের মূর্চ্ছচ্ছণায় চারদিক ভরে গেল, গমকে—মীড়ে, মূর্চ্ছণায় বাজনা বেজে চললো।

বাইরে বরফ পড়ছে ঝর-ঝর করে। জানালার বন্ধ কাঁচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে চারদিক যেন সাদা হয়ে গেল, হঠাৎ ফিলিপের হাত কেঁপে কেঁপে উঠছে। যে বরফ তার জানালাটার সামনের ফার গাছটার কাছে পড়ছে সেটা পড়ে পড়ে ঠিক একটা তুষার কন্যার মূর্তি ধরছে আর তার চেহারা মেরীর। ফিলিপ যেন পাগলের মত বাজিয়ে চলছে দ্রুত লয়ে। মেরী এক একবার সদ্য ঘুমভাঙা চোখে তাকাচ্ছে তারপর মনে হয় একটু একটু নড়ছে। সে কি এগিয়ে আসছে জানালার দিকে মেরী—মেরী।—

বরফ পড়া যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। সে ছুটে গিয়ে ঘরের সব জানালা-গুলো আর দরজা খুলে দিল। আসুক আসুক ও এই হিমেল রাতে এই অন্ধকারে এই বরফের ওপর দিয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে। তার পোষাকের শব্দে—তার চলার হালকা আওয়াজ; তার গায়ের গন্ধ: সেই পরিচিত হাসি, সেই শব্দ করে করে শ্বাস নেওয়া, সবই আজ শুনতে চায় ফিলিপ তার বাজনার মধ্যে দিয়ে যে স্বপ্নলোক তৈরী হয়েছে তারই কোন সোপান বেয়ে সে আসুক তার ঘরে।

ফিলিপের হাত থেকে কখন বেহালাটা খসে পড়েছিল সে জানে না। জ্ঞান হারিয়েছে সে, মেরীকে খুন করে। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে কিন্তু নিজের কাছ থেকে সে পালাবে কী করে। যখনই সে একা থাকে তাকে এমনি করে মেরী খুঁজে বেড়ায়। বরফের মেয়ে আসল মেরীর চেয়েও যেন ভয়ানক ছিল তাই ওকে দেখে ফিলিপ জ্ঞান হলে

হারিয়েছিল। সহ্য করতে পারেনি।

পরদিন সকালে ফিলিপ তার সংক্ষিপ্ত সংসার গুটিয়ে নিয়ে বেরুতে যাবে হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো কাল সেই রাতে যখন বরফ পড়ছিল বাইরে তখন সে যে জানালাটার কাছে বসে বেহালা বাজাচ্ছিল সেই দিকে ছোট ছোট পায়ের ছাপ তখনও বরফের ওপর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওই পদচিহ্নগুলো তার জানালা পর্যন্ত এসে থেমে গেছে।

ফিলিপ একবার থমকে দাঁড়ালো, ফার গাছের কাছে বরফের মেরীকে সে একবার খুঁজতে চাইলো।

কিন্তু আবার পোষাকের খসখস শব্দ—গায়ের গন্ধ, আলতো পায়ের শব্দ নারী দেহের আভাস আর মেরীর গলা। হ্যাঁ, মেরীই ফিস-ফিস করে তাকে কী বলছে।

ফিলিপ ছুটে পালাতে গিয়ে, বরফের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে জ্ঞান হারালো।

* লেখিকার জীবনী : পূর্ববর্ত্তী গল্পে দেওয়া হয়েছে।

দি করপ্‌স অ্যাট দ্য টেবল

স্যামুয়েল হপকীন্স অ্যাডামস

"দেখা গেল। তৃতীয় বারের মত বন্ধুর মৃতদেহকে সমাধি দেবার পর এস্টেলো আর বিছানায় যেতে বা ঘুমোতে সাহস পেল না।"

* * * * *

পর্বতের ওপর তুষার ঝঞ্ঝায় আটকে পড়া দুজন মানুষের সেই গল্পটা যখন প্রথম শুনি তখন আমি ভেবেছিলাম ওটা একটা অ্যাডিরণ্ড্যাক অঞ্চলের জনশ্রুতির গালগল্প ছাড়া কিছু নয়। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে সেটাকে আমি 'কলিয়ার্স' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি গল্পের ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম। সে সময় আমি এও ভেবে নিয়েছিলাম যে আসল ঘটনাটার সত্যাসত্য বিষয়ে প্রকৃত কোন সূত্র অবশ্যই উন্মোচিত হতে পারে। তখন থেকে আমি হ্যামিলটন কলেজের সহপাঠি অনেককে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছি, কেননা ওখানেই আমি এ কাহিনিটি শুনেছিলাম, কিন্তু যদিও অনেকেই ঘটনাটার কথা মনে করতে পেরেছে কিন্তু কেউই এর অরিজিন সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেনি। ফলে এটাকে কোন লোক-কথা, অর্থাৎ কপোলকল্পিত কাহিনী হিসেবেই মনে হয়েছে, যার সঙ্গে বাস্তবের কোন যোগাযোগ ছিল বলে সম্ভবপর মনে হয় নি। হয়ত বিস্মৃত কোন গল্পকার এটাকে অজ্ঞাত কোন মিডিয়ামে প্রচার করে

গিয়েছে। কিন্তু কে সে এবং কোথায়ইবা এর উৎপত্তিস্থল।

অক্টোবর মাসের এক প্রবল তুষার ঝঞ্ঝায় দুজন অপ্রস্তুত সার্ভেয়ার অ্যাডিরণড্যাক্স্ পর্বতের মধ্যস্থলে আটকা পড়ে যায়। তারা দুজন হল চার্লস কার্ণে এবং স্টিফেন এস্টেলো। দুজনেই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং বন্ধু। প্রবল ঝঞ্ঝা এবং তুষার পাতের মধ্য দিয়ে সারাটা দিন তারা কঠোর লড়াই করে করে এক এক পা করে পথাতিক্রম করছিল। উভয়ের মধ্যে শক্তিশালী ও যুবক বয়সী এস্টেলো ক্ষীণ দুর্বলদেহী এবং চরম ক্লান্ত বন্ধু চার্লস কার্ণেকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

দিনের আলো কমে আসতে একটা আশার আলো দেখে এস্টেলে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

—লাইন! টেলিগ্রাফের লাইন! টেলিগ্রাফের তার!

—তাই বুঝি, কিন্তু কোথায়, কত দূরে? কাশতে কাশতে ক্লান্তি ও দুর্বলতায় অর্ধমৃত কার্ণে বলে ওঠে, আমি একটা আশ্রয় চাই, আমি একটা আশ্রয় চাই, আমি একটু ঘুমোতে চাই। চোখ আমার ভেঙ্গে আসছে।

—না ভেঙ্গে আসলে চলবে না, আদেশের সুরে এস্টেলো বলে উঠে, ওই টেলিগ্রাফের লাইনই গত বসন্তকালে গভর্ণমেণ্ট সার্ভে ডিপার্টমেণ্ট তৈরী করে ছিল পাহাড়ের ওপরকার নির্জন কেবিন থেকে নিচেকার নর্থ ক্রীকের রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত। আমাদের এখন একমাত্র কাজ হল পাহাড়ের ওপর উঠে যাওয়া। যত কষ্টই হোক না কেন ওপরে উঠে যেতেই হবে। চলো, চলো, কাম্ অন্।

এস্টেলো হাত ধরে প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো তার দুর্বল ক্ষীণ কলেবর বন্ধুকে পায়ে পায়ে চড়াই ভেঙ্গে। প্রচণ্ড তুষার ঝঞ্ঝায় অন্ধ হয়ে যাবার দাখিল, তবুও, তবুও, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। মরণপণ এই আরোহণ কর্মে আধঘণ্টার মধ্যে তারা এসে পর্বতশীর্ষের নির্জন নিরালা কেবিনটিতে পৌঁছলো।

তাদের ভাগ্য খুবই ভাল বলতে হবে। কেননা কেবিনটিতে প্রচুর জ্বালানী কাঠ মজুত ছিল। কিছু শুকনো লতাপাতাও ছিল শেলফের

ওপর। ঝড়ে বিপন্ন গাছে ওঠা একটা শজারু বিদঘুটে চিৎকার করে উঠলো।

এস্টেলো রিভলবারের গুলি করে সেটাকে মেরে ফেললো। খাদ্যাভাব তথা উপোষের আতঙ্কই এখন সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয়।

এর মধ্যেই দেখা গেল কার্ণে প্রবল জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এস্টেলো স্টোভ জ্বালিয়ে দিয়ে কার্ণেকে ভেতরকার ঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। সকালে হয়ত সে কিছুটা ভাল হয়ে উঠবে।

সবচেয়ে আশার কথা হল টেলিগ্রাফ লাইন। টেলিগ্রাফ করা কার্ণে জানে। যদিও সাংঘাতিক দুর্বল দেহ তবু সারারাত্রি বেদনার পর সকালে কোন রকমে উঠে কার্ণে টেবিলে গিয়ে সুইচ টিপলো।

নর্থ ক্রীকের অপারেটার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল যখন সেই নির্জন নিরালা পর্বতশীর্ষ থেকে সে প্রথম 'কল' পেল। থেমে থেমে আসা সে কোড্ বুঝতে তার অসুবিধে হল না। দুজন মানুষ পর্বতশীর্ষে প্রবল তুষার ঝঞ্ঝায় আটকে পড়েছে। সর্বনেশে ব্যাপার তাদের একজন ভয়াবহ নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত। ঈশ্বর ওদের রক্ষা করুণ। মানুষের অসাধ্য সেখানে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া। অন্তত এই তুষার ঝঞ্ঝা চলাকালীন তো নয়ই। সকাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝঞ্ঝা যেন আরও উদগ্ররূপ ধারণ করলো। ক্রমশই বাড়ছে সেই সর্বনাশা ঝড়। প্রায় চব্বিশঘণ্টা পর আরেকটি 'ম্যাসেজ' তারের মাধ্যমে এল। সে বার্তা প্রলাপের ধাক্কায় অসংলগ্ন। কেবিনটি নাকি জঘন্য জন্তুদের দ্বারা আক্রান্ত, সঙ্গে রয়েছে শ্বেত ডানাওয়ালা এঞ্জেলগণ, যাদের ভয়াল দৃষ্টি ঝড়ের মধ্যেও জ্বল জ্বল করে প্রজ্জ্বলিত হয়ে চলেছে। মোর্স-কোড অসংলগ্নভাবে এসে পৌঁছলো ক্রীকে অবস্থিত অপারেটরের কানে।

এস্টেলো তার দুর্বল দেহী বন্ধুকে টেনে নিয়ে গেল বিছানায়। পরদিন সকালে একের পর এক কার্ণে কোন ক্রমে এসে উপস্থিত হতে লাগলো টেলিগ্রাফ যন্ত্র থাকা টেবিলে। যন্ত্রে হাত রেখে উলটো পালটা কোডে টেলিগ্রাফ করে যেতে লাগলো সে। কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য নর্থক্রীক সে 'কল' পেল না। টেলিগ্রাফ লাইন ডেড হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ঝড়

ও তুষারাঘাতে সে লাইন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন।

সন্ধ্যের দিকে এস্টেলো প্রলাপগ্রস্থ-তার অসুস্থ-সঙ্গীকে ফের জোর করে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল, অতঃপর সে কেবিনের বাইরে বেরিয়ে গেল জ্বালানী কাঠের সন্ধানে। ফিরে এসে দেখলো কার্ণে বসে আছে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের টেবিলে। ভাবলেশ হীন তার মুখবয়ব।

—স্টিভে, অসুস্থ বন্ধুটি ধীর স্বরে বলে যায়, স্টিভে, আমি অচিরেই মরে যাব। কিন্তু··· স্টিভে, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত না হও আমি পুরোপুরি মরে গেছি, প্লিজ আমাকে যেন কবর দিও না। জীবন্ত কবর দিও না আমাকে ভাই। বলতে, গিয়ে তার কণ্ঠ—বেদনায় কেঁপে কেঁপে উঠলো।

এস্টেলো নির্বাক দৃষ্টিতে বেদনার্ত্ত হৃদয়ে সে কাতর মিনতিতে সমর্থন জানালো।

এর পর, দিনের পর দিন যা ঘটেছিল এস্টেলো বিশ্বস্ততার সঙ্গে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তার ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করে রাখে।

সেদিন সন্ধ্যায় সে যখন 'স্টু' বানাচ্ছিল, বধ করা শজারুর শেষ অবশিষ্ট মাংস দিয়ে, তখন সহসা তার সেই সাংঘাতিক রুগ্ন বন্ধু টলতে টলতে উঠে গিয়ে বসলো টেলিগ্রাফ টেবিলে এবং সেখানেই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

নাড়ী পরীক্ষাএবং নাকের কাছে শ্বাস পরীক্ষা করে এস্টেলো বন্ধুর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হল।

দেহে রাইগর মটিস অর্থাৎ শক্তভাব লক্ষিত হতে এস্টেলো বুঝলো এবার মৃত বন্ধুটিকে সমাধিস্থ করার সময় হয়েছে। বাইরে গিয়ে কুড়োল দিয়ে বরফের মধ্যেই একটা গর্ত খুঁড়ে সে বন্ধুর দেহ সেখানে প্রোথিত করে, বরফ চাপা দিয়ে বিড় বিড় করে অন্তিম প্রার্থনা উচ্চারণ করলো।

সে রাত্রিটা তার এক চরম দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটলো। চরম ভীত হয়ে এক সময় তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলো কাল ঘামে তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে সেই চরম শীতের মধ্যেও।

সকালে সে যখন উঠে গিয়ে আগুনটাকে উসকে দিতে গেল, তখন সবিস্ময়ে সে দেখলো তার মৃত বন্ধু কার্ণে সেই টেলিগ্রাফের টেবিলে বসে আছে অনড় বাকরুদ্ধ পলক হীন দৃষ্টিতে।...

সারাটা দিন তার কাটলো এক অবর্ণনীয়, চরম আতঙ্ক প্রায় দুঃস্বপ্নের মধ্যে। এস্টেলো বন্ধুর মৃতদেহটাকে স্পর্শ না করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল খাদ্যের সন্ধানে।

সন্ধ্যার পর, মনোবলকে আস্বাভাবিক রকম চাঙ্গা করবার চেষ্টা করে বসে থাকা চার্লস্ কার্ণের মৃত দেহকে জাপটে ধরে নিয়ে গিয়ে বাইরেকার সেই অপর্যাপ্ত সমাধিতে পুনরায় সমাধিস্থ করে এল। তার কাঁধে ঝোলানো ফ্লাস্কে অর্ধসমাপ্ত ব্রাণ্ডি ছিল। সেটা এক ঢোকে পান করে সে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

সকাল বেলা পাশের ঘরে যেতে আবারও তাকে অসম্ভব রকম সাহস সঞ্চয় করে নিতে হল বুকের মধ্যে। প্রায় এক মিনিট প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় নিজ ঘরের মধ্যে কম্পিত অবস্থায় সে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর এক ঝটকায় পাশের ঘরের দরজা খুলে দেখলো। দেখা গেল চার্লস কার্ণে ঠিক পূর্বের মতই বসে রয়েছে টেবিলটার সামনে—আমার মস্তিস্ককে শেষ পর্যন্ত সুস্থ রাখতেই হবে, রাখবই, এস্টেলো তার রেকর্ডে লিখেছে, যদি ও আবার ফিরে আসে, তাহলে কি করব, এবং কি করতে হবে তা আমার ভাল ভাবেই জানা।

পুনরায় সে সারাদিন কাঠ সংগ্রহের কাজে বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিল। উথল পাথাল চিন্তায় মন তার বিব্রত। তবে কি সে ভীতিপ্রদ কোন দুঃস্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়েছে। না, সে অবশ্যই উম্মাদ হয়ে যায়নি এখনো। সে কেবিনে ফিরে এসে এক ধাক্কায় দরজা হাট করে খুলে দেখলো।.

দেখা গেল চার্লস কার্ণে পূর্ববৎ সেখানে তেমনি বসে আছে। তৃতীয় বারের মত বন্ধুর মৃতদেহকে সমাধি দেবার পর এস্টেলো আর বিছানায় যেতে বা ঘুমোতে সাহস পেল না।

টেবিল এবং সেই খালি চেয়ারটার অদূরে বসে অতি কষ্টে চোখের

পাতা খোলা রাখবার অর্থাৎ বিনিদ্র থাকবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু চরম ক্লান্তিরই বুঝি জয় হল। তার মাথা এক সময় সামনের দিকে ঝুলে পড়লো…।

ধূসর সকালের আলোতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরের অবস্থা আলোতেও সে স্পষ্ট দেখতে পেল চার্লস কার্ণে সেই খালি চেয়ারটায় তেমনি বসে রয়েছে। মৃত চোখের দৃষ্টি তার নিষ্পলক ও শূন্যপানে তাকালো।

—ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুণ, এস্টেলো লিখে রাখলো। সেটাই তার শেষ ডাইরী লেখা।

দুজন কাঠুরে, একজন চিকিৎসক এবং ক্লার্ক নামক নর্থ ক্রীক টেলিগ্রাফ অপারেটরকে দিয়ে যে উদ্ধারকারী দল গঠিত হল, তারা তুষার-জুতো পরে চরম ক্লান্ত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছলো পর্বত শীর্ষের অভিশপ্ত কেবিনে। কোন জীবনের চিহ্ন সেখানে ছিল না। চিমনী দিয়ে কোন ধোঁয়াও নির্গত হচ্ছিল না। কেবিন থেকে তুষারের ওপর দিয়ে পায়ের চিহ্ন গিয়েছে একটা অদ্ভুত গর্তের দিকে। ডাক্তার ঠেলে কেবিনের দরজা খুললো। অভ্যন্তরভাগ নিস্তব্ধ এবং কনকনে শৈত্যে আচ্ছন্ন। টেবিলের দুপাশে বসে রয়েছে দুজন প্রাণহীন মৃতব্যক্তি।

দুজনের মাথা ভেদ করে গেছে দুটি গুলি। এস্টেলোর রক্তাক্ত মাথা ঝুলে পড়েছে সামনের দিকে। সে রক্ত শুষ্ক এবং কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ। তার ডান হাতের তলায় মেঝের ওপরে পড়ে রয়েছে রিভলবারটি। কার্ণে সোজা হয়ে বসে রয়েছে তার চেয়ারে। তার চোখ খোলা এবং অভিব্যক্তি শান্ত।

—মার্ডার এবং আত্মহনন, টেলিগ্রাফার আর্তকণ্ঠে বলে উঠে, অসহায় বেচারারা।

ডাক্তার দেহ দুটি পরীক্ষা করছিল, বললে, না, মার্ডার নয়। সে কার্ণের কপাল স্পর্শ করলো, এখানে কোন রক্ত নেই। যখন গুলি করা হয় তার আগেই লোকটি মৃত ছিল। আর আমার মনে হয় জমে যাওয়া শব।

হতবাক অবস্থায় পরস্পর চাওয়া চাওয়ি করলো উদ্ধারকারী দল।

একজন কাঠুরে এস্টেলোর ডাইরী কুড়িয়ে পেয়ে তুলে নিল এবং সেটা ডাক্তারকে দিল। সে কিছুটা পড়ে নিয়ে কেবিনের বাইরে গিয়ে তুষারের ওপর পদচিহ্ন নিরীক্ষণ করতে লাগলো।

ফিরে এসে ডাক্তার পাইপ ধরিয়ে কিছুক্ষণ গভীর চিন্তামগ্ন থাকলো, তারপর একসময়ে বলে উঠলো।

—বন্ধুগণ মৃতদের পরিবারের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি অনুরোধ করছি এ ব্যাপারটা যেন সম্পূর্ণ গোপন থাকে। আমি একজন করোনার। আমার অফিসিয়াল সিদ্ধান্ত বা রায় হল চার্লস কার্ণে এবং স্টিফেন এস্টেলো এই দুজনের মৃত্যু হয়েছে প্রবল শৈত্য, অদম্য ক্ষুধা এবং নির্জনতার ফলে। ব্যাপারটা আপনারা বুঝলেন তো?

একে একে প্রত্যেকে এ কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো, তখন নথক্রীকের টেলিগ্রাফার বিহ্বল ও জড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো।

—যদি জানতে পারতাম কি ভাবে এদের মৃত্যু হল তাহলে হয়তো শান্তিতে ঘুমতে পারতাম।

—আমিও তাই, ডাক্তার এর জবাবে বলে উঠলো, আমরা শুধুমাত্র অনুমান করতেই পারি। আমার মনে হয় কার্ণের মৃত্যুর শক্‌ এবং নিরালা থাকবার আতঙ্ক এস্টেলোকে স্লিপ ওয়াকিং এ রূপান্তরিত করেছিল। যদি জানতে পারি যে সে শৈশবেও স্লিপ ওয়াকার ছিল তাহলে আমি প্রকৃতই নিশ্চিত হই। আমি যা বুঝেছি তাহল ঘটনা ঘটেছে নিম্নরূপ। রাত্রিতে এস্টেলো ঘুমের মধ্যেই স্লিপ ওয়াকিং করে কবর থেকে বন্ধুর মৃতদেহ তুলে এনে যেখানে সে বন্ধুকে প্রথম মরে বসে থাকতে দেখেছিল সেখানে এনে বসিয়ে দিত। কারণ কি? এর উত্তর কেউ জানে না। বোধ করি তার মত অসহনীয় নির্জনতাই এ কাজ তার দ্বারা করিয়েছে। আরেকটা কারণ হল বন্ধুর অনুরোধ ছিল সে যেন তার প্রকৃত মৃত্যু-সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে তাকে কবর না দেয়, এ ভাবনাটাই তার অবচেতন মনে যে প্রতিক্রিয়া করেছিল তারই প্ররোচনায় সে এ ধরনের কাজ করে গিয়েছিল। মৃতদেহে গুলি করার ব্যাপারটাও সে কথাই প্রমাণ করে। সে যাই হোক কবর থেকে মৃতদেহ এ কারণেই বহুবার তুলে আনা হয়েছিল?

হয়ত কোন এক অব্যক্ত মানসিকতা দ্বিতীয়বার মৃতদেহ তুলে আনবার সময় তাকে সাবধান করে দিয়েছিল যে সে যেন চেতনা না হারায়। কিন্তু প্রকৃতির প্রবল প্রভাব এড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। সে ঘুমিয়ে পড়ে। অবশেষে তার মনোবল ভেঙে পড়ে এবং অতিষ্ঠ ও মরিয়া হয়ে সে মৃতদেহে গুলি করে এবং নিজেকেও গুলি করে খতম করে দেয়। মনো-যন্ত্রণা তার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

এ্যস্টলোর ডাইরীটাকে পুড়িয়ে ফেলে উক্ত দুটি মৃতদেহকে পার্বত্য এক লেক-এ ফেলে দেওয়া হয়।

স্যামুয়েল হপকীন্স অ্যাডামস্‌ঃ যে সমস্ত সাহিত্য-সেবী সাহিত্যের সোনালী আঁচরে রহস্য সাহিত্য ও অলৌকিক সাহিত্যের অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন লেখক তাঁদের অন্যতম। ইংরাজী ভাষার বিচিত্র-মুখী গতিময়তার বেগ ও আবেগে স্যামুয়েল হপকীন্স অ্যাডামস্‌ এক অভিনব সংযোজন। মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের অনুপুঙ্খ বিচারে কল্প কুহেলী রচনায় তাঁর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের আহ্লাদিত করে। লেখক আধুনিক বিজ্ঞান ও মনস্তত্বের তত্বগুলিকে অসাধারণ দক্ষতায় লৌকিক ও ভৌতিক গল্প রচনায় ব্যবহার করেছেন কুশলী কলাকারের রূপালী হস্তাবলেপনে।

ট্রেণের সেই মেয়েটি

THE GIRL IN THE TRAIN

আয়ন ফেলোজ গর্ডন
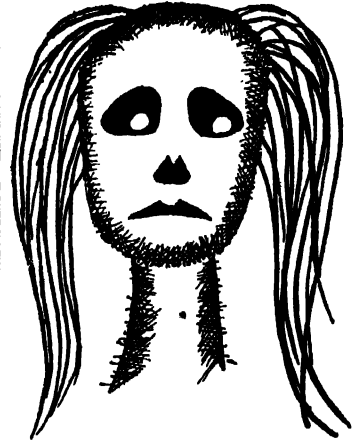
"মেয়েটি একদৃষ্টে জানালার বাইরের সেই রুক্ষ সহরের দৃশ্যপটের দিকে চেয়ে দেখছিল যেন সে শেষবারের মত সব কিছু দেখে নিচ্ছে। সব কিছু খুটিনাটি শুষে নিচ্ছে। সব কিছুর ছাপ নিজের মনে এঁকে নিচ্ছে।"

*　　　*　　　*

একদা সন্ধ্যেবেলা আমার এক বন্ধু গল্পটা বলেছিল। তার নাম সে বাইরের লোককে জানাতে চায় না। কারণ সে একজন নামজাদা মানুষ। তার নাম করলে সবাই চিনে ফেলবে তাকে। পেশাতে সে একদা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক। যুদ্ধের পরেই লনডনের একটা ডাক্তারি পড়ানোর কাজ নিয়েছিল, আর আমার ক্লাবে প্রায় তার সঙ্গে আমার দেখা হতো। একদিন আমরা একসঙ্গে ডিনার খেয়েছিলাম এবং শুতে অনেক রাত হয়েছিল। তখনই তার কাছ থেকে এই গল্পটা শুনি।

আসলে গল্প বলার জন্য সে গল্পটা বলেনি। হচ্ছিল সাধারণ ভাবে রেল পরিচালনার কথা। সেই প্রসঙ্গেই উঠলো এই গল্পটা, আর তখনই আমি বাকি গল্পটা শোনবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। সেদিন আমিই তাকে খাইয়েছিলাম, তাই বোধহয় আমার ওপর কৃতজ্ঞ ছিল, আর সেই কারণেই সে আমার অনুরোধ এড়াতে পারেনি।

কিন্তু সেদিন খানিক পরে আমার মনে হয়েছিল, গল্পটা শোনবার জন্যে অত পীড়াপীড়ি করা আমার অন্যায় হয়েছিল। কারণ অধ্যাপক বন্ধু যখন গল্পটা বলছিল তখন তা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল সে যেন গল্পের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্যে আবার নতুন করে জড়িয়ে যাচ্ছিল। সে যখন তার মুখের নিভন্ত চুরোটটা নতুন করে জ্বালাতে যাচ্ছিল তখন তার হাত দুটো থর-থর করে কাঁপছিল, একটা পায়ের ওপর অন্য পা'টা রাখতে গিয়ে কেমন যেন এক অস্বস্তিতে টেবিলের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল।

আমি তা দেখে বললাম—থাক্ থাক্, সে গল্প বলতে যদি তুমি এতই বিচলিত হয়ে পড়ো, তাহলে বলতে হবে না থাক্!

—না, না, আমি বলবোই, আমার মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে এখন আবার আমার সব মনে পড়ছে কিন্তু সে গল্পটা আজ পর্যন্ত আমি অন্য কাউকে বলিনি, কাউকে না—

তারপর আস্তে আস্তে, থেকে থেকে সে বলতে আরম্ভ করলো। আমার বন্ধুটির কথা বলার এক-রকম কায়দা আছে। সব সময়ে কথা বলতে গিয়ে সে বাছা-বাছা শব্দ ব্যবহার করে। ওই রকম কথা বলার কায়দার জন্যে সর্বত্র তার খ্যাতিও আছে। কিন্তু সেদিন কী হলো, কথা বলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খেতে লাগলো। সব টা শুনে আমি তার অনুমতি চেয়ে নিলাম যে গল্পটা আমি লিখবো। আমার বন্ধু সে-অনুমতি দিলে কেবল একটা শর্তে যে আমি সেই কাহিনীর পাত্র পাত্রী ও অন্যান্য চরিত্রদের নাম বদলে দেব।

সাল ১৯৪৫, মাসটা হলো ডিসেম্বর। যুদ্ধ শেষ হবার পর বেশি দিন যায়নি। আমার বন্ধু এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকগুলো বক্তৃতা দেবার জন্যে লনডন উত্তরাভিমুখে যাচ্ছিল। বিশেষজ্ঞ হিসেবে নাম ডাক চারদিকে খুব ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও অবশ্য তার পাঁচ বছর পরে সে 'নাইট' উপাধি পেয়েছিল। সে সেদিন যে-ট্রেণটাতে উঠেছিল সেটা বিকেল চারটেয় 'কিংস-ক্রস' ছেড়ে মাঝ রাতে ওয়েভারলি ষ্টেশনে পৌছোবার কথা। আমার বন্ধুটির আর্থিক অবস্থা যদিও ভালই ছিল তবু টাকা-

পয়সার ব্যাপারে তার একটু হাত-টান ছিল, তাই সে ট্রেনে এমন একটা টিকিট কেটেছিল যাকে তখনকার দিনে বলা হতো 'থার্ড-ক্লাশ,' অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণী। কারণ তখন কোনও অযৌক্তিক কারণে 'সেকেণ্ড-ক্লাশ' নামক বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। সেটা বুধবার; ট্রেণটা বলতে গেলে খালিই ছিল। আর বলতে গেলে ট্রেণটা ছাড়বার পাঁচ মিনিট আগে ট্রেণের যে-কামরায় সে উঠেছিল সেটা ঠিক তাই-ই ছিল। সে ঠিক তার বসবার উল্টোদিকের বার্থে তার বই আর যন্ত্রপাতি ভরা বাক্সটা আর একটা সুটকেস রেখেছিল। সেদিকে একটা জানালা ছিল। সুষ্ঠু আর অসামাজিক একটা উদ্দেশ্য ছিল তার এই যে সেই বার্থে যেন কেউ না বসে, বা বসতে উৎসাহী না হয়।

ঠিক ট্রেণটা যখন ছাড়ছে তখনই একটা মেয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে উঠলো। একটু বিরক্ত হয়ে বন্ধুটি ট্রেণের দরজাটা বন্ধ করে দিলে। আর মেয়েটি তখন একটু দম নিয়ে মেয়েটি কামরার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। তার হাতে ছিল ছোট রাত কাটাবার সাজসরঞ্জাম ভর্তি একটা 'ওভারনাইট কেস' আর একটা হাতব্যাগ। ওভার-নাইট কেসটা সীটের ওপর রেখে মেয়েটা সেখানে ধপাস করে বসে পড়লো, তারপর হাত-ব্যাগটা রাখলো কোলের ওপর। আমার বন্ধুটি চোখ তুলে সেদিকে চেয়ে দেখলে। কবে হয়ত মেয়েটি একদিন 'ক্লোকেলি-অব-সী' বেড়াতে গিয়েছিল, তার ছাপটা তখনও লেখা আছে কেস-এর গায়ে, অবশ্য তখন তা প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

মেয়েটি বন্ধুটির দিকে ঝুঁকে বললে—আপনি দয়া করে আপনার জিনিস-পত্রগুলো একটু সরিয়ে নেবেন?

অধ্যাপক বন্ধুটির একটু রাগ হলো। মেয়েটির বয়েস বড়জোর উনিশ। কামরায় আরো চারটে সীট রয়েছে। সে তাদের মধ্যে যে-কোনও একটিতে বসতে পারতো, তাছাড়া ট্রেণে আরো অন্য অনেক কামরা রয়েছে, সেখানেও নিশ্চয় অন্য অনেক জায়গা খালি আছে। সে আর কিছু না বলে একটু বিরক্তি প্রকাশ করে তার জিনিস-পত্রগুলো মাথার ওপরের র‍্যাকে তুলে রাখলে।

মেয়েটা বললে—ধন্যবাদ—

বলে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। প্রফেসার এতক্ষণে লক্ষ্য করে দেখলে মেয়েটা সুন্দরী, সুশ্রী। সুন্দর ঘন চুল মাথায়। আর মুখটাও লালচে। ট্রেণের কামরার অল্প আলোয় লালচে রংটাকে কালো বলে মনে হচ্ছিল। তার মুখখানার চেহারাটা যেন ফ্যাকাসে। তার পরণে ছিল বাদামী স্কার্টের ওপর কোট। দেখে মনে হয় বেশ ভাল দরজির হাতের তৈরি আর খুবই দামী। গলায় ছিল মাঝারি দামের একটা মুক্তোর মালা। আর পায়ের জুতো জোড়ার ওপর স্পষ্ট অক্ষরে লেখা ছিল 'এ-টি-এস'। এই 'এ-টি-এস' মার্কা জুতোগুলো যুদ্ধের সময় গাদা-গাদা তৈরি হয়েছিল। এত তৈরি হয়েছিল যে কাপড়-জামা কেনবার জন্যে সরকার যে কুপন দিত, তা ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই ওই মিলিটারির জন্য তৈরি 'এ-টি-এস' মার্কা জুতোই পরতে হয়েছিল তাকে।

এ ছাড়াও মেয়েটা যে অন্তর্বাস পরে আছে সেটাও যুদ্ধের জন্যে তৈরি জাল। গরম প্যাণ্ট্। হাতের 'ইভ্‌নিং স্ট্যান্‌ডার্ড' খবরের কাগজটা পড়তে পড়তে এটাও সে লক্ষ্য করলে যে মেয়েটির শরীরের নিম্নাংশটাও খুবই ছোট মাপের। কিন্তু অত কম আলোয় খবরের কাগজ পড়াও অসাধ্য বলে মনে হলো তার কাছে।

সে চোখ তুলতেই দেখলে মেয়েটির মুখে হাসি। তার দিকে চেয়েই মেয়েটি হাসছে। কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্যে। তারপর সে আধ-খোলা জানালার দিকে এগিয়ে গেল। গিয়ে অর্দ্ধেক মাথাটা জানালার বাইরে বাড়িয়ে দিলে। বাইরের হাওয়ার ঝাপ্‌টায় তার মাথার সেই চুল এলোমেলো হয়ে গেল। কামরাটা ছিল ঠিক ট্রেণের সামনের দিকে। তাই মেয়েটার চুলের ওপর ইঞ্জিনের ফায়ার-বক্সের আগুনের রং লাগছিল। তার সঙ্গে পাতলা কুয়াশার আস্তরণ মিশে একটা অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। মনে হচ্ছিল উত্তর-লন্‌ডনের চলমান অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূ-দৃশ্যের ওপর কে যেন বরফের একটা স্বচ্ছ আস্তরণ বিস্তার করে দিয়েছে। তখন বেশ ঠাণ্ডা শীত-শীত করছে। কুয়াশাটা ক্রমে বাড়বে। ট্রেণটা ঠিক সময়েই পৌঁছাবে এইটেই সে আশা করতে লাগলো। কারণ পরের দিনে অনেকগুলো বক্তৃতা দেবার আছে, অনেকগুলো সাক্ষাৎকারের পরিশ্রম

আছে। ট্রেণ ঠিক সময়ে ওয়েভারলি পৌঁছোলে সে তার আগে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারবে।

মেয়েটি একদৃষ্টে জানালার বাইরের সেই রুক্ষ সহরের দৃশ্যপটের দিকে চেয়ে দেখছিল। যেন সে শেষবারের মত সব কিছু দেখে নিচ্ছে। সব কিছু খুঁটিনাটি শুষে নিচ্ছে। সব কিছুর ছাপ নিজের মনে এঁকে নিচ্ছে। সামনের এঞ্জিনের লাল আভা লেগে সুন্দর মাথার চুল লালচে পেঁয়াজি রং-এ রূপায়িত হয়ে গেছে।

মেয়েটি প্রফেসারের দিকে একবার চাইলে, হয়ত কিছু কথাও বলতে গেল, কিন্তু তা না করে আবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। আমার অধ্যাপক বন্ধু তখন আবার 'ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকাটা পড়বার চেষ্টা করতে গেল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তখন চোখ দুটো বন্ধ করে রইল।

বোধহয় খানিকক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। কারণ হঠাৎ মেয়েটির গলার শব্দে তার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। মেয়েটি যেন কাকে বলছে—কী বলছো তুমি? তুমি কি তাই চাও?

প্রফেসার এক ঝট্‌কায় জেগে উঠে বসলো। দেখলে ট্রেণটা একটা ষ্টেশনে থেমে গেছে। যখন আবার আধ-বোজা চোখে দেয়ালে হেলান দিয়ে ভাবতে লাগলো কোথায় আছে সে। ভাবতে চেষ্টা করলে কে কথাগুলো বললে। তারপর যখন আবার ট্রেণটা চলতে আরম্ভ করলো চাকার ঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের ধোঁয়া ছাড়ার শব্দ হতে লাগলো তখন পুরোপুরি জেগে উঠলো। সে ভালো করে উঠে বসে অন্ধকারের দিকে চেয়ে দেখলে। একটা সাইনবোর্ড নজরে পড়লো। তাতে ষ্টেশনের নাম লেখা রয়েছে "পিটারবরো।" তার মানে সে এর মধ্যেই পুরো দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছে।

মেয়েটি এবার জানালার বাইরে থেকে মাথাটা ভেতরে টেনে নিয়ে এসে নিজের জায়গায় বসলো। অবাক কাণ্ড যে মেয়েটি কিনা তার বন্ধুর দেখা পেয়ে গেছে এই প্ল্যাটফরমে। তার হাসি পেল, কিন্তু মেয়েটি তা লক্ষ্য করেনি বোঝা গেল। মেয়েটির চোখ জোড়া তখন বিস্ফারিত।

ঠিক তার ঠোঁটের মতই বিস্ফারিত। আর চোখ জোড়া কামরার আবছা অন্ধকারের মতই কালো। মনে হলো তাদের রংও তার চেহারার রং-এর সঙ্গে কখনও নীল বা ধূসর হয়ে উঠবে। সেই চোখ জোড়া তখন তাকেই দেখছিল। আর শুধু কেবল দেখছিল না তার দৃষ্টি বন্ধুকে বিদ্ধ করছিল বলা যায়।

অধ্যাপক বন্ধুটি লক্ষ্য করলে মেয়েটি তার দিকে চেয়ে প্রায় কেঁদে ফেললে। বললে—আমি কী করি, কী করি আপনি বলতে পারেন?

বন্ধুটি কিছু বুঝতে পারলে না। বললে—তার মানে? কীসের কী করবে?

মেয়েটি বললে—ও আমাকে ট্রেণ থেকে নেমে যেতে বলছে।

—কে? কে নেমে যেতে বলছে তোমাকে?

—যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। তার সঙ্গে আমার বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে।

বন্ধুটি বললে—ও—

তা ছাড়া আর কীই বা বলবার ছিল।

মেয়েটি আগের কথার জের টেনে বললে—ও ওই কথাই আমাকে বললে, শেষ যে ষ্টেশনে ট্রেণটা থেমেছিল সেখানে।

বন্ধুটি বললে—যার সঙ্গে তোমার বিয়ে সে ওই ষ্টেশনেই ছিল নাকি? ওই পিটারবরোতে?

বন্ধুটি এবার উঠে বসলো। সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করলে।

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ আপনি তাকে দেখতে পাননি, আপনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন।

—তা হতে পারে ঘুমোচ্ছিলামই বটে!

মেয়েটি বললে—ও একেবারে জানালার খুব কাছে এসেছিল, একেবারে খুব কাছে। মানে ট্রেণটা ছাড়বার আগে পর্যন্ত সে আমার কাছাকাছি এসেছিল, আর আমাকে ট্রেণ থেকে নেমে যেতে বলছিল—

বন্ধুটি বললে—এ-সব তোমার আজগুবি কল্পনা নয় তো? তুমি ঠিক

জানো তুমি ঠিক লোককেই দেখেছ? যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার কথা সে পিটারবরো ষ্টেশনে কী করতে আসবে? তুমি তো তার সঙ্গে দেখা করতেই এডিনবারায় যাচ্ছো, তাই না?

কথাটা আমার বন্ধু আন্দাজেই বলেছিল। আর সত্যিই কথাটা তাই-ই।

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। সে আমার জন্যে এডিনবারা ষ্টেশনেই অপেক্ষা করবে।

কথাটা বলেই মেয়েটি হঠাৎ হেসে উঠলো। তাকে হাসতে দেখে মনে হলো তার মনের সব ভয় যেন কেটে গেছে। এতক্ষণ যে-সমস্যা তাকে অস্থির করে তুলছিল তা যেন ভুলে গেছে।

বন্ধুটি বললে—দেখ, যা-কিছু তুমি এতক্ষণ দেখেছিলে শুনেছিলে সমস্তই নিছক তোমার কল্পনা। এক-এক সময় কুয়াশা (fog) বড় বিচিত্র মানুষের মনে বিভ্রম সৃষ্টি করে। কুয়াশার মধ্যে আমরা এমন সব জিনিস দেখি আসলে যার কোনও অস্তিত্বই নেই। কখনও কখনও তা যেমন দেখতে পাই তেমনি আবার কানেও শুনতে পাই—

তারপর একটু থেমে বললে—এসো এক কাজ করি, চলো দু'জনে ডাইনিং-কারে গিয়ে কিছু খেয়ে নিই গে। আর কিছু না হোক, সেখানে এর চেয়ে বেশি আলো পাবো। আলোয় গেলে তোমার মনটাও হাল্কা হয়ে যাবে—

মেয়েটি বন্ধুর প্রস্তাবে রাজি হলো। তারপর তারা দু'জনে সেই চলন্ত ট্রেণের ভেতর দিয়ে পেছনের ডাইনিং-কারের দিকে আস্তে আস্তে চলতে লাগলো।

এক ঘণ্টা পরে তারা আবার তাদের কামরার দরজার সামনে ফিরে এল। দরজাটা যখন টেনে খুললো তখন ট্রেণের গতি আবার কমে এলো। তার একটু পরেই ট্রেণটা একেবারে থেমে গেল।

এবার যে ষ্টেশনে এসে ট্রেণটা থামলো তার নাম 'গ্র্যান্থাম'।

অবশ্য এটা আন্দাজ করে বুঝতে হলো, কারণ কুয়াশার জন্যে বাইরের কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল না। 'নেহাৎ বন্ধুটির এ-দিককার সব রাস্তা

খুব চেনা তাই সে ষ্টেশনটার লেখা নাম না দেখেই চিনতে পারলে। খাবারটা ছিল জঘন্য। কী এক রকম নাম-না জানা মাছের চট্‌চটে ঝোল। তবু সেই অবস্থায় খেতে ভালোই লেগেছিল। ডাইনিং-কারের ভেতরে বেশ উষ্ণ আরাম তখন। আলোটারও তেজ ছিল। বোধহয় সেই জন্যেই মেয়েটি নিজের মনটাকে নিঃসঙ্কোচে খুলে ধরলো ঠিক ফুলের পাপড়ির মতো। নিজের সম্বন্ধে সব কথা অকপটে বলে গেল বন্ধুটির কাছে। মোনা সিন্‌ক্লেয়ার। ওইটেই মেয়েটার নাম। বন্ধুটিও অনেক প্রশ্ন করতে লাগলো মোনাকে। কারণ সত্যিই মেয়েটি সম্বন্ধে জানতে তার খুব কৌতূহল ছিল। মেয়েটি জানালো সে আসলে স্কটল্যাণ্ডে জন্মেছে, কিন্তু চাকরি করে লণ্ডনের একটা অফিসে। সেখানে সে সেক্রেটারি। থাকে 'হাইগেট' নামের একটা অঞ্চলের বস্তি-বাড়িতে। একজনের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। তারই নিদর্শন হিসেবে মেয়েটির আঙুলে একটা হীরের আংটি। যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে সে 'ব্ল্যাক ওয়াচ' নামে সৈন্যদলের একজন লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট। মেয়েটি তার হাতের ব্যাগ খুলে তার ভেতর থেকে একটা রঙিন ফোটো দেখালো। ফোটোটা তার প্রেমিকের। ফোটোটা দেখে বন্ধুটি বুঝতে পারলো তার প্রেমিকের বয়েস খুবই কম। কিন্তু ব্যক্তিত্বপূর্ণ। তবে রোগাও নয়, বরং দোহারা গড়ন। ঠোঁটের ওপরে একটু ঘন গোঁফ। মেয়েটির মতই ছেলেটিরও গায়ের রং ফর্সা। লালচে ফর্সা ঠিক নয়, একটু হলদে ঘেঁষা। মেয়েটির মতই ছেলেটির মাথার চুলের রং বালির রং-এর মত। দু'জনে খুবই মিলবে। সুখী দাম্পত্য জীবন হবে দু'জনের। তাদের ছেলে-মেয়েরাও বাপ-মায়ের মত দেখতে সুন্দর হবে। মেয়েটির নিম্নাঙ্গটা ছোট। সেটা স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে বন্ধুটি আগেই লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু তাতে কিছু আসবে-যাবে না।

হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো। উঠে জানালার দিকে গেল। বলে উঠলো—ওই শুনুন, আবার ডাকছে, আমি শুনতে পাচ্ছি—

এবার অসহ্য হয়ে উঠলো আমার বন্ধুটি।

বললে—কী যা তা বলছো? ওখানে কেউ নেই, সব বাজে কথা কেউ নেই—

কিন্তু মেয়েটি সে-কথায় কান দিলে না। বাইরের কার সঙ্গে যেন কথা বলতে লাগলো।

আমার প্রফেসার বন্ধুটির এবার নিজের কান আর চোখকেই অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো। সে সোজা হয়ে উঠে বসলো। তারপর জানালার বাইরে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলে। সেখানে কাউকে বিশেষ দেখা গেল না। চারদিকে কুয়াশা। কুয়াশার মধ্যেই যেন কিছু মূর্তি নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক ময়লা ঘোলা জলের ভেতরে মাছ খেলা করছে।

মেয়েটা আবার জানালার ভেতরে নিজের মাথাটা টেনে নিয়ে এল। কিন্তু চোখ দুটো বাইরের দিকে নিবদ্ধ রইল।

বন্ধুটির মনে হলো একটু আগে যে মেয়েটিব সঙ্গে সে ডাইনিং-কারে বসে কথা বলেছে খেয়েছে এ যেন সে নয়, অন্য কেউ।

মেয়েটি বললে—আমি যাবোই, আমাকে যেতেই হবে, ও বড্ড পীড়াপীড়ি করছে—

বলে মেয়েটি যেই কামরার দরজাটা খোলবার চেষ্টা করলে আমার প্রফেসার বন্ধুটি মেয়েটির হাতের কব্জিটা জোরে চেপে ধরলে।

বললে—তুমি পাগল হয়ে গেছ, এ তোমার কল্পনা। কেউ নেই বাইরে, একটা জন-প্রাণীও নেই, আর তা ছাড়া কারো গলার আওয়াজও শোনা যায়নি—

মেয়েটি হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

বললে—হাত ছেড়ে দিন, আমার বড্ড লাগছে—

আমার বন্ধুটি তার কথার জবাবে বললে—এ আর তোমার কত-টুকুই বা লাগছে, এর চেয়ে হাজার গুণ ব্যথা পাবে সে, সেই এ্যান্‌গাস, যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, যদি তুমি এই ষ্টেশনে ট্রেণ থেকে নেমে যাও। তুমিই তো বলেছ সেই এ্যান্‌গাস তোমার জন্যে ওয়েভারলি ষ্টেশনে অপেক্ষা করবে। সে তোমার পথের দিকে চেয়ে হাঁ করে সেখানে বসে আছে। সে এখানে কী করে আসতে যাবে, বলো?

বলে সে মেয়েটার হাত ছেড়ে দিলে।

মেয়েটা বললে—কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখুন না, সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন না? ওই যে ইউনিফর্ম পরা। দেখতে পাচ্ছেন না?

কিন্তু বন্ধুটি দেখলে সেখানে কেউ নেই। একেবারে জন-মানব শূন্য। এমন কি একটু আগে যে কুয়াশার ঘোলাটে দৃশ্যের মধ্যে ঝাপসা মূর্তিগুলো নড়ে উঠছিল সেগুলোও তখন আর নেই।

মেয়েটি তখন তার ব্যাগ আর ঝোলাঝুলি নিয়ে সত্যি সত্যিই দরজা খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে এক ধমক দিলে।

বললে—বোস, চুপ করে বসে থাকো। বোস বলছি!

ডাক্তার হিসেবে এই সব পাগল মেয়েদের চরিত্র সে ভালো করেই চিনতো। ভালো করেই জানা ছিল এই সব চরিত্রদের।

মেয়েটাও যেমন কেমন মিইয়ে গেল মন্ত্রমুগ্ধের মত। আর ট্রেণটাও ছেড়ে দিলে। আমার বন্ধুটির ভয় ছিল হয়ত মেয়েটা দরজা খুলে বাইরে যাবে, তাই দাঁড়িয়ে উঠে দরজার দিকে পেছন করে রাস্তা আট্‌কে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণের জন্যে মনে হলো মেয়েটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। তারপর যখন মেয়েটা আবার বন্ধুটির চোখের দিকে চাইলে, সে বললে—দেখ, আমি তোমাকে ভালো কথাই বলছি, তোমারই ভালোর জন্যে বলছি, তুমি যদি এই লিন্‌কন্‌শায়ারের ঘন কুয়াশার মধ্যে ট্রেণ থেকে নেমে পড়ো তুমি এডিনবরায় পৌঁছবেই বা কী করে আর তোমার প্রেমিক এ্যান্‌গাসের সঙ্গে দেখাই বা হবে কী করে?

মেয়েটি একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইল।

আমার বন্ধুটিও তখন তার নিজের জায়গায় বসে পড়লো। তার চোখ জোড়া তখন ঘুমে ঢুলছে। একটু ঝিমুনি আসছে। খানিক পরেই আবার সে জেগে উঠলো। কারণ মনে হলো ট্রেণটা বোধহয় একটা ষ্টেশনে ঢুকলো। আন্দাজে বুঝতে পারলে এটা নিশ্চয় 'ইয়র্ক' ষ্টেশন।

মুখে মেয়েটাকে বললে—এখন সবে 'ইয়র্কে' এলুম আমরা। এখ্‌খুনি আবার ছেড়ে দেবে—

কিন্তু যখন সত্যিই ট্রেণটা থেমে গেল, তখন আর তাকে আটকে রাখা গেল না। সে তাড়াতাড়ি উঠেই জানালাটা ফাঁক করে খুলে দিলে। আর পাগলের মত বাহিরের দিকে চেয়ে কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো—তুমি দাঁড়াও, আমি নামছি, এখুনি ট্রেণ থেকে নামছি। একটু দাঁড়াও—

প্রফেসার বন্ধুটি এবার বললে—মিস্ সিনক্লেয়ার, তুমি অবুঝের মতন কাজ কোর না। আমরা দু'জনে একই সঙ্গে ট্রেণ থেকে নামবো, আর আমরা তোমার এ্যান্‌গাসের সঙ্গে কথা বলবো—

মেয়েটা বললে—আচ্ছা, তাই হবে, আপনি যা বলছেন তাই হবে, আমরা একসঙ্গেই নামবো—বন্ধুটি তখন কামরার দরজাটা খুললে। খুলে একহাতে দরজাটা ধরে অন্যহাতে মেয়েটাকে খুব জোরে ধরে রাখলে, যাতে সে পালাতে না পারে, মেয়েটা আগে আগে প্ল্যাটফরমের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলো। কয়েক গজ চলবার পর মেয়েটা থেমে গেল।

বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলে—কই, কী হলো ? কোথায় সে ? কোথায় গেল তোমার এ্যানগাস ?

মেয়েটা বললে—সে চলে গেছে—

বন্ধুটির মনে হলো মেয়েটির চোখের দিকে না চাইলেই ভালো করতো।

বললে—যত সব পাগলামি কাণ্ড! তুমি কি এখনও বুঝতে পারছো না সমস্ত ব্যাপারটা তোমার কল্পনা ? তুমি যে তা বুঝতে পারছো না তার একমাত্র কারণ তুমি ডেগর ওপর খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছ, আর কিছু নয়। এ্যানগাস তোমার জন্যে এডিনবরা ষ্টেসনে অপেক্ষা করছে, সেই রকম কথা ঠিক হয়ে আছে, আর তুমি কিনা তাকে এখানে খুজছো। চলো রেলের কামরায় গিয়ে উঠবে চলো। আমার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে, সেই বড়ি একটা খেতে দেব, তুমি তাতে আরাম পাবে।

মেয়েটি কিন্তু তখনও নাছোড়বান্দা।

বলতে লাগলো—না, না, আপনি যান, আমি এখানেই নামবো। আমার মালপত্রগুলো নিয়ে আমি এখানেই থেকে যাই। এ্যানগাস্ বার বার আমাকে এখানেই নেমে যেতে বলছে—

মেয়েটা তার জিনিস পত্রগুলো ট্রেণ থেকে নেবার জন্যে ফিরলো।

বন্ধু বললে—তাই-ই যদি মনে করো আমার আর কিছু বলবার নেই। তোমার যা ইচ্ছে তাই করো গে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি তুমি খুব ভুল করছো—

সে সেই কামরায় ঢুকে জিনিসপত্রগুলো তুলে নিলে।

বললে—আপনি যা করেছেন আমার জন্যে তার জন্যে ধন্যবাদ, আমার জন্যে আপনি ভাববেন না। আমি এখানে একটা হোটেল খুঁজে নেব, আমার কাছে অনেক টাকা আছে—

বলে ট্রেণ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো।

নেমে বললে—আপনি আমার জন্যে যা করছেন তার জন্যে আমি আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি—

বন্ধুটি বললে—কিন্তু ওয়েভারলিতে এ্যানগাসের সঙ্গে আমার দেখা হয় তো কী বলবো·····

কিন্তু এ-কথাগুলো মেয়েটার কানে গেল না। মেয়েটা ততক্ষণে চলে গেছে—

তারপর যখন বন্ধুটি আবার নিজের কামরায় উঠে এল তখন দেখলে আর একজন তরুণী তার সামনের বার্থের ওপর বসে আছে। সে নিজের মালপত্রগুলোর দিকে চেয়ে দেখলে। জেনে নিলে সে ঠিক কামরাতেই উঠেছে কি না। তারপর আবার শুয়ে পড়লো। আর তারপর কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে জানতেও পারলো না।

ঘুমের মধ্যে কখন সে 'নিউ-ক্যাসল' পেরিয়ে গেছে, কখন 'বারউইক' অতিক্রম করে গেছে টের পায়নি! শেষকালে যখন ট্রেণটা স্কট্‌ল্যাণ্ডের সীমানা আর তার গন্তব্যস্থানের মধ্যিখানে এসেছে তখন হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটলো।

হঠাৎ তখন তার মনে হলো সে যেভাবে ঘুমোচ্ছিল ঠিক তার নিচেয় যেন একটা ধাক্কা লাগলো। তারপর তার চোখ পড়লো তার সামনের মেয়েটার দিকে। সেই মাথায় কালো-চুলওয়ালা মেয়েটার ভয় পাওয়া চোখ দুটোর দিকে। সে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে দিকে চেয়ে বুঝতে

পারলে মেয়েটা মুখ হাঁ করে রয়েছে। আর সে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো। সেই মুহূর্তে কামরাটা একপাশে কাৎ হয়ে পড়লো। চোখ চেয়ে দেখতে পেলে চারদিকে মাটি আর পাথরের খোয়া ছড়ানো রয়েছে কিন্তু ওইটুকুই মাত্র দেখা গেল। আর তারপরেই কামরার জানালা ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে চারদিকে ছিট্‌কে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরটা একটা ক্রিকেটের বলের মত কে যেন কামরার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আর গাড়িটাও ঘণ্টায় ষাট মাইল কি তারও বেশি বেগে ছুটতে ছুটতে একেবারে শূন্যে এসে থেমে গেল। কেমন করে কে জানে সে সামনে বসা মেয়েটার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মেয়েটা তখন চেঁচাচ্ছে, কিন্তু তার চিৎকারের শব্দ তার কানে আসছে না। কারণ গাড়ির অন্য কামরার মানুষের চিৎকারের শব্দে তার কান্না তখন চাপা পড়ে গেছে। আর শুধু মানুষের চিৎকারের শব্দই নয়, তার সঙ্গে গাড়ীর কাঠ, কাঁচ ভাঙা আর অনেক রকম ধাতুর দোমড়ানো মোচড়ানোর শব্দ। গাড়ির ঝাঁকুনিতে মেয়েটি প্রথমে যে গতিতে বন্ধুটির দিকে ছিটকে পড়তে যাচ্ছিল, ঠিক সেই একই গতিতে আবার সে নিজের বসবার জায়গার ওপর ছিটকে বাস পড়ল। বন্ধুটিও সেই সঙ্গে মেয়েটির ওপর ছিটকে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই কামরার একটা খিলেনে তার মাথাটায় চোট লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায় সে অজ্ঞান হয়ে গেল। যার ফলে পরে তাকে কয়েকদিন 'ওয়াইট' দ্বীপে বিশ্রাম করতে হয়েছিল। কিন্তু সেদিন দুর্ঘটনার সময় মনে আছে বন্ধুটি দেখেছিল তার সেই কাঠের বাক্সটা কামরা ভেদ করে কোথায় বাইরে ছিট্‌কে বেরিয়ে গিয়েছিল। অথচ কত দামী জিনিস তার ভেতরে ছিল, তার বই-পত্র আর ডাক্তারি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি।

সেদিন কতক্ষণ যে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল তা মনে নেই। কিন্তু জ্ঞান ফেরবার পর দেখলে একটা ভাঙা-চোরা দরজার ওপর সে শুয়ে আছে। চারিদিকে চূড়ান্ত অন্ধকার। মনে হলো তার সর্বাঙ্গ ঘিরে গরম চটচটি রক্ত লেগে আছে। অথচ কোনও বেদনা বা যন্ত্রনা হচ্ছে না। সে তার শরীরের অঙ্গগুলো নাড়াবার চেষ্টা করলে এক এক করে। কেবল

বাঁ হাতটা যেন মনে হলো যেন একটু সচল। বাঁ হাতটা দিয়ে সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে। তার অন্য হাতটা অন্য একজনের শরীরের সঙ্গে যেন পিন্ দিয়ে আঁটা। ডান পা'টাও তাই। বাঁ পায়ে যে অসহ্য যন্ত্রনা হচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে সেটা অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে। যাকে বলে ইংরিজীতে 'কমপাউণ্ড ফ্র্যাকচার' তাই! সত্যি, এ কী ফ্যাসাদ।

যে হাতটা ভালো ছিল সেই বাঁ হাতটা দিয়ে সে একটা 'লাইটার' বার করলে। যেটার বোতাম একটু ঘষলেই আলো জ্বলে। আলো জ্বললো। কিন্তু সেই আলোতে সে যা দেখলে তাতে তার অন্তরাত্মা ভয়ে সিউরে উঠলো। আলোটা নিভিয়ে দিলে সে। খানিকক্ষণের জন্যে আর একবার সেটা জ্বালতে সাহস হলো না। দেখলে সেই ধূসর চুলওয়ালা মেয়েটা, যে গাড়িতে তার সামনের সিট-এ বসে ছিল, সে পাশেই আহত হয়ে শুয়ে পড়ে আছে, অথচ তাকে কোনও সাহায্য করবার ক্ষমতাই তার নেই। মেয়েটার মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে আর সেই রক্ত তাদের দু'জন-কেই একেবারে স্নান করিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। হয়ত মারা গেছে, নিস্প্রাণ! একটা হাত মুচড়ে জটিল ভাবে তার পেছনে চাপা পড়ে আছে, আর ঘাড়টা দুমড়ে একটা অবাস্তব কোণাকৃতির সৃষ্টি করেছে। একটু ভেবে দেখেই সে বুঝতে পারলে যে এর জন্যে দায়ী হয়ত তার ডাক্তারি যন্ত্রপাতি আর বই ভর্তি কাঠের ভারি বাক্সটা। কারণ বাক্সটা পাশেই কব্জা ভাঙা অবস্থায় দুভাগ হয়ে পড়ে আছে। কব্জাটা ভাঙার জন্যে বই আর যন্ত্রপাতিগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে ভাঙা কামরার মধ্যে। একটা ধারলো যন্ত্র যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা যায় 'ফরসেপ' অর্থাৎ অপারেশনের সময় যাকে সাঁড়াশি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেটা মেয়েটার পেটের ভেতরে ফুটে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে বন্ধু ভয়ে শিউরে উঠলো।

একটা ক্ষীণ কান্নার শব্দ তার কানে ভেসে এল। সে কান্নার শব্দ বড় ভয়াবহ বড় মর্মান্তিক। তারপর আবার তার লাইটারটা জ্বেলে সে হাঁটু গেড়ে বসবার চেষ্টা করলে। তারপর সেই অবস্থায় সে মেয়েটার রক্ত মাথা মাথাটা ছোঁবার চেষ্টা করলে।

ছুঁতেই মাথাটা পড়ে গেল। যেমন ভাবে কোনও ভারি জিনিস

টেবিলের ওপর থেকে নিচেয় পড়ে যায়। কিন্তু পড়ে যেতে গিয়ে একটা হুকের ওপর আটকে গিয়ে ঝুলে রইল।

এর আগে বন্ধুটি অনেক মৃত্যু দেখেছে। বিভিন্ন ধরনের মৃত্যু। কিন্তু এই রকম বীভৎস মৃত্যু তার জীবনে অভিনব। তার গা বমি-বমি করতে লাগলো।

প্রায় এক ঘণ্টা কাটলো এই অবস্থায়। দমকলের লোকরা কামরার দরজা ভেঙে ঢোকবার আগেই সে কোনও রকমে মেয়েটার শরীরটাকে টেনে ওপরে তুলেছে, তার কালো চোখের দৃষ্টিকে ঢাকবার জন্যে চোখের পাতা দু'টি হাত দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে, তারপর যতটা সম্ভব তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবার চেষ্টা করেছে। তার নিজের নেকটাই আর রুমাল দিয়ে তার নিজের পায়ে ব্যাণ্ডেজের গজ বেঁধে যাতে বেশি ব্যথা না লাগে সেই ভাবে সে কোনও রকমে সেইটাকে টানতে টানতে কামরার বাইরে আনবার চেষ্টা করেছে। এ্যামবুলেন্স-এর লোকগুলো এসে পড়েছিল। তারা খুব শান্ত, আর দক্ষ কর্মী, বললে—স্যার, আপনি তো একলা একলা কারোর সাহায্য না নিয়েই ভারি চমৎকার কাজ করেছেন—

তারপর তারা দু'জনকেই স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে চললো। একজন মৃত, আর একজনের পায়ে জখম। চারদিকে ঘন অন্ধকার। ঘটনাস্থল থেকে একশো গজ দূরে রেলের লাইনের ওপর রাখা একটা রেল-গাড়ির কামরায় রেখে দিলে। একজনকে মেঝের ওপর, আর এক জনকে অন্য একটা স্ট্রেচারে। পরিহাসের কথা এই যে ততক্ষণে কুয়াশা সম্পূর্ণ কেটে গেছে। চারদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাশের লোকটা গোঙাচ্ছে, আপন মনেই আস্তে আস্তে গোঙাচ্ছে। বন্ধুটির একবার মনে হলো সে লোকটাকে একটু সেবা করে। কারণ সে তো একজন ডাক্তার। প্রত্যেক ডাক্তারেরই উচিত রোগীর সেবা করা। কিন্তু ওষুধ নেই, যন্ত্রপাতি নেই, এই অবস্থায় উরুর হাড় ভাঙা সারানো অসম্ভব। সে যদি এ-ব্যাপারে কিছু চেষ্টা করতে যায়, তা উপকারের বদলে অপকারই করবে। এ্যামবুলেন্সের লোকরা তাকে মরফিয়া দিয়ে অজ্ঞান করতে চেয়েছিল কিন্তু বন্ধুটি রাজি

হলো না। আর একটু পরেই সমস্ত আহত-মৃত লোকদের নিয়ে 'রিলিফ-ট্রেণ'টা চলতে আরম্ভ করলো।

ওয়েভারলি ষ্টেশনের খুব কাছাকাছিই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল নিশ্চয়, কারণ কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবাই ওয়েভারলি ষ্টেশনে। সেখানে প্ল্যাটফরমের একটা অংশ দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল। সেই দড়ির সীমানার বাহিরে প্রায় একশো ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা আর 'ফ্ল্যাশ-বাল্ব' নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তাদের সাথে অপেক্ষা করছিল আরো অনেক কৌতুহলী পুরুষ আর মহিলার দল।

বন্ধুটি যে-স্ট্রেচারে ছিল সেটি ঠিক দড়ি-ঘেরা জায়গাটার সীমানা বরাবর রাখা হলো। কারণ একটা এ্যামবুলেন্স-গাড়ি চলে গেছে আর অন্যটা তখনও এসে পৌঁছোয়নি। একজন আলখাল্লা পরা লোক তার সামনে এগিয়ে এল। বোধহয় সারা রাত সে গারাজে ডিউটি দিয়েছে, তাই সেই পোষাক পরে চলে এসেছে। সে-লোকটা একটা উডবাইন সিগারেট এ আগুণ জ্বালিয়ে তার ঠোঁটে লাগিয়ে দিলে।

বন্ধুটি জড়ানো সুরে তাকে ধন্যবাদ দিলে। বললে—খুব ধন্যবাদ, খুব ধন্যবাদ—

কিন্তু বলবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ঠোঁঠ দু'টো ফাঁক হয়ে গেল আর জ্বলন্ত সিগারেটটা মুখ থেকে বুকের ওপর খসে পড়লো। লোকটির দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে সিগারেটটা হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে গেল। কিন্তু জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন লেগে তার আঙুলে ছ্যাঁকা লাগলো। তখন সে আবার সিগারেটটা ঠোঁঠে চেপে ধরলো।

লোকটা বললে—এখন ভালো বোধ করছেন?

সে-কথার জবাব না দিয়ে বন্ধুটি বললে—শুনুন, আপনি কি মিলিটারিতে কাজ করেন? 'ব্ল্যাক ওয়াচ' ব্রিগডে?

লোকটার বয়েস খুব কম। মিলিটারি পোষাক পরা। বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি বলুন?

বলে দড়ির সামনে এসে পাশের লোককে সরিয়ে দিয়ে বললে—

আপনার কিছু চাই? আমি এনে দিতে পারি—যা বলবেন—

সেই রকম অবস্থায় আর সেই রাত্রে বন্ধুটি নিজেকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে আবার লোকটার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে, সেই চেহারাটাই সে সেদিন সেই মেয়েটার দেখানো ফোটোগ্রাফে দেখেছিল। চোখে বন্ধুত্বের চাউনি, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মুখ আর এক জোড়া এলো মেলো গোঁফ, জিজ্ঞেস করলাম—আপনার নাম কি এ্যান্‌গাস? লোকটি বললে—হ্যাঁ, কেন? আপনি জানলেন কী করে?

—আপনার কি মিস্ সিন্‌ক্লেয়ার নামে কোনও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা আছে?

লোকটি বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ কথা আছে। আপনি—আপনি কি বলতে পারেন সে কোথায়? সে কেমন আছে?

এই কথাটার জবাব দিতে বন্ধুটির বড় আনন্দ হলো।

বললে—হ্যাঁ, আপনাকে একটা সুখবর দিই। সে এই গাড়িতে আমার সঙ্গে এক কামরাতেই আসছিল। কিন্তু 'ইয়র্ক' ষ্টেশনে সে হঠাৎ নেমে গেল। সে বোধহয় সেখানকার কোনও হোটেলে উঠেছে।

—সত্যিই, খবরটা দিয়ে আপনি আমাকে বাঁচালেন। ভগবানকে ধন্যবাদ যে সে ট্রেণে আসেনি, 'ইয়র্কে' নেমে গেছে। সত্যিই আমি ভগবানকে কী বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না—

বন্ধুটি বললে—আমি জানতুম আপনি তার জন্য খুব ভাবছেন—

লোকটি চিন্তিত হয়ে উঠলো, বললে—আপনার কথা শুনে খুব নিশ্চিন্ত হলাম, কিন্তু ভাবছি সে মাঝ পথে ট্রেণ থেকে হঠাৎ নামতেই বা গেল কেন?

বন্ধুটি বুঝিয়ে দিলে। বললে—নামতে গেল এই জন্যে যে তার একটা অদ্ভুত ধারণা হলো আপনি তাকে ডাকছেন, আপনি তাকে ট্রেণ থেকে নামতে বলছেন—হয়ত এও হতে পারে যে তার একটা অলৌকিক পূর্বধারণা হয়েছিল যে এই রকম একটা চরম দুর্ঘটনা ঘটবে—

বলতে বলতে হঠাৎ কথা শেষ করলে বন্ধুটি। কিন্তু তার পায়ে আবার যন্ত্রণা সুরু হলো। মনে হলো যেন একটু 'মরফিয়া' দিয়ে কেউ

ব্যাথাটা কমিয়ে দিলে ভালো হতো। সে বলতে গেল—আমি···কিন্তু বলতে পারলো না যন্ত্রণার জন্যে। তার বলবার ইচ্ছে ছিল যে সে তাকে অনেকবার ট্রেণ থেকে নামতে বারণ করেছে, যাতে সে না নামে তার জন্যে সে তাকে অনেক কষ্ট করে বুঝিয়েছে, কিন্তু সে কিছুতেই তার কথা শোনে নি।

লোকটি বললে—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ—বলে সেই গাঢ় সবুজ মিলিটারি পোষাক পরা লোকটি চলে গেল।

তারপর কে যেন তাকে একটু হুইস্কি খেতে দিতে চাইলে, কিন্তু সে তা নিতে রাজি হলো না।

সত্যিই অবাক হবার মত ঘটনাটি বটে। কারও কাছে, না দেখলে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার বলে মনেই হবে না। বন্ধুটি ভাবতে লাগলো লোকটি কী ভাবলে কে জানে। মেয়েটি যে ট্রেণ থেকে মাঝপথে নেমে গেছে এ-কথা জেনে কি লোকটা খুশী হয়েছে, না কি, দু'জনেরই এই চরম দুর্ঘটনা সম্বন্ধে একটা পূর্বধারণা ছিল। লোকটার মুখের হাবভাব দেখে কিছুই বোঝা গেল না।

এবার আবার এ্যামবুলেন্স এল। তার ভেতরে বন্ধুটিকে আবার তোলা হলো। আর কিছু পরেই এডিনবরার হাসপাতালে তোলা হলো। হাসপাতালের যে জায়গাটাতে দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়া রোগীদের রাখা হয় তাকে বলা হয় 'ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ড'। এই হাসপালের ডাক্তাররা তাকে দেখলে নিশ্চয় চিনতে পারতো। কিন্তু ডাক্তাররা সাধারণতঃ 'ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে' সোজাসুজি ঢোকে না। বিশেষ করে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা। আর তা ছাড়া ঢুকলেও চিনতে পারতো না। কারণ সমস্ত শরীরটা তার রক্তে মাখামাখি। কেন যে অন্য মেয়েটা ওই অভিশপ্ত ট্রেণে উঠতে গেল, কেন যে সে ওই অভিশপ্ত সিট-এ বসতে গেল। ওই মেয়েটা ওখানে না বসলে তো তার গায়ে এত রক্ত লাগতো না।

তার মনে হলো সে সারা রাত মেঝের ওপর শুয়ে আছে। যে স্ট্রেচারের ওপর তাকে শোয়ানো হয়েছিল সেটা সত্যিই তখন মেঝে ছুঁয়ে

আছে। সে বিরক্ত হয়ে উঠলো হাস পাতালের কর্মচারীদের ব্যবহারে। মনে হলো তখনই সে দাঁড়িয়ে উঠে সকলকে ডেকে এই অবহেলার জন্যে ধমক দেয়। এই কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার নজরে পড়লো এক জোড়া জুতোর দিকে। জুতো জোড়া রবারের বিছানার ধার থেকে বাইরে বেরিয়ে আছে। জুতো জোড়া অর্দ্ধেক পায়ে আটকে আছে, আর পায়ের অর্দ্ধেকটা খোলা। দেখে বুঝা যায় কোনও মেয়ের পা ওটা।

সেই পায়ের দিকে দেখতে গিয়ে হঠাৎ ভয় পেয়ে তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। কিন্তু এ কী করে হয়! এ কী করে সম্ভব? সেই মিলিটারি মার্কা 'এ-টি-এস্' জুতো। ও জুতো যুদ্ধের জন্য তখন এত তৈরি হয়েছিল যে আরো পাঁচ বছর ধরে মেয়েদের পায়ে দেখা যাবে। একজন ডাক্তার আর কয়েজন নার্স সেই ঘরে ঢুকলো। তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি কী আলোচনা করছে। বন্ধুটি বুঝতে পারলে 'এ-টি-এস্' জুতো পরা মেয়েটিকে রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করছে।

বন্ধুটি তার কনুইএর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে সেদিকে দেখতে গেল।

একজন নার্স তাকে বললে—কী দেখছেন? কিছু চাই—?

বন্ধুটি রেগে গিয়ে বললে—আপনি কথা বলবেন না, চুপ করুন—

তারপর সে রবার ঢাকা বিছানাটা ধরে একটা পায়ের সাহায্যে উঠে দাঁড়ালো।

তার মুখ দিয়ে শুধু একটা অদ্ভুত আর্তনাদ বেরোল—উঃ—

ডাক্তার বললে—থামুন, চেঁচাবেন না, খুব সিরিয়াস কেস, শেষ চেষ্টা চলছে—

কিন্তু বন্ধুটি বলে উঠলো—মিস্ সিন্‌ক্লেয়ার! মোনা! মোনা সিন্‌ক্লেয়ার তুমি? তুমি তো 'ইয়র্ক' ষ্টেশনে ট্রেণ থেকে নেমে গিয়েছিল! তুমি এখানে কী করে এলে?

মেয়েটার চোখ দুটো আধখানা খুললো কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে, তারপরেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। একটা ক্ষীণ হাসির আলো শুধু ফুটে উঠলো সেই ফ্যাকাশে মূর্তির ওপর। মুখ দিয়ে বেরোল শুধু কয়েকটা কথা—নেমেই তো গিয়েছিলাম,...কিন্তু...কিন্তু...শেষকালে,

মত বদলে গেল, আবার দৌড়ে···দৌড়ে এসে ট্রেণে উঠেছিলাম···

মোনা সিন্‌ক্লেয়ার সেই মুহূর্তেই মারা গিয়েছিল, না কিছু পরে বন্ধুটি তা আর জানতে পারেনি। মনে হয় তখনই মারা গিয়েছিল কারণ তার মুখে তখনও হাসিটা লেগে ছিল।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা একটা হাসপাতালের একান্ত ঘরে আমার বন্ধুটি অন্য ডাক্তার বন্ধু আর ছাত্রদের সঙ্গে তার পায়ের ওপরের ফোলা জায়গাটা নিয়ে কথা হচ্ছিল। সেই সময়ে খবরের কাগজের পাতায় ট্রেণ-দুর্ঘটনায় মৃতদের তালিকার ওপর তার নজর পড়লো। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে পড়তে প্রথমে তার নজরে পড়েনি। মনে মনে সে খুশীই হলো।

কিন্তু না, তারপরেই সেই নামটা পাওয়া গেল—সিন্‌ক্লেয়ার, মিস মোনা, হাইগেট, লনডন্।

গল্পটা শুনে বললাম—কী ভয়ঙ্কর গল্প —

আমার বন্ধুটি পুরোণ 'পোর্ট' মদ খেতে খেতে গল্প করছিল। প্রায় আধ বোতল পোর্ট শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবু গল্প যখন শেষ হলো তখন প্রফেসারের মুখ আতঙ্কে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

গল্প শেষ করে প্রায় পুরো এক মিনিট চুপ করে বসে রইল বন্ধুটি। তারপরে বললে—জানো, গল্পটা কেন আমাকে এত ভাবায়, কেন আমাকে এত উত্তেজিত করে ?

বললাম—না—না—কেন ?

প্রফেসার বন্ধুটি বললে—আমি একটা কথা কিছুতেই মাথা থেকে দূর করতে পারি না। সেটা হলো এই যে সেই ছেলেটা কী ভাবলো বলো তো আমার সম্বন্ধে। সেই এ্যানগাস্, সেই মোনা সিনক্লেয়ারের প্রেমিক ছেলেটা ?

আয়ন ফেলোজ গর্ডন : যে সমস্ত সাহিত্য সাধক ভৌতিক গল্পের পটভূমিকে তাঁদের লেখনী ধারণের অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন আয়ন ফেলোজ গর্ডন তাঁদের অন্যতম। ইংরাজী সাহিত্যে 'হরর' সিরিজের গল্প বিন্যাসে লেখকের অবদান অনস্বীকার্য।

যে কোন সাহিত্যের তুলনায় ইংরাজী সাহিত্যের অলৌকিক গল্পের ভাণ্ডার অতুলনীয় ও অফুরাণ। আর এই ভাণ্ডারকে যে সমস্ত বলিষ্ঠ লেখক লেখিকা সতেজ ও সজীব রেখেছে আয়ন ফেলোজ তাঁদের পথিকৃত। ভৌতিক গল্পের ঘটনা বিন্যাসে চমক ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে, পাঠককে সম্মোহিত করার যে সার্থক প্রয়াস লেখকের লেখনী সঞ্চালনে বিধৃত হয়েছে তা অনুপম ও ঐন্দ্রজালিক।

দি প্যাসেঞ্জার উইথ দি ব্যাগ

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স
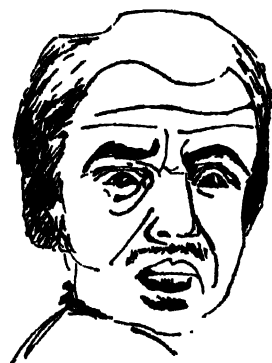
"চুরুটের বাক্সের রহস্য ভেদ হল আরও বিচিত্রভাবে। মি. ডোয়েরিং হাউস যেদিন টাকার ব্যাগ নিয়ে রওনা হয়েছিলেন তার পরদিন থেকেই ট্রেনের ঐ কামরাটা মেরামতের জন্য খুলে নেওয়া হয়।"

লণ্ডন ছেড়ে রওনা হওয়ার আশায় এক ভদ্রলোক সকালবেলা ইউস্টন ষ্টেশনে এলেন। সঙ্গে তাঁর কিছু কাগজপত্র ছিল—ইচ্ছে ছিলো, ট্রেনে যেতে যেতে সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নেবেন। সুতরাং গার্ড সাহেবকে তিনি প্রশ্ন করলেন, একটা কামরা কি খালি পাওয়া যাবে?

ট্রেনে তেমন ভিড় নেই। ফলে 'নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, স্যর' বলে গার্ড-সাহেব ভদ্রলোককে তুলে দিলেন এক খালি কামরায়, এবং যাওয়ার সময় বাইরে থেকে দরজায় চাবি দিয়ে গেলেন। ট্রেন সবে চলতে শুরু করেছে এমন সময় একটা ব্যাগ হাতে এক বয়স্ক ভদ্রলোক তড়িঘড়ি ঢুকে পড়লেন সেই কামরায়। প্রথম যাত্রী সামান্য বিরক্তি নিয়ে ভাবলেন, গার্ডসাহেব হয়তো দরজায় ঠিকমতো চাবি লাগাননি।

একটু পরেই দুজনে আলাপচারীতে মগ্ন হলেন। কথায় কথায় জানা

গেল, দ্বিতীয় ব্যক্তি রেল কোম্পানীর একজন পরিচালক, এবং বর্তমানে নতুন একটি শাখা রেল-লাইন খোলার ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তিনি আরও বললেন, 'জানেন, আমার ব্যাগে কত টাকা আছে? প্রথম যাত্রীকে নিরুত্তর দেখে তিনি নিজেই বললেন, 'সত্তর হাজার পাউণ্ড। নতুন রেল লাইন খোলার কাজে লাগবে। এটা ওখানে কাছাকাছি কোন ব্যাঙ্কে জমা দেবো।'

'এতো টাকা সঙ্গে নিয়ে একা চলাফেরা করতে আপনার ভয় করছে না?' প্রথম যাত্রী অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

'না, না' হালকা উত্তর পাওয়া গেল, 'ক আর জানতে পারছে। তাছাড়া, কে-ইবা এ টাকা লুঠ করবে? আপনাকে বললাম বলে আপনি নিশ্চয়ই সে কাজ করবেন না। না, ওসব ভয় আমার একটুও নেই।'

তাঁদের কথাবার্তা চলতে লাগল। একসময় ব্যাগ হাতে ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো কথা, যে বাড়িতে আপনি যাচ্ছেন, সেটা আমার চেনা। ঐ বাড়ির মালিকের বউ হল আমার ভাইঝি। আপনি ওকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে দয়া করে বলবেন, পরের বার যখন আমি যাবো, তখন যেন "ব্লু রুম" এ অতো আগুন না জ্বালায়! গতবারে আগুনের তাপে একদম ভাজা হয়ে গেছি। ও! আমার ষ্টেশন এসে গেছে।'

এই কথা বলেই বয়স্ক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, তারপর নামার তোড়জোড় করতে লাগলেন। কিন্তু নামার আগে প্রথমজনের হাতে একটা কার্ড দিলেন তিনি। তাতে 'ডোয়েরিং হাউস' নামটা লেখা। তারপর ট্রেন থেকে নেমে রওনা হলেন। তাঁর সহযাত্রী আয়েস করে বসে জানলা দিয়ে দেখলেন, ব্যাগ হাতে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন। সেই মুহূর্তে হঠাৎই প্রথম যাত্রীর নজরে পড়লো, তাঁর পায়ের কাছে, মেঝেতে, একটা চুরুটের বাক্স পড়ে আছে। সেটা তুলে নিতেই বাক্সর গায়ে 'ডোয়েরিং হাউস' নামটা তার নজরে পড়লো। ট্রেন ছাড়তে তখনো মিনিট দুয়েক দেরী দেখে এক লাফে ট্রেন থেকে নেমে মিঃ— ডোয়েরিং হাউসকে ধরবার জন্য প্ল্যাটফর্ম ধরে তিনি ছুটতে শুরু করলেন— যদি তাঁর চুরুটের বাক্সটা ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

হঠাৎ তাঁর একঝলক নজরে পড়লো, প্ল্যাটফর্মের শেষে একটা লাইট পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে মি ডোয়েরিং হাউস কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। নতুন লোকটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তার মাথায় বালি-রং চুল, এবং এদিকে ফিরেই সে ডোয়েরিং হাউসের সঙ্গে কথা বলছে।

প্রথম যাত্রী আরও কিছুটা এগোতেই তাঁদের দুজনকে আর দেখা গেল না। এক বিচিত্র উপায়ে তাঁরা যেন মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। ভালো করে চারপাশে দাঁড়িয়েও তাঁদের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। তখন তিনি কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কুলিকে প্রশ্ন করলেন, 'ভাই, ঐখানে যে দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, ওঁরা কোনদিকে গেলেন দেখেছ?'

'না, বাবু' হতভম্ব কুলি উত্তর দিল, 'ওখানে তো কোন লোককে দেখিনি। আর এপাশ দিয়েও কেউ যায় নি।'

ট্রেন তখন ছাড়ার বাঁশি দিয়েছে। ফলে ভদ্রলোক আর কোনরকম খোঁজখবরের চেষ্টা না করে বিস্ময়ে দিশেহারা হয়ে ছুটে ফিরে গেলেন নিজের কামরায়।

সন্ধ্যেবেলা গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেন তিনি। নৈশভোজের পোষাক পরে বসবার ঘরে আসতেই দেখলেন বহু অতিথির সমাবেশ। খেতে বসে তাঁর মনে পড়লো ডোয়েরিং হাউসের অনুরোধের কথা। ফলে গৃহকর্ত্রীকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'ট্রেনে আপনার এক কাকার সঙ্গে আলাপ হল। উনি আপনাকে বলতে বলেছেন··· '

এবং বাকি খবরটুকু তিনি দিলেন।

ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হল যেন ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়েছেন, মুখের খুশির আলো নিভে গেল দপ্ করে। তাঁর স্বামীর অবস্থাও একই রকম। ব্যাপার-স্যাপার দেখে অতিথি ভদ্রলোক অনুমান করলেন, তিনি নিশ্চয়ই খুব অস্বাভাবিক কিছু বলে ফেলেছেন! কিন্তু সেটা যে কি, বা কেন অস্বাভাবিক তা তিনি শত চেষ্টাতেও বুঝে উঠতে পারলেন না। যাই হোক, যখন খাওয়া শেষ করে সমস্ত অতিথি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন, তখন ভদ্রমহিলার স্বামী তাঁকে ডেকে একপাশে নিয়ে গেলেন, বললেন,

'আমার স্ত্রীকে যে কথা আপনি শোনালেন তা ভারী অদ্ভুত মানে, ওর ঐ কাকার কথা বলছি। আসলে ব্যাপার হলো, ওর কাকা বেশ কিছুদিন হলো উধাও হয়ে গেছেন, কেউ তাঁর খোঁজ জানে না। আরও খারাপ হল, উনি সত্তর হাজার পাউণ্ড নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছেন। পুলিশ তাঁর খোঁজ এখনও করে চলেছে। বুঝতেই পারছেন, এগুলো ঠিক সবার সামনে আলোচনা করার মতো নয়, তাই আমরা তখন চমকে গিয়েছিলাম।'

ঘটনাচক্রে অতিথিদের মধ্যে রেল কোম্পানীর আরও দুজন পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। খাওয়ার সময় ভদ্রলোকের মুখে ঐ সব কথা শুনে তাঁরা পরে এলেন তাঁর কাছে। বললেন···আচ্ছা ট্রেনে যে লোকটির সঙ্গে আপনি কথা বলেছিলেন তার সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারেন?'

'না,' উত্তর দিলেন ভদ্রলোক, 'তাঁর সঙ্গে আমি কিছুক্ষণ কথা বলেছি মাত্র এবং যতদুর মনে হয় যে স্টেশনে উনি নেমে যান, সেখানে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে উনি আর একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন··· ·'

পরিচালক দুজন নানারকম ভাবে চেষ্টা করেও ভদ্রলোকের কাছ থেকে আর কোন নতুন তথ্য পেলেন না। অবশেষে তাঁরা অনুরোধ করলেন, 'রেল কোম্পানীর পরিষদের সামনে হাজির হয়ে আপনি যদি এ কাহিনী শোনান তাহলে খুব উপকার হয়। দয়া করে এ অনুরোধটুকু রাখুন।'

ভদ্রলোক রাজী হলেন। এবং সেইমতো দিনও ঠিক হয়ে গেল।

পরিষদের সামনে দাঁড়িয়ে সেই বিচিত্র কাহিনী শোনাতে শোনাতে হঠাৎই অবাক স্বরে চীৎকার করে উঠলেন ভদ্রলোক, 'ঐ তো উনিই সেদিন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মি. ডোয়েরিং হাউসের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ঐ যে—বালি-রং চুল ভদ্রলোক।'

পরিচালকদের মধ্যে ঐ বর্ণনামত সত্যিই এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি রেল কোম্পানীর কোষাধ্যক্ষ, এবং আচমকা অভিযোগে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'না, না, আমি সেখানে থাকতেই পারি না, আমি তখন ছুটিতে ছিলাম'—

এই ঘটনায় পরিচালকমণ্ডলী যথেষ্ট অবাক হলেন, এবং তাঁরা জোর করলেন যে পুরোনো খাতাপত্র খুলে পরীক্ষা করে দেখা হোক, সত্যিই

কোষাধ্যক্ষ তখন ছুটিতে ছিলেন কি না। পরীক্ষায় প্রমাণ হল, কোষাধ্যক্ষ মিথ্যে বলেছেন। তখন সকলে মিলে তাঁকে খুঁটিয়ে জেরা করতে শুরু করলেন, এবং শেষ পর্যন্ত কোষাধ্যক্ষকে তাঁরা বাধ্য করলেন স্বীকারোক্তি দিতে। তিনি স্বীকার করলেন যে মি. ডোয়েরিং হাউসকে তিনি খুন করেছেন যদিও তাঁর সে ইচ্ছে ছিল না। সত্তর হাজার পাউণ্ড নিয়ে তাঁর ট্রেনে রওনা হওয়ার কথা কোষাধ্যক্ষ জানতেন। সেই স্টেশনে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তিনি ডোয়েরিং হাউসকে একটা নির্জন পথে যেতে রাজী করান। একটা পাথুরে জায়গায় পৌঁছে তিনি পরিচালকের মাথায় আঘাত করেন। কোষাধ্যক্ষের উদ্দেশ্য ছিল ডোয়েরিং হাউসকে অজ্ঞান করে টাকার ব্যাগ নিয়ে সরে পড়া, কিন্তু পড়ে যাবার সময় ডোয়েরিং হাউস একটা পাথরে আঘাত পেয়ে মারা যান।

চুরুটের বাক্সের রহস্য ভেদ হল আরও বিচিত্রভাবে। মি. ডোয়েরিং-হাউস যেদিন টাকার ব্যাগ নিয়ে রওনা হয়েছিলেন, তার পরদিন থেকেই ট্রেনের ঐ কামরাটা মেরামতের জন্য খুলে নেওয়া হয়। এবং ডোয়েরিং-হাউসের রহস্যময় পুনরাবির্ভাবের দিনেই ওটা সারিয়ে আবার চালু করা হয়েছিল।

ইউস্টন স্টেশনের সেই গার্ডসাহেবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সেদিন আমি কামরায় একজন ভদ্রলোককে রেখেই দরজার বাইরে থেকে চাবি দিয়েছিলাম। এতে ভেতরের লোক হাতল ঘুরিয়ে বেরোতে পারলেও বাইরে থেকে কেউ ঢুকতে পারার কথা নয়। আর, আমি ঐ কামরা ছেড়ে আসা মাত্রই ট্রেন চলতে শুরু করেছিল। জানি না, কি করে…

* লেখক জীবনী লেখকের পূর্ববর্তী গল্পে আছে।
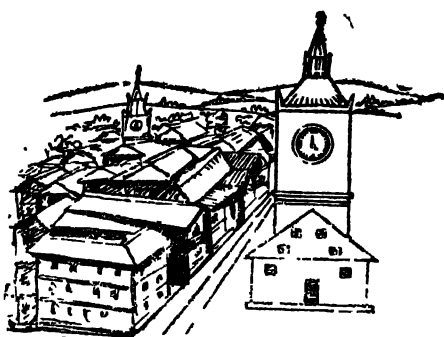
॥ লণ্ডন টাওয়ারের ভূতের গল্প ॥

(সত্য-ঘটনা)　　　　আর থাসটন হপকিনস্

এক সময় সব আলো নিভে এল। সমস্ত লোকজন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। তখন তাঁর সম্বিত ফিরে এল। আস্তে আস্তে তিনি নীচে নেমে এলেন।”

*　　　*　　　*　　　*

লণ্ডনের বহু পুরোনো হানাবাড়িগুলির প্রেতকাহিনী এখন পৃথিবীর বহু-মানুষেরই জানা হয়ে গেছে। টাওয়ার-অব লণ্ডনের প্রেতকাহিনীও বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উনবিংশ শতকের প্রথম-দিকের এমনি একটি প্রেত কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন ই, এল স্যুইফন্ট্। স্যুইফান্ট বিখ্যাত ক্রাউঞ্জুয়েলের রক্ষক হিসেবে টাওয়ার অব লণ্ডনে বাস করতে আসেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫২খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি লণ্ডন টাওয়ারে রক্ষকের চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। মার্টিন টাওয়ারের জুয়েল হাউসে তিনি স-পরিবারে বাস করতেন। ১৯১৭ খ্রীঃ অক্টোবর মাসের এক রাতে স্যুইফন্ট্ পরিবার বসেছিলেন ডিনারে। তিনি, তাঁর স্ত্রী, তাঁর বৌদি এবং তাঁর সাত বছরের ছেলে-টেবিল ঘিরে বসেছিলেন। বাইরে শীত। দরজা

জানা। সব বন্ধ. এবং ভারি পর্দায় ঢাকা। ঘরে কোনো আলো ছিল না! কেবল টেবিলের উপর দুটি মোম জ্বলছিল।

সুইফট্ তাঁর স্ত্রীকে সুরা এবং জল মিশিয়ে একটি পানপাত্র যখন দিতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তাঁর স্ত্রী চিৎকার করে বললেন, হে ভগবান! ওটা কী? সুইফট স্ত্রীর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখলেন ঘরের ছাদের একটু তলায় জলের মত গড়নের একটি স্বচ্ছ টিউব ভাসছে এবং তার ভিতর শাদা এবং ফিকে ফিরোজাসবুজ কিছু ফুটন্ত তরল ক্রমাগত মিশ খাচ্ছে। ক্রমশঃ সেটি ডিম্বাকৃতি ডিনার টেবিলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে ঘুরতে আরম্ভ করল। ঘুরতে ঘুরতে সেটি সুইফট্ এর বৌদির সামনে দিয়ে এবং তাঁর ছেলের সামনে দিয়ে ঘুরে গিয়ে পড়ল তাঁর স্ত্রীর কাঁধের ঠিক পিছনে। তাঁর স্ত্রীর সামনে কোনো আয়না ছিলনা। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না বস্তুটি কোথায়। তা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই কোনো উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল। কারণ তিনি টেবলের ওপর ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করে উঠলেন,—ওঃ, আমাকেই ধরেছে এবার! তাঁর চিৎকারে টাওয়ারের লোকজন ছুটে এল। এবং বাড়ির কাছের লোকেরাও ছুটে এল। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হ'ল, ওই বস্তুটি কেবল সুইফট এবং তাঁর স্ত্রীই দেখতে পেয়েছিলেন। আর সকলের কাছে ওটি অদৃশ্য ছিল।

গ্রীন টাওয়ারেই বিখ্যাত বা কুখ্যাত বেগম টাওয়ার আছে। এই টাওয়ারের দেওয়ালে দেওয়ালে ফাঁসীর আসামীরা লিখে গেছে তাদের শেষ মৃত্যু বাণী। এই টাওয়ার থেকে দেখা যায় ফাঁসীর মঞ্চ এবং সেন্ট পিটার চার্চ এর ভিনকুলা। এই চার্চেই আছে এ্যান বলিনের দেহাবশেষ। সম্প্রতি এই দেহাবশেষ যে এ্যান্ বলিনেরই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে—মৃত্যুর দুহাতে ছ'নম্বর আঙুলের অস্তিত্ব দেখে। কারণ এ্যান বলিন ছিলেন ছ-আঙুলে। টাওয়ার অফ লণ্ডনের এক পাহারাদার জানায় সে কার্ল লোডি যেদিন বন্দুকের গুলিতে মারা যান তার আগের রাতে, সবাই এ্যান বলিনকে দেখে। হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলকের সংগে শাদা সিল্কের পোষাক ও শাদা স্কার্ফ গায়ে এ্যান বলিন লোক-জনের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যান এবং হঠাৎ ছফুট চওড়া একটি দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে যান।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এক শীতের রাতে পাহারাদার বদলের সময় দেখা যায় যে,

লেফটেনান্টস লজিং এর কাছে যেখানে আগের পাহারা দাঁড়ায় সে স্থানটিতে কেউ নেই। পাহারাদারটিকে বরফে ঢাকা পাথরের চাতালে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। তার দেহ যেখানে পড়েছিল তার ঠিক উপরেই ছিল সেই ভয়ংকর ঘর। যেখানে এ্যান বলিন কাটিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর আগের শেষ রাতটি। একজন সবল সুস্থ পাহারাদার সৈনিকের পক্ষে এই বিচ্যুতি সামান্য নয়। সুতরাং সুরাপান বা ঘুমিয়ে পড়ার অপরাধ সন্দেহে তার কোর্টমার্শাল হ'ল। এই কোর্ট মার্শাল দিয়ে ছিলেন দুজন খুদে মিলিটারি অফিসার। একজন পরে হয়েছিলেন মেজর জেনারেল জে, ভি ডান্‌দাস এবং অন্যজন পরবর্তীকালে ফিল্ড মার্শাল লর্ড গ্রেনফিল্ড হয়। সৈন্যটি কোর্টে তার অভিজ্ঞতার কথা অকপটে জানায়।

অন্ধকারে সে একা পাহারা দিচ্ছিল। হঠাৎ দেখে শাদা একটি মূর্ত্তি তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে তখন রাইফেল তুলে ধরে তার দিকে নিশানা করে।

– তারপর ?

-- তারপর হঠাৎ একটা অগ্নিময় ঝলক রাইফেলের মধ্যদিয়ে ঢুকে আমার হাত ঝল্‌সে দেয় !

—তারপর

—আমি আমার রাইফেল ফেলে দিই।

—রাইফেল ফেলে দাও ! কি সর্ব্বনাশ। টাওয়ার অব লণ্ডনের গার্ড রাইফেল ফেলে দেয় ? বেশ—তুমি এবার কোর্টের সবাইকে বলো, কে সেই শ্বেতমূর্তি য তোমাকে তড়িতাহত ক'রেছিল ?

—একজন মহিলা। তাঁর মাথায় ছিল অদ্ভুত আকারের একটি বনেট্ টুপি। কিন্তু সেই টুপির মধ্যে কোনো মুণ্ড ছিল না স্যর !

এই অদ্ভুত স্বীকারোক্তির পর কোর্ট মার্শাল ঘরের হাওয়া ভরে গেল অবিশ্বাস ও বিদ্রূপের হাসিতে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৈনিক গার্ডটি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে ছাড়া পেলেন আরো কিছু লোকের সাক্ষ্য প্রমাণে। ব্লাডি টাওয়ারের একটি জানালা থেকে, রাতে শুতে যাবার আগে একজন অফিসার দেখেছিলেন যে সত্যিই

একটি প্রেত, পাহারাদারের দিকে ক্রমশ এগিয়ে এলে তার বেয়নেটের মধ্য দিয়ে এমন কি তারও মধ্যদিয়ে চলে গেল। সৈনিকটি 'লু-গোজ দেয়ার' বলে বেয়নট টি তোলে। এবং হ্যাঁ সত্যিই সে তার রাইফেল ফেলে দেয় ও ধাটি টপকে মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারায়। এ্যান বলিন কে আর এক রাতে দেখা গিয়েছিল সেন্টপিটার এডভিনকুলার চ্যাপেলে। একজন পদস্থ গার্ড অফিসার সে রাতে ছিলেন পাহারায়। তিনি দেখলেন চ্যাপেলের ভিতর আলো জ্বলছে। আলোর রঙটা অদ্ভুত নীলাভ বর্ণের। অন্য কয়েকজন পাহারাদারও সেই আলো এবং শব্দ শুনতে পেয়েছিল। মনে হচ্ছিল বিধর্মীদের ভাষায় কারা যেন অন্যধরণের মন্ত্রগান উচ্চারণ করছিল। কিন্তু চ্যাপেলের সদরে ছিল মস্ত একটি তালা লাগানো। সকলে অবাক হয়ে ভাবছিলেন তালা বন্ধ চ্যাপেলের মধ্যে কি করে আলো এলো, শব্দই বা উঠছে। করপোরাল শেষ পর্য্যন্ত গার্ডদের বললেন, একটা মই নিয়ে আসতে। মই এনে চ্যাপেলের দেওয়ালে লাগানো হ'ল। মই বেয়ে উঠে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে করপোরাল দেখলেন, চ্যাপেলের ভিতরের বড় হলে নীলাভ অন্ধকার আলোয় নারী এবং পুরুষদের এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে সার সার আসনের মাঝখানের গলিপথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাদের পরণে টিউডর আমলের পোষাক। শোভাযাত্রার সামনের দিকে একজন সুন্দরী মহিলা রয়েছেন। তাঁর গায়ে নানা রঙের ঝকঝকে অলংকার। বিশেষতঃ তাঁর চুলেও ঝকঝক্ করছে একটি হীরার গয়না। করপোরাল সংগে সংগে সেই কুমারী মহিলাটিকে চিনতে পারলেন। কিছুদিন আগে তিনি ফ্রান্সের একটি পুরোনো দুর্গে তিনি, এ্যান বলিনের একটি তৈলচিত্র দেখেছিলেন। করপোরাল সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে দেখতে এমন হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি সেই মইয়ে উঠে জানালা ধরে দাঁড়িয়েই ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত একসময় সব আলো নিভে এল। সমস্ত লোকজন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। তখন তাঁর সম্বিত ফিরে এল। আস্তে আস্তে তিনি নীচে নেমে এলেন।

এ্যা নবলিন কে টেমস নদীর ধারেও দেখা গেছে বহুবার। এ্যান বলিনকে ব্যাভিচারের অপরাধে আর্চবিশপ ক্যানমোর সাজা দিয়েছিলেন। স্তামবেথ

প্যালেসের আনডারক্রফট এর তলা দিয়ে যে কেউ যায় তারা করুণ চাপা আর্তনাদ আর কান্নার শব্দ শুনতে পায়। এ্যান বলিন যেন কেঁদে কেঁদে করুণ কণ্ঠে আবেদন জানিয়ে বলছে সে নিষ্পাপ তার কোনো দোষ নেই। লণ্ডন ইভনিং নিউজের একজন রিপোর্টার এই আনডারক্রাফ্ট এর একটি উঁচু স্তুপের মত সমাধি খোঁড়ার সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্তরে স্তরে সাজানো পাথরের স্তুপের তলায় সাত আটটি স্তরে সাজানো কঙ্কাল দেহাবশেষ দেখতে পান। কত গুপ্ত হত্যা এবং অপরাধী হিসেবে সাজা পাওয়া মানুষের হাড় যে এখানে ছিল তা কে বলতে পারে?

অস্টম হেনরী এ্যান বলিনের সম্বন্ধে যখন কামনাহীন হয়ে পড়লেন তখন এ্যানকে রাজপ্রাসাদ থেকে ওয়াটার টাওয়ারে নৌকো করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়েছিল। শোনা যায় ওয়াটার টাওয়ার অভিমুখে এ্যান বলিনের শেষ যাত্রার চিত্র কখনো কখনো আবার দেখা যায়।

ললার্ড টাওয়ারেও ভূতের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এই টাওয়ারের সিঁড়ি বেয়ে পঞ্চাশ ধাপ উঠে যাওয়ার পর হঠাৎ মনে হতে থাকে কে যেন ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে থাকা মানুষকে। অদ্ভুত সেই পরিবেশে গলাচেপে আসে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। এই সিঁড়ি দিয়ে কোন জীব জন্তুও উঠতে চায়না এই সিঁড়ি পেরিয়ে বিখ্যাত লোনার্ড কারাগার। এই জেলখানাটি একবার ১৬৬৬ তে লণ্ডনের সেই গ্রেটফায়ারে পুড়ে গিয়েছিল। এই জেলখানার দেওয়াল ফাঁসির আসামীদের নানান লেখায় ভরা। একজন আসামী নাম জর বারনার, ভুল ইংরেজিতে লিখেছিল আমাকে সব কুস গ থেকে বাঁচাও। আমেন। লোনার্ড জেলখানার ঘরটিতে কেউ ঢুকলে মাঝে মাঝে দরজা আটকে যায়। তবে এই ধরনের দরজা আটকানোর ফলে একজন এ. আর. পি. সারভিসের কর্মী বেঁচে যান। একটি টাওয়ারে তিনি আগুন নেভাতে যাচ্ছিলেন। দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি যেতে পারেন নি। যদি পারতেন তাহলে তাঁর মৃত্যু ছিল অবধারিত। কারণ টাওয়ারটি সংগে সংগে বোমায় ধ্বংস হয়ে যায়।

আর থার্সটন হপকিনস :

লণ্ডন টাওয়ারকে কেন্দ্রকরে বহু ভৌতিক গল্প লিখিত হয়েছে। কুখ্যাত ও বিখ্যাত এই কারা প্রাচীরের ক্ষুধিত পাষাণের আর্তক্রন্দন যেন যুগ যুগান্তর ধরে ধ্বনিত হচ্ছে। হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দী যে কারা প্রাচীরের অন্তরালে ঘাতকের শানিত তরবারির আঘাতে খণ্ডিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে কতনা রাজারানী আর রাজকুমারা হারিয়ে গেছে। তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের রাজ-ক্ষমতার সম্পার্দ্ধিত উদ্ধতের বলি হয়েছে কতনা অভিজাত, সম্ভ্রান্ত, নিরপরাধ ভাগ্যহত, চক্রান্ত—বেষ্টিত মানব মানবী। তাই শতশত বর্ষ ধরে এই লণ্ডন টাওয়ার বা Bloody Tower কেন্দ্র করে কতনা গল্প-গুজব আর ভৌতিক কাণ্ড-কাহিনী সারা ইংলণ্ড তথা ইউবোপে ব্যপ্ত হয়েছে। লণ্ডন টাওয়ার ইংলণ্ডীয় জনজীবনে এক জিঘংসা প্লাবিত হত্যাপুরী। যেথানে আজও শত সহস্র মৃত মানুষের উৎপীড়নের ক্রন্দনরোল তাদের কায়াহীন অস্তিত্বের দ্যোতনা ঘোষণা করছে।

আর থারস্টন হপকিন্স তাঁর ভৌতিক কাহিনী রচনায় যে সমস্ত পটভূমিকে অপরিসীম শৈল্পিক কুশলতায় ব্যবহার করেছেন তাদের মধ্যে লণ্ডন টাওয়ার অন্যতম।

অপরিচিতা

আগাথা ক্রিস্টি

"ও একজন তরুণ মেরীকে নিয়ে ওর প্রচণ্ড উৎসাহ। সিস্টার মেরী নানারকম অপার্থিব দৃশ্য দেখে। এটা একটা ডাক্তারের পক্ষে ভীষণ রহস্যের ব্যাপার···"

*　　*　　*　　*

আমি প্রথমে ব্যাপারটা উইলিয়াম পি. রীয়ানের কাছ থেকে শুনি, রীয়ান একটা আমেরিকান কাগজের প্রতিনিধি। ও নিউইয়র্কে যাওয়ার আগে আমরা নৈশ ভোজ খাচ্ছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে আমি বললাম—কাল আমি ফোলব্রীজে যাচ্ছি।

ও বাগ্রস্বরে জিজ্ঞেস করলো—ফোলব্রীজ কর্নওয়াল?

হাজারজনের মধ্যে একজনও জানে কিনা সন্দেহ যে কর্নওয়ালে ফোলব্রীজ নামে একটা জায়গা আছে। এই ফোলব্রীজকে সবাই হ্যামসফায়ারের ফোলব্রীজ বলে ধরে নেয়। তাই রীয়ানের এই প্রশ্ন আমার মধ্যে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করলো।

—হ্যাঁ, আমি বললাম। তুমি চেন নাকি?

ও কথার উত্তর না দিয়ে বললো—ওখানকার ট্রীয়ার্ন হাউস নামে কোন বাড়ী চেনো?

আমার কৌতূহল বাড়লো।

--খুব ভালভাবে। আমি তো টীয়ার্ণেই যাচ্ছি। সেটা আমার বোনের বাড়ী।

—ভাল, রীয়ার্ন বললো। দেখো কোন রহস্য না দেখা দেয়...... ....

আমি বললাম হেঁয়ালী রেখে আসল কথা বলো।

—একথা বলতে গেলে যুদ্ধের প্রথমের দিকে একটা ঘটনার কথা বলতে হয়। যে ঘটনার কথা বলবো সেটা উনিশশো একুশ সালে ঘটেছিল।

উইলিয়াম পি. রীয়ান তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ফলাও করে বলতে ভীষণ ভালবাসে। কিন্তু ও বলতে আরম্ভ করেছিল, এখন আর থামানোর উপায় নেই।

—তুমি জান, যুদ্ধের শুরুতে আমি বেলজিয়ামে ছিলাম, আমার কাগজের কাজে। ওখানে একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল। গ্রামটার নাম ধরে নাও 'ক'। তবে ছোট গ্রামটাতে একটা বড় কনভেন্ট ছিল। আর এই গ্রামটা পড়তো জার্মানদের আসার পথের ওপরে।

আমি অস্বস্তি অনুভব করলাম, নড়েচড়ে বসলাম। ও একটা হাত তুলে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললো—না, না, আমি কোন জার্মান অত্যাচারের গল্প বলবোনা, জার্মানরা ঐ কনভেন্টটা দখল করেছিল। আমি ওদের হুন বলবো তবে ওদের সঙ্গে কোন মারাত্মক বিস্ফোরক ছিল না। এই কনভেন্টের নানরাই বা বিস্ফোরক সম্বন্ধে কি বুঝবে?

—বোঝা অস্বাভাবিক, আমি একমত হলাম।

—এখানে কৃষকদের ব্যাপারটা বেশ মজার। ওরা সব শস্য কেটে শুকোতে দিয়েছিল। কৃষকরের মতে ওটা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ওখানকার একজন নানের ওপর ভর হতো এবং সে নানারকম দৃশ্য দেখতো। কৃষকদের মতে সেই নানই এই বিস্ময়কর ব্যাপারটা ঘটিয়েছিল। নান বজ্র ডেকে সেই হুনদের ধ্বংস করে দিতে বলেছিল, সত্যি ওরা একেবারে উবে গিয়েছিল। বেশ আশ্চর্যজনক ব্যাপার, তাই না?

—আমি এই ব্যাপারটার আসল সত্য বের করতে পারিনি, সময়ও ছিলনা। আমি ঘটনাটার বিবরণ লিখে আবার কাগজে পাঠিয়ে দিই। যুক্তরাষ্ট্রে খবরটা চাঞ্চল্য এনেছিল। ওরা এই ধরনের খবর পছন্দ করে।

.... কিন্তু কাহিনীটা লেখার পরে আমার বেশ উৎসুক্য জাগে এবং আমি আসল সত্য জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ি। ঘটনার জায়গাটাতে বোঝার মত কিছু ছিলনা। তখনও দুটো দেওয়াল দাঁড়িয়েছিল একটা দেওয়ালে কালো বারুদের দাগ। সেই দাগটা ঠিক একটা হাউণ্ড কুকুরের মত। তবে বিরাট আকৃতির। ওখানকার কৃষকরা ঐ দাগটা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওরা ওটাকে 'মৃত্যুর কুকুর' নামকরণ করেছিল। অন্ধকারের পর কেউ ঐ জায়গা মাড়াতো না।

কুসংস্কার সবসময় অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করে। এই অদ্ভুত কাজ করেছে যে নাম আমি তার সাথে দেখা করবো ঠিক করলাম। সে কয়েকজন শরনার্থী নিয়ে ইংলণ্ডে চলে গেছে। আমি ওর খবর জানার জন্য ঘোরাঘুরি শুরু করে দিলাম, জানতে পারলাম, ওকে কর্নওয়ালের ফোলব্রাজে টীয়ার্নে পাঠানো হয়েছে।

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম আমার বোন যুদ্ধের সময় প্রায় কুড়িজন বেলজিয়াম শরনার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিল।

ও বলল সেই মহিলার সঙ্গে দেখা করার আমার ভীষণ ইচ্ছে হল। আমি ওর মুখ থেকে সেই বিপর্যযের বর্ণনাটা শুনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আমি ঐ ব্যাপারে আর মনযোগ দিতে পারিনি, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার মুখে ফোলব্রাজের কথা শুনে আবার মনে পড়লো।

—আমি আমার বোনকে জিজ্ঞাসা করবো, আমি বললাম। সে হযতো এ ব্যাপারে কিছু শুনেছে। অবশ্য সেই বেলজিয়াম শরনার্থীদের অনেক আগেই দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

স্বাভাবিক, তোমার বোন যদি এ ব্যাপারে কিছু জানে তবে দয়া করে আমাকে একটু জানিও।

আমিও আন্তরিকতার সঙ্গে বললাম—নিশ্চয়ই জানাবো।

* * *

টীয়র্ণে যাওয়ার দুদিন পরে এই ঘটনার কথা আমার মনে পড়লো।

—কীটি আমি বোনকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার সেই বেলজিয়ানদের মধ্যে কোন নাম ছিল কি ?

—তুমি সিস্টার মেরী এঞ্জেলীক-এর কথা বলছো কি ?

—সম্ভবত: আমি সাবধানে বললাম, ওর সম্বন্ধে কিছু জান ?

—ও একজন রহস্যময়ী মহিলা এখনও এখানে আছে।

—এই বাড়ীতে !

—না, না। গ্রামে, ডঃ রোজ—তোমার মনে পড়ছে ডঃ রোজকে।

আমি মাথা হেলালাম, তিরাশী বছর বয়স্ক একজন বৃদ্ধের কথা মনে পড়লো। ঐ বৃদ্ধ, ডঃ লেয়ার্ড ?

—তিনি মারা গেছেন। ডঃ রোজ এখানে মাত্র কয়েকবছর এসেছে। ও একজন তরুণ, নানারকম নতুন চিন্তা-ভাবনা করে। সিস্টার মেরীকে নিয়ে ওর প্রচণ্ড উৎসাহ, সিস্টার মেরী নানারকম অপার্থিব দৃশ্য দেখে। এটা একটা ডাক্তারের পক্ষে ভীষণ রহস্যের ব্যাপার। খুব দুঃখের কথা, সিস্টারের যাওয়ার মত কোন জায়গা নেই। ডঃ রোজ খুব দয়ালু। ও ওকে গ্রামে রেখেছে।

সে থামলো, তারপরে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি সিস্টারের সম্বন্ধে কি জান ?

—আমি একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনেছি।

রীয়ান যে গল্পটা বলছিল, সেটা আমি কীটিকে শুনিয়ে দিলাম। কীটি প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে উঠলো।

—ওকে দেখে মনে হয়, ও সবকিছু উড়িয়ে দিতে পারে কীটি বললো।

আমার আগ্রহ বাড়তে লাগলো। আমি সেই সিস্টারের সঙ্গে দেখা করবো।

তুমি কি ভাবছো, আমার জানতে ইচ্ছে করছে। তুমি আগে ডঃ রোজের সঙ্গে দেখা করো। চা খাওয়ার পর গ্রামের মধ্যে চলে যাও না কেন ?

আমি ওর প্রস্তাবটা মেনে নিলাম।

ডঃ রোজের সঙ্গে দেখা করে আমার পরিচয় দিলাম। তরুণটি বেশ ভাল, তবু তার ব্যক্তিত্বে এমন কিছু ছিল বা আমার ঠিক ভাল লাগলো না।

যে মুহূর্তে আমি মেরী এঞ্জেলীকের কথা তুললাম, ওর মুখের ভাব শক্ত হয়ে গেল। আমি ওকে রীয়ানের গল্পটা বললাম। দৃশ্যতঃ তাকে খুব আগ্রহী মনে হলো।

ওহো, সে চিন্তিতভাবে বললো—এতে অনেক কিছুর ব্যাখ্যা হয়।

সে তাড়াতাড়ি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো।

—ব্যাপারটা আমার কাছে ভীষণ আকর্ষণীয়। মহিলা এখানে আসার পর দেখে বুঝেছিলাম. বেশ একটা মানসিক আঘাত পেয়েছে। সে বেশ মানসিক উত্তেজনায়ও ভুগছিলো। নানারকম অদ্ভুত দৃশ্য বা ছায়া দেখতো, তার ব্যাক্তিত্ব বেশ অস্বাভাবিক। আমার সাথে চলুন, দেখবেন। দথার মত ভদ্রমহিলা।

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম।

একসাথে বেরোলাম দুজনে, আমাদের গন্তব্য গ্রামের বাইরে একটা ছোট কুঁড়ে। ফোলব্রীজের প্রাকৃতির দৃশ্য বেশ মনোরম, জায়গাটা একেবারে নদীর মুখে। এক আশ্চর্য তটিনী। 'পশ্চিম পাড়ে বাড়ীঘর পূর্বপাড়ে বাড়ী করার মত জায়গা না থাকলেও পাহাড়ের বুকে কয়েকটা চালাঘর দেখা যাচ্ছিল। ডাক্তারের ঘরটা পশ্চিম পাহাড়ের একেবারে ধারে। এখান থেকে নীচের দিকে তাকালে দেখা যায়, জলের ঢেউ কালো পাথরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাশি রাশি সাদা জুঁইফুলের হাসি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমরা যে চালাটার দিকে যাচ্ছি, সেটা একটু ভেতরে, সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় না।

—এই জেলার নার্স এখানে থাকে, ডঃ রোজ বললো। আমি সিস্টার মেরীকে ওর সাথে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সে দক্ষ পরিচর্যার মধ্যে থাকবে।

—আচ্ছা, ওর আচার ব্যবহার স্বাভাবিক তো? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—এখুনি তো আপনি নিজেই বিচার করে নিতে পারবেন। সে উত্তর দিলো।

জেলা নার্স দেখতে ছোটখাটো, সুন্দর। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন ও একটা সইকেল নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিল।

—শুভ সন্ধ্যা নার্স। তোমার রোগীনির খবর কি? ডাক্তার বললো।

—একই রকম। হাত জড়ো করে বসে থাকে, অনেক দূরে মনে মনে চলে যায়। আমি মাঝে মাঝে কথা বলতে চাইলে উত্তর দেয় না। অবশ্য সে এখনও ইংরেজীটা শিখলো না।

ডঃ রোজ মাথা নাড়লো। নার্স সাইকেলে চড়ে চলে যাওয়ার পর ডাক্তার দরজায় শব্দ করে ঘরে ঢুকে পড়লো।

সিস্টার মেরী এঞ্জেলীক জানালার ধারে একটা লম্বা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল, সে মাথা ঘোরালো।

মুখটা অদ্ভুত বিষণ্ণ, সেখানে অস্তমিত সূর্যের মলিন অন্ধকার। চোখগুলো বড় বড়, অথচ কি ভীষণ রহস্য-কুহকময়! ঐ চোখদুটোতে যেন অসীম বেদনা লুকিয়ে আছে।

—শুভ সন্ধ্যা, সিস্টার। ডাক্তার ফরাসীতে বললো।

—শুভ সন্ধ্যা, ডাক্তার।

—তোমার সঙ্গে আমার বন্ধু মিঃ এ্যামস ট্রুথারের আলপ করে দিচ্ছি।

আমি মাথা নোয়ালাম, সে একটু হেসে তার মাথাটা নামালে।

—আজ কেমন আছো? ডাক্তার ওর পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলো।

—একই রকম আছি। একটু থেমে আবার সে বলতে লাগলো, কোন কিছুই আমার কাছে বাস্তব বলে মনে হয় না। এই যে দিন-মাস-বছরগুলো গড়িয়ে যাচ্ছে, আমার খেয়াল থাকে না। শুধু আমার স্বপ্নই আমার কাছে বাস্তব বলে মনে হয়।

—তাহলে এখনও তুমি স্বপ্ন দেখো?

—সবসময় এবং স্বপ্নকেই জীবনের চেয়ে সত্যি মনে হয়। স্বপ্নের অবাস্তব রূপতন্ময়তার মধ্যে আমি বেঁচে থাকতে চাই।

—তুমি তোমার দেশ বেলজিয়ামের স্বপ্ন দেখ?

সে মাথা নাড়লো।

—না, আমি এমন দেশের স্বপ্ন দেখি যার কোন অস্তিত্ব নেই। তুমি

এটা জান ডাক্তার, আমি তোমায় অনেকবার বলেছি। সে থামলো, তারপর খাপছাড়া ভাবে বললো, সম্ভবতঃ এই ভদ্রলোকও ডাক্তার, মাথার ডাক্তার ?

—না, না। রোজ আশ্বস্ত করে বললো, কিন্তু ডাক্তার যখন হাসলো, আমি শিউরে উঠলাম। একি দেখছি আমি ? ওর দাঁতগুলো অস্বাভাবিক ছুঁচালো, দাঁত দেখে লোকটাকে নেকড়ের মত মনে হয়।

ডাক্তার বলছিল, আমি ভেবেছিলাম তুমি মিঃ এ্যামস ট্রুথারের সাথে আলাপ করে খুশী হবে। উনি বেলজিয়ামের সম্পর্কে খবর রাখেন। উনি সম্প্রতি তোমার কনভেণ্ট সম্বন্ধে কিছু কথা শুনেছেন।

তার চোখ আমার দিকে ঘুরলো, গালে একটা মৃদু রক্তিমাভা দেখা গেল।

—ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। আমি তাড়াতাড়ি বললাম। আমি একদিন আমার এক বন্ধুর সাথে নৈশ-ভোজ খাচ্ছিলাম, ও কথাপ্রসঙ্গে আমাকে কনভেণ্টের ভাঙা দেওয়ালের সম্পর্কে বললো।

—তাহলে ওটা ভেঙে পড়েছে। দূরাগত সংলাপের মত ও মন্তব্য করে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করে বললো, কিভাবে ওটা ভেঙে পড়লো আপনার বন্ধু সে সম্বন্ধে কিছু বলেছেন ?

—ওটা বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছিল। আমি আরও জুড়ে দিলাম, রাত্রিবেলায় কৃষকরা ওদিক দিয়ে যেতে ভয় পায়।

—কেন ভয় পায় ?

—ভাঙা দেওয়ালের একটা কালো ছাপের জন্য।

সে সামনের দিকে ঝুঁকলো।

—আমায় তাড়াতাড়ি বলুন ঐ চিহ্নটা দেখতে কেমন ?

—ওটা একটা বিরাট হাউণ্ডের আকৃতির, আমি উত্তর দিলাম। চাষীরা ওটার নাম দিয়েছে 'মৃত্যুর কুকুর'।

—ওহো!

ওর ঠোঁট থেকে একটা তীক্ষ্ণস্বর বেরিয়ে এলো।

—তাহলে এটা সত্যি। আমি যা মনে করতে পারছি, সমস্ত সত্যি, ওটা কোন কালো দুঃস্বপ্ন নয়, ওটা ঘটেছিল, ঘটেছিল, ওটা ঘটেছিল। হায় ঈশ্বর! সেই ভয়ঙ্কর অতিপ্রাকৃত ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছিল।

—কি ঘটেছিল সিস্টার, ডাক্তার নীচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলো।

সে ওর দিকে আগ্রহভরে ঘুরে তাকালো।

—আমার মনে পড়েছে। ওখানে সিঁড়ির ধারে, আমার মনে পড়ছে। আমি ওটা ব্যবহার করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেছিলাম, যেমন আমরা করি। আমি বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে ওদের আর এগোতে বারণ করেছিলাম, ওদের চুপচাপ চলে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু ওরা শুনলো না, এগিয়ে এলো। তাই—, সে নীচু হয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করলো, এবং তাই আমি 'মৃত্যুর কুকুর'-কে ওদের দিকে লেলিয়ে দিয়েছিলাম।

সে তার চেয়ারে কাঁপতে কাঁপতে এলিয়ে পড়লো, চোখদুটো বন্ধ।

ডাক্তার উঠে কাপবোর্ড থেকে একটা গ্লাস নিয়ে অর্ধেকটা জলে ভর্তি করলো। তারপর পকেট থেকে একটা বোতল নিয়ে গ্লাসটাতে এক ফোঁটা কি দু ফোঁটা দিয়ে ওর কাছে এগিয়ে গেল।

—এটা খাও, আদেশের ভঙ্গিতে সে বললো।

মনে হলো সে অভ্যাস বশতঃ তার কথা শুনলো। তার চোখের দৃষ্টি অনেক দূরে চলে গেছে, যেন সে তার মনের ভেতরকার একটা ছবি দেখছে।

—কিন্তু তাহলে এগুলো সব সত্যি, সিস্টার বললো, সবই। বৃত্তের শহর, স্ফটিকের মানুষ—সব, সমস্তই সত্য।

—তাই মনে হয়। রোজ বললো।

রোজের গলা নীচু আর নরম, ওর চিন্তায় উৎসাহ দিচ্ছে।

—শহরটার কথা আমাকে বল। রোজের প্রশ্ন, তুমি যে বৃত্তের শহরের কথা বললে।

অন্যমনস্কভাবে সে উত্তর দিলো—হ্যাঁ, ওখানে তিনটে বৃত্ত আছে। প্রথম বৃত্তটা বাছাইয়ের জন্যে, দ্বিতীয়টা মেয়ে যাজকদের জন্যে এবং সবচেয়ে বাইরের বৃত্তটা যাজকদের জন্যে।

—আর মাঝখানে ?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অবর্ণনীয় সম্ভ্রমের স্বরে নাম বললো—

—স্ফটিকের বাড়ী—

এই কথাটা বলতে বলতে রোজের ডানহাতটা মেরীর কপালে উঠে গেল এবং তার আঙুল ওর কপালে অদ্ভুত ছবি এঁকে দিলো।

তার চেহারা শক্ত হতে আরম্ভ করলো। তার চোখ বন্ধ হয়ে একটু একটু কাঁপলো, তারপর হঠাৎ সে ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসলো, যেন সে এইমাত্র ঘুম থেকে জেগে উঠলো।

মেরী একটু হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—আমি কি বলছিলাম ?

—কিছু না। রোজ বললো, তুমি অবসন্ন, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। আমরা এখন চলে যাচ্ছি।

আমরা যখন চলে আসছিলাম, ওকে একটু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল;

বাইরে এলাম। রোজ প্রশ্ন করলো—ওর সম্বন্ধে কি ধারণা হলো ?

ডাক্তার আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

—আমার মনে হয় তার মনটা একেবারে অবলম্বনহীন। আমি আস্তে আস্তে বললাম।

—আপনার এই মনে হলো ?

—না, বস্তুতঃপক্ষে তার কথাগুলো অদ্ভুতভাবে বিশ্বাসযোগ্য, আমি যখন ওর কথা শুনছিলাম তখন মনে হচ্ছিল ও যা বলছে, সত্যি, সত্যিই সে একটা বিস্ময়কর কাজ করেছে। তার বিশ্বাস অসত্য নয়। তাই—

—সেই জন্যে বললে, তার মনটা অবলম্বনহীন।

—ঠিক তাই। তবে অন্য দিক থেকে ব্যাপারটা দেখুন। ধরুন, সে-ই বাড়ীটা ধ্বংস করেছিল, কয়েকশো মানুষকে উড়িয়ে দিয়েছিল, যদি এ সব সত্যি বলে ধরে নিই—

—শুধু ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে, আমি হেসে বললাম।

—আমি ঠিক ওভাবে ভাবছি না। আপনি জানেন মাইণ্ড কণ্ট্রোলের একটা বোতাম টিপে একটা লোক অনেক লোককে ধ্বংস করে দিতে পারে।

—হ্যাঁ জানি ; কিন্তু সেটা যান্ত্রিক।

—সত্যি, যান্ত্রিক। তবে আসলে এটাতো প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগানো, মূলতঃ বজ্র এবং পাওয়ার হাউস সমান জিনিস।

—হ্যাঁ, তবে বজ্রতে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে আমাদের যান্ত্রিক কৌশল প্রয়োগ করতে হয়।

রোজ হেসে বললো, আমি আমার কথা থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। প্রকৃতিতে গাছের ওয়াটার গ্রীন নামে একটা বস্তু আছে। মানুষ এটাকে ল্যাবরেটরীতে কেমিক্যাল ও সিনথেটিক উপায়ে তৈয়ারী করতে পারে।

—আচ্ছা ?

—আমার বক্তব্য হচ্ছে একই জিনিষ পেতে আমরা দুটো পথ নিতে পারি। আমাদেরটা নিশ্চয়ই সিনথেটিকের রাস্তা, অন্য রাস্তাও থাকতে পারে। ভারতীয় ফকিররা যে সব অদ্ভুত জিনিষ তৈরী করতে পারতো তার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। আমরা যাকে অপ্রাকৃতিক বলে থাকি তা হয়তো অপ্রাকৃতিক নয়। একটা ফ্ল্যাসলাইট একজন বন্য লোকের কাছে অলৌকিক, সেই বিচারে আমরা যার কারণ বুঝি না সেগুলোকেই আমরা অপ্রাকৃতিক অতিলৌকিক বলে থাকি।

—তুমি কি বলতে চাইছো ? আমি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম।

—আমি এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছি না যে কোন মানুষ একটা বিরাট শক্তিকে আয়ত্তে আনতে পারে এবং সেটাকে নিজের কাজে লাগাতে পারে। এটা যেভাবে হয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে তা অপ্রাকৃতিক কিন্তু আসলে হয়তো তা নয়।

আমি ওর দিকে তাকালাম।

সে হাসলো।

—এটা অনুমান ছাড়া কিছু নয়। হাল্কাসুরে বললো, লক্ষ্য করেছেন মেরী যখন স্ফটিকের বাড়ীর কথা বললো, তখন কেমন ভঙ্গী করেছিল ?

—সে তার কপালে হাত রেখেছিল।

—ঠিক বলেছেন, কপালে একটা বৃত্ত এঁকেছিল, যেমন ক্যাথলিকরা

ক্রস আঁকে। মিঃ ম্যানসট্রথার, এবার আপনাকে একটা মজার কথা বলবো। আমার রোগিনী মাঝে মাঝেই এই স্ফটিক কথাটা বলে থাকে। আমি একটা গবেষণা করি। একজনের কাছ থেকে একখানা স্ফটিক নিয়ে হঠাৎ একদিন ওর সামনে বের করি, ওর প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করার জন্য।

—তারপর।

—ফলটা হল অদ্ভুত। তার সমস্ত দেহ শক্ত হয়ে গেল। সে ওটার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো। যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারপর স্ফটিকটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো এবং কয়েকটা কথা অস্ফুটে বলে অচেতন হয়ে গেল।

— কথাগুলো কি বলেছিল ?

— কথাগুলো আরও অদ্ভুত। সে বলেছিল, স্ফটিক, তাহলে বিশ্বাস এখনও বেঁচে আছে ?

— অসাধারণ !

—আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলছি। সে যখন তার চেতনায় ফিরে এলো সে সমস্ত ব্যাপারটাই ভুলে গেছিল, আমি তাকে স্ফটিকটা দেখিয়ে বললাম, এটা কি জানো, সে উত্তর দিল 'যাঁরা ভবিষ্যত বক্তা তারা বোধহয় এই ধরণের স্ফটিক ব্যবহার করে থাকে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই ধরণের স্ফটিক ও আগে দেখেছে কিনা। সে উত্তর দিয়েছিল, না, সে এরকম জিনিস কোনদিন দেখেনি।

…কিন্তু আমি তার মুখে একটা অবাক দৃষ্টি দেখছিলাম। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, সিস্টার তোমার কষ্ট হচ্ছে ? সে উত্তর দিল, না। তবে এটা খুবই অদ্ভুত। আমি আগে এরকম জিনিস দেখিনি। তবুও আমার মনে হচ্ছে আমি এটা ভাল করে জানি। কিছু একটা আছে, যদি আমি মনে করতে পারতাম। তার স্মৃতির জন্য হাতড়ানো এত কষ্টকর যে আমি ওকে আর এনিয়ে ভাবতে বারণ করেছিলাম। ঘটনাটা দুসপ্তাহ আগের। আমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে সময় কাটাচ্ছি। কাল আমি আবার পরীক্ষা চালাবো।

— স্ফটিক দিয়ে ?

—হ্যাঁ স্ফটিক দিয়ে। আমি ওকে স্ফটিকের মধ্যে দিয়ে দেখতে বলবো ফলটা নিশ্চয়ই অদ্ভুত হবে।

আমি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি আশা করছেন ?

কথাগুলো স্বাভাবিক। তবে কথাটার একটা অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া হল। রোজ শক্ত হল, চমকে উঠলো, তারপর সে যখন কথা বললো তখন তার ব্যবহার পাল্টে গেল, কথাগুলো এবার পেশাগত হল।

—একটা মানসিক বিপর্যয়ের উপর আলোকপাত করবে। মেরী এঞ্জেলীকের কেসটা একজন ডাক্তারের পক্ষে উৎসাহজনক।

তাহলে রোজের উৎসাহের সমস্তটাই পেশাগত আমি ভাবতে লাগলাম।

—আমি যদি আসি, আপনার আপত্তি আছে কি ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

এটা হয়তো আমার কল্পনা তবে আমার মনে হলো ও উত্তর দেওয়ার আগে একটু ইতস্ততঃ করলো। হঠাৎ আমার মনে হলো, ও আমাকে নিতে চায় না।

রোজ আরও বললো, আপনি বোধহয় এখানে বেশীদিন থাকছেন না ?

—পরশুদিন পর্যন্ত থাকবো।

আমার মনে হলো, উত্তরটা ওর সন্তুষ্টির কারণ হবে।

* * *

কথামত পরের দিন বিকেলে আমি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলাম। আমরা একসাথে জেলা নার্সের বাড়ীতে চললাম। ডাক্তার আজ ভীষণ-ভদ্র, যেন তার কালকের ব্যবহারটা মুছে ফেলতে চায়।

—খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে আমি যেসব বলেছিলাম, সেসব মনে রাখবেন না। ডাক্তার হাসতে হাসতে বললো। আমার রহস্যপূর্ণ বিজ্ঞানে বিশ্বাস করবেন না। সবকিছুতে আমি প্রচণ্ড উৎসাহ পাই।

—তাই নাকি ?

—যত বেশী অসম্ভব, সে জিনিসে আমার আকর্ষণ তত বেশী।

সে তার এই দুর্বলতার জন্যে হাসলো।

আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন জেলার নার্স ডাক্তারের সাথে কিছু একটা পরামর্শ করার জন্য ডেকে নিয়ে গেল, আমি একা হয়ে গেলাম।

আমি দেখলাম, সিস্টার আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। তারপরে কথা বললো।

—এখানকার নার্স আমায় বলেছে তুমি ঐ বিরাট বাড়ীটার ভদ্রমহিলার ভাই। ঐ বাড়ীতে আমি বেলজিয়াম থেকে এসে আশ্রয় পাই।

—হ্যাঁ, আমি বললাম।

—তিনি খুব ভাল।

সে চুপ করলো যেন কোন চিন্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপরে বললো এই ডাক্তারও ভাল লোক, তাই না?

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলাম।

—হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়।

—আহা, সে থেমে আবার বললো, তিনি আমাকে অনেক দয়া করেছেন।

—নিশ্চয়ই করবেন।

সে আমার দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকালো।

—আপনি, এই আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন, আপনি বিশ্বাস করেন আমি পাগল?

—কেন, সিস্টার, এরকম ভাবনা কোনদিন—

সে তার মাথা আস্তে আস্তে নাড়িয়ে আমার কথায় শায় দিলো, আমি কি পাগল? আমি জানি না, আমি আনেক কিছু মনে করার চেষ্টা করি, কিন্তু ভুলে যাই।

সিস্টার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো, সেই মুহূর্তে ডঃ রোজ ঘরে ঢুকলো।

ডাক্তার তাকে আনন্দিত ভাবে সম্ভাষণ জানিয়ে বললো, সে মেরীকে নিয়ে কি করতে যাচ্ছে।

—কোন কোন লোকের স্ফটিকের ভেতরে নানান দৃশ্য দেখার অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে। তোমারও সেই রকম ক্ষমতা থাকতে পারে সিস্টার।

মেরীকে বিপর্যস্ত দেখালো—না না, আমি তা করতে পারি না। ভবিষ্যতকে জানতে চাওয়া ভীষণ-পাপ কাজ।

রোজ অবাক হল। নানের দৃষ্টি ভঙ্গীতে তার কথা যখন থামলো না, সে চতুর ভাবে অন্য কারণে চলে গেল, কারুর ভবিষ্যত দেখতে চাওয়া উচিত নয়, ঠিক বলেছো। তবে অতীতকে দেখা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

— অতীত ?

—হ্যাঁ। অতীতের অনেক কিছু আছে। ওরা বিদ্যুতের মত মাঝে মাঝে মনে পড়ে আবার মিলিয়ে যায়।

—না, তোমার স্ফটিকের ভেতর দিয়ে ভবিষ্যতকে দেখতে হবে না, তুমি শুধু এটা হাতে নিয়ে এর ভেতরটা দেখ। হ্যাঁ, এর গভীরে, আরও গভীরে। তোমার মনে পড়ছে ? পড়ছে না, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, আমার কথার উত্তর দিতে পারবে ? আমার কথা শুনতে পারছো।

মেরী এঞ্জেলীক তার হাতে শ্রদ্ধাভরে স্ফটিকটা নিল। তারপরে ওটার দিকে দেখতে দেখতে তার মাথা সামনের দিকে নেমে এলো, যেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আস্তে আস্তে ডাক্তার তার হাত থেকে স্ফটিকটা নিয়ে টেবিলের উপর রেখে আমার পাশে এসে বসলো।

— ওর চেতনা না আসা পর্যন্ত বসতে হবে। খুব বেশী দেরী হবে না।

ঠিক কথা বলেছে, পাঁচ মিনিট পরেই মেরীর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল, স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবে তার চোখ খুলে গেল।

—আমি কোথায় ?

—তুমি বাড়ীতে আছ। তুমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলে। স্বপ্ন দেখেছিলে তাই না ?

—হ্যাঁ।

—তুমি স্ফটিকের স্বপ্ন দেখছিলে ?

— হ্যাঁ,

— আমাদের বল।

— আপনারা আমায় পাগল ভাববেন। কারণ আমি স্বপ্নে স্ফটিককে

পবিত্র প্রতীক হিসাবে দেখলাম। আমি চিন্তা করলাম, খ্রীষ্ট যিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য মারা গেছেন, তারা অনুরাগীদের খুঁজে খুঁজে সারা হয়েছিল, তবুও তার বিশ্বাস স্থায়ী হয়েছে।

—বিশ্বাস স্থায়ী হয়েছে?

—হ্যাঁ, পনেরো হাজার বছর ধরে, পনেরো হাজার পূর্ণিমা ধরে।

—একটা পূর্ণিমা কতদিনের?

—সাধারণ চাঁদে তেরো। হ্যাঁ, পনেরো হাজার পূর্ণিমার সময় আমি স্ফটিকের বাড়ীতে পঞ্চম চিহ্নের একজন স্ত্রী যাজক ছিলাম। ষষ্ঠ চিহ্ন আসার প্রথম দিনে—

তার ভুরুদুটো কুঁচকে গেল, একটা ভয়ের চিহ্ন তার চোখের তারায় ফুটে উঠলো।

—খুব তাড়াতাড়ি, মৃদুস্বরে বললো, খুব তাড়াতাড়ি। একটা ভুল, হ্যাঁ আমার মনে পড়ছে। ষষ্ঠ চিহ্ন!

সে তার পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে আবার বসে পড়লো, আমি কি বলছি, আমি স্বপ্ন দেখছি। এসব ঘটনা কোনদিন ঘটেনি।

—নিজেকে আর কষ্ট দিও না বোন। ডাক্তার বললো।

কিন্তু সিস্টার তার দিকে যন্ত্রণাকাতর বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে দেখলো।

—ডাক্তার; আমি বুঝতে পারিনা, আমার এইরকম কল্পনা কেন হয়। ষোল বছর বয়সে আমি চার্চে যোগ দিই, আমি কোথাও যাইনি। তবুও আমি শহরে অচেনা লোকের স্বপ্ন দেখি। কেন?

সে দুহাত দিয়ে তার মাথা চেপে ধরলো।

—তোমাকে কোনদিন সম্মোহিত করা হয়েছিল, সিস্টার বা আচ্ছন্ন করা হয়েছিল?

—আমি কোনদিন সম্মোহিত হইনি, তবে চার্চে আমি যখন প্রার্থনা করতাম, আমার প্রাণটা কোথায় চলে যেতো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি মৃতের মত থাকতাম, চার্চের রেভারেণ্ড মাদার আমায় বড় ভক্ত ভাবতেন, বলতেন আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়েছি। সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে

বললো, আমরাও ভাবি এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

—আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই সিস্টার, ডাক্তার সহজ গলায় বললো। এতে হয়ত তোমার স্মৃতির কষ্টটা চলে যাবে। আমি তোমায় স্ফটিকটা দেখতে বলছি। তারপরে আমি তোমায় একটা কথা বলবো তুমি তার উত্তর দেবে। তুমি ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কথা বলে যাব। তুমি স্ফটিকের উপর তোমার মনকে কেন্দ্রীভূত কর।

আবার স্ফটিকটা বের করে সিস্টারের হাতে দেওয়া হলো, সে শ্রদ্ধার সাথে সেটা গ্রহণ করলো। কালো ভেলভেটের মধ্যে স্ফটিকটা তার দুহাতের তালুতে রেখে দেওয়া হলো। তার বিস্ময়ভরা দুটো বড় বড় চোখ স্ফটিকে কেন্দ্রীভূত হলো।

ডাক্তার বললো – হাউণ্ড।

সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জেলীক উত্তর দিল – মৃত্যু।

আমি কথাগুলো সব বলছি। ডাক্তার উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনেক জিজ্ঞাসা করলো। কয়েকটা প্রশ্ন বার বার করলো, এক এক সময় একই উত্তর এলো, কোন সময় অন্য উত্তর।

সেই বিকেলে ডাক্তারের ঘরে বসে আমরা পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম।

ডাক্তার একটা নোটবুক নিয়ে বলতে লাগলো – এই সব পরীক্ষার ফল বেশ উৎসাহজনক, অদ্ভুত। 'ষষ্ঠ চিহ্ন' কথাটার উত্তরে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। যেমন, ধ্বংস, গাঢ় লাল, হাউণ্ড, শক্তি। তারপর আবার ধ্বংস এবং শেষে শক্তি। তারপরে আপনি দেখেছেন, আমি প্রশ্নগুলোকে উল্টে দিলাম। তাতে ধ্বংসের উত্তর পেলাম হাউণ্ড। লালের উত্তরে শক্তি। আবার হাউণ্ড প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যু। কিন্তু দ্বিতীয়বার ধ্বংসের উত্তরে আমি পেলাম সমুদ্র যা খুব অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে।

···পঞ্চম চিহ্নের উত্তরে পাওয়া গেল নীল, চিন্তা, পাখী, আবার নীল এবং শেষকালে একটা মনের কাছে আর একটা মনের উন্মোচন। চতুর্থ চিহ্নে পাওয়া গেছে হলদে, পরে আলো এবং প্রথম চিহ্নের উত্তর বললো রক্ত। আমি মনে করছি, প্রত্যেক চিহ্নের একটা বিশেষ রঙ এবং বিশেষ

প্রতীক আছে। যেমন পঞ্চম চিহ্নের 'পাখী' ষষ্ঠ চিহ্নের 'হাউণ্ড', যাই হোক এই যে কথাটা 'একটি মনের কাছে আর একটা মনের উন্মোচন' এটা টেলিপ্যাথির ব্যাপার। ষষ্ঠ চিহ্ন নিশ্চয়ই ধ্বংস শক্তি বোঝায়।

—সমুদ্রের মানে কি?

—আমি স্বীকার করছি এটার মানে আমি বুঝতে পারিনি। আমি পরে আবার প্রশ্নটা করেছিলাম। একটা সাধারণ উত্তর পেলাম 'নৌকা'। সপ্তম চিহ্নের উত্তরে আমি প্রথমে পেলাম 'জীবন', তারপরের উত্তর 'ভালবাসা'। অষ্টম চিহ্নের উত্তরে পাওয়া গেল 'কিছু না'। অর্থাৎ এভাবেই এই চিহ্নগুলোর শেষ হয়েছে।

এভাবেই এই চিহ্নগুলোর শেষ হয়েছে।

—কিন্তু সাতটা তো এখনও হয়নি। হঠাৎ উৎসাহের বশে বলে ফেললাম, কারণ, ছয়েতে সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

—ও, আপনি এইভাবে ভাবছেন। কিন্তু আমি এই পাগলের প্রলাপকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। ডাক্তারী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে খুব আকর্ষণীয়।

—নিশ্চয়ই, মানসিক গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

ডাক্তারের চোখ ছোট হয়ে এলো।

—মশাই, এগুলো প্রকাশ করার ইচ্ছে আমার নেই।

—তাহলে আপনার লাভ?

—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি কেসের উপরে নোট রাখবো।

—বুঝতে পারছি, আমি বললাম, তবে এই প্রথমবার আমি কিছু বুঝলাম না, আমি উঠে দাঁড়ালাম।

—ডাক্তার, শুভ রাত। আমি কাল শহরে ফিরে যাচ্ছি।

—ও-হো তাই নাকি? তার এই কথাটার পেছনে আমি স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করলাম।

— আপনার পরীক্ষায় আমি সাফল্য কামনা করি। আমি হাল্কাস্বরে বললাম, তবে পরে দেখা হলে আমার উপর 'মৃত্যুর কুকুর' লেলিয়ে দেবেন না!

যখন এই কথাটা বলছিলাম, তখন তার হাতটা আমার হাতের মধ্যে

ছিল। তার হাতটা স্তব্ধ হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে হাসলো। তার ঠোঁটের উপর দিয়ে ছুঁচোলো দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়লো।

—যে লোক শক্তি ভালবাসে, তার কাছে এই শক্তিটা মারাত্মক হবে। সে বললো। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারবে!

তার হাসি বিস্তৃত হল।

* * * * *

এইখানেই ব্যাপারটার সাথে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সমাপ্তি।

পরে ডাক্তারের ডায়েরী এবং নোটবুক হাতে আসে। আমি ওগুলো থেকে কয়েকটা লেখা দেখাবো, তবে বুঝতে পারছেন, ডায়েরীটা বেশ কিছুদিন পরে আমার হাতে এসেছিল।

আগস্ট ৫, আবিষ্কার করেছি 'বাছাই করা'। কটা কথায় সিস্টার এম. এ. বলতে চেয়েছে, যারা এই জাতির সৃষ্টি করেছে, তাদের খুব সম্মানের চোখে দেখা হয় এবং খ্রীস্টের ওপরে ওদের স্থান। আগের খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের সাথে এর অনেক ফারাক।

আগস্ট ৭, আমি সিস্টারকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সম্মোহন করার অনুমতি পেয়েছি। সম্মোহন করতে পেরেছি, কিন্তু কোন সম্বন্ধ পাওয়া যায়নি।

আগস্ট ৯, অতীতে কি এমন একটা সভ্যতা আছে যার সঙ্গে আমাদের কোন তুলনা হয় না। যদি থাকে তবে খুব বিস্ময়কর ব্যাপার। আমিই একমাত্র এর সূত্র জানি।

আগস্ট ১২, সিস্টার সম্মোহিত হলে কোন কথা শুনতে চায় না। তবে সহজে আচ্ছন্ন হয়। বুঝতে পারছি না।

আগস্ট ১৩, সিস্টার এম, এ, আজ বলেছে 'আশীর্বাদ 'দরজা,' নিশ্চয়ই বন্ধ', যদি অন্য কেউ দেহটা অধিকার করে—বুঝতে পারছি না।

আগস্ট ১৮, সুতরাং প্রথম চিহ্ন তাহলে (এখানে শব্দ কেটে দেওয়া হয়েছে) ছাড়া কিছু নয়। তাহলে ছুঁয়ে পৌঁছতে হলে ক'শত বছর লাগবে? কিন্তু শক্তি পাওয়ার যদি কোন সহজ রাস্তা থাকতো····।

আগস্ট ২০, এম, এ-কে নার্সের সাথে এখানে আনার ব্যবস্থা করেছি।

আমি ওকে বলেছি, রোগীকে মরফিয়া খাওয়ানো দরকার, আমি কি পাগল ? অথবা আমি অতিমানব, আমার হাতে মৃত্যু বাঁধা।

এখানে ডায়েরী শেষ হয়েছে।

* * *

মনে হয় আগস্টের উনত্রিশ তারিখের আমি চিঠি পাই। বিদেশী হাতে লেখায় আমার বোনের তত্বাবধানে আমার কাছে চিঠিটা লেখা। আমি আগ্রহের সঙ্গে চিঠিটা খুললাম, লেখা ছিল—

মহাশয়,

আমি আপনাকে মাত্র দুবার দেখেছি, তবুও মনে হয় আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি। আমার স্বপ্ন সত্যি হোক বা মিথ্যে হোক এতদিনে সেগুলো পরিষ্কার হয়েছে। এবং একটা কথা বলতে পারি 'মৃত্যুর কুকুর' কোন স্বপ্ন নয়।...আমি আপনাকে বলেছিলাম (সত্যি কি মিথ্যে আমি জানি না) যিনি স্ফটিক বাড়ীর কর্তা তিনি জনগণের কাছে সম্প্রতি ষষ্ঠ চিহ্ন প্রকাশ করবেন। শয়তান তাদের হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করেছে। ওদের হাতে হত্যা করবার ক্ষমতা আছে এবং ওরা রাগে বিচার না করে হত্যা করবে। তারা শক্তির আকাঙ্ক্ষায় মদ খেয়েছে।

...যখন আমরা এটা দেখি, আমরা যারা এখনও ভাল আছি, আমরা মানি আবারও আমরা বৃত্তটা শেষ করবো না এবং চিরন্তন জীবনের চিহ্নে চলে যাব। যিনি পরবর্তী স্ফটিকের কর্তা তিনিই কাজ করবেন। পুরাতনরা হয়তো মরে যাবে, নতুনরা অনেক যুগ পরে আবার ফিরে আসবে, তিনি 'মৃত্যুর কুকুরকে' সমুদ্রের ওপরে ছেড়ে দিয়েছেন (বৃত্তটা সম্পূর্ণ না করার ব্যাপারে সাবধান থেকে) এবং সমুদ্র একটা হাউণ্ডের আকারে উঠে এসে তটভূমিকে গিয়ে ফেলবে।

...একবার আমার মনে পড়েছিল। "বেলজিয়ামের বেদীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে... ..

...ডঃ রোজ প্রথম চিহ্নের কথা জানেন এবং দ্বিতীয়টার আকৃতিও জানেন। যদিও এর মানেটা বিশেষ কয়েকজনের মধ্যে সীমায়িত। তিনি আমার কাছ থেকে ষষ্ঠটাও জেনে নেবেন। আমি এ পর্যন্ত সহ্য

করেছিলাম, এবার দুর্বল হয়ে পড়েছি। মহাশয়, সময় আসার আগে কারুর শক্তিমান হয়ে ওঠা ঠিক নয়। অনেক শত বছর পরেই মৃত্যুর ক্ষমতা দেওয়া হবে। আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি আপনার কাছে। আপনি মঙ্গল ভালবাসেন। সময় শেষ হবার আগে আপনি আমায় বাঁচান।

আপনার বোন
মেরী এঞ্জেলীক।

আমার হাত থেকে কাগজটা পড়ে গেল। পায়ের নীচের শক্ত মাটি আরও বেশী শক্ত বলে মনে হচ্ছিল। বেচারা মেয়েটার বিশ্বাস আমাকেও প্রভাবিত করেছে, একটা কথা পরিষ্কার, ডঃ রোজ তার ডাক্তারের অধিকার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমায় এক্ষুনি যেতে হবে—

হঠাৎ অন্য চিঠি পত্রের মধ্যে আমি কীটির একটা চিঠি দেখলাম।

চিঠিটা খুললাম।

'একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে গেছে' আমি চিঠিটা পড়ছিলাম, 'তুমি পাহাড়ের ধারে ডঃ রোজের ছোট ঘরটা মনে করতে পারছো? ঘরটা কাল রাতে একটা ধ্বসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ডঃ রোজ এবং বেচারা মেরী মারা গেছে। সমুদ্রের তীরে বিরাট ধ্বংসস্তুপ জমে আছে, দূর থেকে এই স্তুপটাকে একটা বিরাট হাউণ্ডের মত মনে হচ্ছে……

হাত থেকে চিঠিটা পড়ে গেল।

আর একটা ব্যাপার হয়তো কাকতালীয়। ডঃ রোজের এক ধনী আত্মীয় কাল রাতে হঠাৎ মারা গেছেন। শোনা গেছে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। যতদূর জানি কাল রাতে কোন ঝড়বৃষ্টি হয়নি, তবে কেউ ওরা মেঘের গর্জন শুনেছে। তাঁর গায়ে একটা ইলেকট্রিকে পোড়া ছাপ দেখা গেছে। ছাপটা অদ্ভুত আকৃতির।

উইলে তিনি তাঁর সব সম্পত্তি তাঁর ভাগনে ডঃ রোজকে দিয়ে গিয়েছিলেন।

এবার ধরে নিলাম ডঃ রোজ সিস্টারের কাছ থেকে ষষ্ঠ চিহ্নটা আদায় করে নিয়েছিল। ডঃ রোজকে আমার সর্বদা বেপরোয়া মনে হতো।

সিস্টারের একটা কথা আমার মাথায় কেবল ঘুরপাক খাচ্ছিল, বৃত্তটা শেষ না করা সম্বন্ধে সাবধান থেকে। ডঃ রোজ এই সাবধানতা নেয় নি, বোধ হয় কথাটা জানতো না। তাই যে শক্তিকে সে কাজে লাগিয়েছিল সেটা ফিরে এসে তার বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছিল।

তবে এসবই আজেবাজে চিন্তা, সবকিছুর স্বাভাবিক কারণ দেখানো যেতে পারে। ডঃ রোজ যে মেরীর কথায় বিশ্বাস করতো, এতে প্রমাণ হচ্ছে তার নিজের মাথার স্ক্রু একটু ঢিলে ছিল।

তবে কখনও কখনও আমি সমুদ্রের তলায় একটা সভ্যতার কথা ভাবি যে সভ্যতা আমাদের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে ছিল……।

অথবা সিস্টার মেরী কি অতীতের ঘটনা দেখতে পেতো? কেউ কেউ বলে সে ও সম্ভব। এই বৃত্তের শহর অতীতের ঘটনা না ভবিষ্যতের ঘটনা?

* * *

অথবা সবই বাজে ব্যাপার, সমস্ত জিনিসটাই অসুস্থ কল্পনার ফল।
পাঠক, পাঠিকারা এই অদ্ভুত কাহিনীর কোন সত্যতা আছে কি?

আগাথা ক্রিস্টি।

এই শতাব্দীর গোয়েন্দা ও রহস্য সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় নাম। ১৯২০ সালে প্রকাশিত মার্ডার এ্যাট দ্য ভিক্যারেজ উপন্যাসের মাধ্যমে ক্রিস্টির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এরপর একে একে সত্তরটি উপন্যাস রচনা করে ক্রিস্টি শত সহস্র পাঠক পাঠিকাকে বিনম্র বিস্ময়ে বিদ্ধ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট অবিস্মরণীয় গোয়েন্দা চরিত্র এরকুল পোয়ারো আজ বিশ্ববাসীর কাছে অবিসংবাদিত জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অন্য দুটি গোয়েন্দা চরিত্র মিস মার্পল এবং পারকরে পাইন জনপ্রিয়তার নিরীখে পোয়ারোর সমতুল্য না হলেও সাহিত্য বিচারে অনন্য।

নিখাদ রহস্যের গোয়েন্দা কাহিনী রচনার অবসরে রহস্য সম্রাজ্ঞী ক্রিস্টি দুটি একটি ভীতি বিহ্বল আলৌকিক কাহিনী রচনা করেছেন। তারই অন্যতম দি হাউণ্ড অব ডেথ যেটি অপরিচিতা নামে বাংলায় রূপান্তরিত হল।

কঙ্কালের অভিসার

আলফ্রেড হিচ্‌কক্‌

'তবু কুহকিনীর মায়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে পল।...ধীরে ধীরে কামনাময়ী এক রমণী বেরিয়ে আসে,'

*　　　*　　　*

ইটালীর বন্দর লাসস্পেজিয়াতে এই কাহিনীর শুরু।

বিশ্বাস করুন, আপনাদের কোন ভূতের গল্প শোনাতে বসিনি। আসলে ভূতের অস্তিত্বে আমার কোন বিশ্বাস নেই। কিন্তু......

ঐ নগরের মিউজিয়ামে আছে এক আশ্চর্য নারীমূর্তি; যার নাম অ্যাটলাণ্টা। কাঠের তৈরী, দেখলে মনে হয় যেন প্রাণস্পন্দনে ভরা। বুঝি অষ্টাদশী কোন তন্বী তরুণী আবেগে অনুরাগে থরথর করে কাঁপছে।

সোনালী চুলের রক্তের মত টকটকে লাল গাউন পরা অ্যাটল্যাণ্টাকে ঘিরে নগরবাসীর কৌতূহলের অন্ত নেই।

সেই কবে কোন্‌ বিগত যুগে জাহাজে ভাসতে ভাসতে কাঠের মূর্তিটি স্থান পেয়েছিল এই বন্দরে, কে জানে।

মিউজিয়ামের কিউরেটার মিস্টার পল স্মিথ, বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস, সাধাসিধে সরল প্রকৃতির মানুষ, অবিবাহিত, থাকেন মিউজিয়াম সংলগ্ন কোয়ার্টারে। সারাদিন কাটিয়ে দেন অ্যাটলাণ্টার পাশে। এমন কি রাতের অন্ধকারেও মোমের আলো জ্বেলে কাঠের মূর্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন অপলক।

বন্ধুরা ঠাট্টা করে, বান্ধবীরা টিটকিরি দেয়, বসের কাছে বকুনি খেতে হয়। তবু কুহকিনীর মায়ায় হাবু ডুবু খাচ্ছে পল।

তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল হঠাৎ।

সেটা ছিল এক ধূসর মলিন বাসন্তী বিকেল।

দক্ষিণ ইউরোপে বসন্ত কাল মানে অফুরন্ত উৎসবের অবিরাম উল্লাস নয়, মাঝে মাঝে সেখানে বেজে ওঠে করুণ রাগিণী।

লেখার উপকরণ সংগ্রহ করার জন্যে আমিও মাঝে মাঝে মিউজিয়ামে যেতাম। কতদিন আনমনে দেখেছি পলকে, কাঁচের শো কেসে ঢাকা কাঠের মুর্তির দিকে তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবছে।

সেদিন আচমকা তার পিঠে হাত রাখতেই সে একেবারে চমকে উঠল। তারপর তার স্বপ্ন ভরা দুটি চোখ মেলে ধরলো আমার দিকে।

বললো—আপনিই তো মিষ্টার হিচকক? তাই না?

এবার বুঝি আমার অবাক হবার পালা। কোনমতে ঘাড় কাত করে বলি—হ্যাঁ, আমিই সেই। কিন্তু···

—আমি সব বুঝতে পারি। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে যা ঘটে গেছে, পাঁচশো বছর পর যা ঘটবে তা সবই আমার নখদর্পণে।

পাগলের পাগলামি না কি আহাম্মকের বুজরুকি! আমি মনে মনে প্রশ্ন করি কি আশ্চর্য। পল সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—ভাবছেন, এ সব শুধু মুখের কথা। তাহলে শুনুন আমার কাহিনী·····

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাই। আকাশ ঘিরে কালো মেঘ দুরন্ত দামাল কিশোরের মত ছুটোছুটি করছে, দমকা বাতাসে ভূমধ্যসাগরের ঘুম ভাঙাছে যেন।

পল স্মিত বলতে থাকে—আজ থেকে ঠিক দুশো বছর আগের কথা।

* * *

সেটা ছিল ১৭৭৪ সালের ১৩ই অক্টোবর। আমি আর অ্যাটলান্টা সাগরে ভাসিয়েছিলাম প্রমোদ তরণী। সে আমার সদ্য বিবাহিতা তরুণী বৌ। তার রূপের দৃষ্টি পৃথিবীর বুকে জ্যোৎস্না নেমে আসে।

বিয়ের পর কয়েক মাস কেটে গেল দারুণ আনন্দে। ভালবাসার আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে আমরা কে কোথায় ছিটকে গেলাম কে জানে।

কিন্তু অত সুখ বুঝি সইলো না আমার।

ভাসতে ভাসতে তরণী যখন পা রেখেছে পারস্য উপসাগরে তখন হঠাৎ ঘটলো সেই অঘটন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মৃদু মন্দ বাতাসের প্রলয় শিহরণে আবিষ্ট হয়ে হাতে হাত রেখে আমরা হাঁটছিলাম বনের পথে।

আমার কৌতুকে অ্যাটলান্টা খিলখিলিয়ে হেসে উঠছিল।

হঠাৎ কি যেন দংশন করলো তাকে। অস্ফুট একটা শব্দ করে সে উপুড় হয়ে পড়লো।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি বিহ্বল। দেখি অ্যাটলান্টার চিবুকে রক্তাক্ত ক্ষত, শুচি স্মিতা দাঁতের ফাঁকে লাল রক্তের স্রোত।

চোখদুটি বিস্ফারিত, দেহে প্রাণ নেই।

আমি অ্যাটলান্টাকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম। তার কোমল বুকে মাথা রেখে শিশুর মত ছটফট করলাম। সে কথা বললো না, হাসলো না। ভালোবাসার আবেগে কপালে আঁকলো না উষ্ণ চুম্বন। সে নিথর হয়ে পড়ে রইলো।

তারপর সেই মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে আমি পার হয়েছি দীর্ঘ পথ। অবশেষে মমির দেশ মিশরে গিয়ে অ্যাটলান্টাকে আমি কাঠের মমি করে দিই।

তারপর সে এসেছে এই বন্দরে। আমিও নতুন ভাবে জন্ম নিয়েছি পল স্মিথ নামে।

কিন্তু অ্যাটলান্টাকে আমি ভুলতে পারিনি।

তাই জীবনের পর জীবন ধরে এমন ভাবে তাকে পাহারা দিই, যাতে সে একমুহূর্তের জন্যে আমার চোখের আড়ালে চলে না যায়।

বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছে। পল স্মিথ দুহাতে কপাল চেপে স্থির হয়ে বসে।

মনের আকাশে অবিশ্বাসের মেঘ জমছে—যা শুনলাম তা কি সত্যি?

আমাকে সম্পূর্ণ অবাক করে পল স্মিথ মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়। শুকনো খটখটে, বীভৎস কঙ্কালে! তারপর হাসতে থাকে সে। তার হাসির

গমকে গমকে মিউজিয়ামের পলেস্তারা খসে পড়ে আর দারুময় ভৌতিক অ্যাটলাণ্টার ওষ্ঠের কোণে জেগে ওঠে রক্তিমা।

ধীরে ধীরে কামনাময়ী এক রমনী বেরিয়ে আসে কাঁচের শো-কেস থেকে। তারপর কঙ্কালকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গনে অবশ করে দেয়।

আলফ্রেড হিচ্‌কক্

বিশ্বের রোমাঞ্চ ও ভৌতিক সাহিত্যে আলফ্রেড হিচ্‌ককের বিশেষ ভূমিকা আছে। রহস্য সাহিত্যকে ব্রাত্যজনের বিনোদনের কালিমা থেকে মুক্ত করে তিনি তাঁর কপালে পরিয়েছেন মহাকালের জয়টীকা। রোমাঞ্চ কাহিনীকে জনপ্রিয় করার অন্তরালে আলফ্রেড হিচ্‌ককের অবদান চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত কঙ্কালের অভিসার গল্পটি তাঁর ভৌতিক ছোটগল্প অ্যাটলাণ্টা অবলম্বনে লিখিত।

সম্পাদক ও সাহিত্যিক ছাড়াও হিচ্‌কক্ বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকের সোনালী শিরোপা মাথায় পরেছেন। তাঁর অসংখ্য জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের মধ্যে 'দি ক্যাট অন এ টিন রুফ,' 'দি বার্ডস,' 'ফ্রেনজী,' টু ক্যাচ এ থিপ্, থারটি নাইট স্টেপস, ডায়াল এম ফর মার্ডার ও ফ্যামিলি প্লট প্রধান।

ভূতের ভালবাসা

পু—সুং—লিং

'......মরা মেয়ে জেগে সচ্ছন্দে হাকিমের পিছু পিছু যাচ্ছে।'

*　　　*　　　*

আমার গল্পের নায়ক হলো শ্রীযুক্ত ল্যাং বাবাজী। পেং চেং শহরের বাসিন্দা। সেই ছোট্ট থেকে, বলতে গেলে, ল্যাং আমার নায়ক। সর্বক্ষণ বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে। বই পেলে আর কিছু চাই না।

বাপের সম্পত্তি বলতে ল্যাং পেয়েছে একটা লছঝড়ে মার্কা রং চটা চুন খসা সেই খেতাবী আমলের একটা বাড়ি। প্রকাণ্ড একটা লাইব্রেরী বাড়ীর আধ খানা দখল করে আছে। এছাড়া একমাত্র সন্তানের জন্য বাবা রেখে যায় টাকা পয়সা বা জমিজায়গা। লাইব্রেরীর বিরাট ঘরের শেলফ ভর্তি হাজার হাজার বই, ইয়া মোটা মোটা, কি ওজন। বেঁচে থাকা কালীন বুড়ো মান্ধাতা আমলের ডুবে যাওয়া কলমবাজদের ছেঁড়া ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি হাতড়ে বেড়াতো আর একশো দুশো বছর আগের বুড়ো খোকাদের লেখা পদ্য কবিতা নিয়ে কৃতিত্ব ফলাতো।

বাপের স্বাভাব পেয়েছে ল্যাং। কিভাবে পয়সা কড়ি কামাতে হয় কেউ ওকে শেখায়নি। আজ মায়ের গয়না কাল বাপের কোট বিক্রি করে পেট চালায়, বলে কি না, মরে গেলেও লাইব্রেরীর একটা বইও বেচবো না। অথচ এই ত্রিভুবনে কি বোকা হাবা গোবার অভাব আছে? দুশো পাঁচশো বছর আগের বুড়ো হাবড়াদের কাব্যি আর খোসগল্পগুলি অনায়াসে বেশ মোটা দামে বিক্রি করতে পারে।

সম্রাট সুং চেং সুং 'জ্ঞানের কথা, নাম দিয়ে কাব্যি লিখেছেন—

জ্ঞান দিচ্ছি জ্ঞানের রাজা
শোন তবে বইয়ের পোকা
ধান ভানা আর চিঁড়ে ভাজা
শিখছো মিছে বুদ্ধু খোকা
আকাশ ছোঁয়া বাড়ীর থেকেও
অনেক ভালো বইয়ের পাহাড়
মিষ্টি মেয়ের হাসির থেকেও
পুঁতির পাতা চমৎকার
পুঁতির পাতার ফুল কুমারী
রূপসায়রে সিনান করে
প্রেম পীরিতের রকমারী
কাব্যকনার ফানুস ওড়ে
পুঁতিই জীবন পুঁতিই টাকা
পুঁতি পড়ো খেড়ে খোকা
পুঁতি নইলে সবই ফাঁকা
শুনে রাখো বইয়ের পোকা!!!

শেষ নিঃশ্বাস ফেলার মুহূর্তখানেক আগে অনেক কষ্টে ফিসফিস করে বলেছিল ল্যাং-এর বাবা—খোকা, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যে এই পদ্যটা পড়বি।

লেখাপড়া করে যে, গাড়ীঘোড়া চড়ে সে। বাবার কথা একটুও অমান্য করেনি ল্যাং বাবাজী, একদিনের জন্যও নয়। অনেকদিন আগেই তার মা মরে শান্তি লাভ করেছে, সৌভাগ্য বলতে হয়। যখন ছেলেদের মনে লাগে প্রথম যৌবনের ছোঁয়া, মেয়েদের দেখলেই তাদের মন উসমুখ করে ওঠে তখন ল্যাং বইয়ের পাতায় চোখ দিয়ে পড়ে আছে। ডুবে ছিল কাব্যি আর কিসমার রূপকুমারী, ফুলকুমারী, জলপরীদের ছড়াছড়ি, হুড়োহুড়ি, ওড়াউড়ির মধ্যে, তখন তার ক্ষনিকের জন্যেও মনে আসেনি রক্ত-মাংসের কোন মেয়ের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করে। অনুভব করেনি ভালবাসা।

তার অটল বিশ্বাস গাদা গাদা বই পড়ে গাড়ী ঘোড়া চড়বে, প্রচুর

প্রচুর সম্পত্তির মালিক হবে, টেবিলে থরে থরে সাজানো থাকবে ফ্রায়েড রাইস, চাউ চাউ চুচুল, সোনাদানা হীরে পান্না দিয়ে খেলবে ডাংগুলি।

গা দিয়ে দুর্গন্ধ ছাড়ছে। অমন বদ্ধ গন্ধ নাকে গেলে মানুষ কেন ছুঁচো পর্যন্ত বমি করতে করতে মরবে। একটা মাত্র পোশাক তার গায়ে, প্রয়োজনে ঝুলছে, আবার পড়ছে,। শীত গ্রীষ্মের পোশাকের কোন তারতম্য নেই, আণ্ডার ওয়ার বছরে একবার রোদে দেয় কিনা সন্দেহ।

শ্রীমান ল্যাং এর রোজগার করার কোন আগ্রহ নেই। বস্তুপচা বইয়ের ওপর চোখ রেখে কেবল বিড় বিড় করছে। আর দেখুন, সমগ্র চীন দেশ মুড়ে চলছে সুখের খেলা। চলছে রাজা মহারাজদের খানাপিনা, অফিসাররা টাকার গদি তৈরী করছে, হাকিম নাড়াতেও খরচ করতে হয়, হাকিমের হুকুম পড়াতে পেয়াদাদের হাতে গুঁজে দিতে হয় কিছু।

একটা পাতলা বই একদিন ল্যাং এর হাত থেকে পড়ে গেল। সেটা উড়তে উড়তে, বাগানে বুড়ো গাছের গুঁড়িতে গিয়ে আটকালো, যেখানে কাঠবেড়ালি থাকে। কাদামাখা কিছু ভুট্টারদানা ভেতরে দেখে ল্যাং এর চোখ বিস্ফারিত হল। এই তো, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে সম্রাট চেংসু-এর কাব্যির কনা—বই খুঁজতে গিয়ে হাতে এলো ভুট্টা, কোন দিন হীরা পান্না, জহরত জুটে যাবে, তাতে কি সন্দেহ।

এর কিছুদিন পরে পুরনো বইয়ের পাহাড় থেকে আবিষ্কৃত একটা একটা খেলনা গাড়ী ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করতেই বেরোলো আসল রূপ, সোণালী রং। বন্ধুরা বললো—সোনা নয়, গিল্টি।

দু'চারদিন যেতে না' যেতেই ল্যাং-এর বাড়ীতে এসে হাজির হলো তার বাবার এক বন্ধু। তার বাবার মতই হাবাগোবা একশো বছর আগেকার পুরনো শিল্পকাজের নমুনা হিসেবে গাড়ীটা সে কিনে নিল, পরিবর্তে দিল তিনশো রূপোর টেল।

চকচকে তিনশো টেল। ল্যাং-এর আনন্দ আর ধরে না, একটু নেচেই নিল। বেড়ে মজা—বই খুঁজতে গিয়ে বেরোলো খেলনা, খেলনা বেচে মিললে টাকা। বইয়ের কি গুণ।

বইয়ের গুণে আরো কত কি পাওয়া যাবে গাড়ীঘোড়া, ধন দৌলত—

তাব বই পড়ার উৎসাহ আরও দ্বিগুন হল। দুবেলা গলা চড়িয়ে পড়ে পড়ে ল্যাং বাবাজী।

এরই মধ্যে সরকারী চাকরীর জন্য ল্যাং দিল পরীক্ষা। কিন্তু সে জানে না টুকলি করতে, বলে চোতা না কি। আর ত আশেপাশের ছেলেরা কেমন নির্ভয়ে জোববার হাতাব ভেতব থেকে বেব করছে কাগজেব টুকরো আর গড় গড় করে লিখছে। কেউবা চীনে কালিতে হাতায় লিখে এনেছে কনফুসিয়সের বকনি, লাওসের কথামৃত, আবগারী আইনেব প্রথম ধাবা ফৌজদারী কানুনের সন্ধসুলুক গার্ডেব হাতে টাকাটা সিকিটা গুজে নিয়ে আশে পাশেব হবু অফিসাররা এক নিঃশ্বাসে টুকলি করে যাচ্ছে, আহা বেচারা আমাদেব নায়ক বাবাজী তখন এধার ওধার তাকিয়ে দেখছে ফ্যালফ্যাল করে।

এবাবেও পরীক্ষায় গোল্লা পেতে হলো ল্যাংকে। এই সময় একদিন ল্যাং ঘাঁটছিল বইয়ের শেলফ।

হঠাৎ তাব নজরে একটা পুবনো বই "অদ্ভুত যত ভূতের গল্প। বইবের চারধার কালো কালো হয়ে গেছে, একেবারে যেন ন্যাতা।

বইটা যত পড়ে তত ভয় এসে জড়িয়ে ধবে ল্যাংকে।—মাঝরাতে কচি কচি ভূত কাঁদছে শকুনের কান্না, নাকী সুরে গান গাইছে বোঁচা ভূত, খুকী ভূত ট্যারাচোখে তাকিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে জোয়ানমদ্দদের, গাছেব ডালে পা ছড়িয়ে নীচের দিকে বিরাট দাঁত বের করে আছে দেঁতো ভূত, হিহি হা করে হাসছে, সুড় সুড়ি ভূত জানলা দিয়ে গলে ছোট ছেলেমেয়েদের বগলের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে লম্বা রোগা হাত।

ল্যাং-এর চোখ জোড়া এবারে কপালে ওঠার সম্ভাবনা। তার ধারনা, বইয়ে যা লেখা সব খাঁটি, ভেজাল নেই এতটুকু। ঠাট্টা মস্করা, গুলতাপ্পি. মজাদার কাহানি—কোনটারই অর্থ বোঝেনা বইয়ের খোকা।

পুরনো বাড়ীর এদিক ওদিক দিয়ে ঝুলছে মাকড়সার জাল, দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে। কাঠের বয়গা গুলো উত্তুরে হাওয়াও সহ্য করতে পারছে না—বুড়ো দাদুর মত কাঁপছে।

গালে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি ল্যাং বাবাজীর। গায়ের জোব্বা থেকে

যে বোটকা গন্ধ ছাড়ছে, সেদিকে খেয়াল নেই তার, সম্ভবত তার নাকের ফুটো দুটো বন্ধ, একপেট ভুট্টাসেদ্ধ আর কুচো চিংড়ি খেয়ে বিকট ঢেকুর তোলে। পরক্ষনেই আলো জ্বালিয়ে মন দেয় ভূতের গল্পের পাতায়।

তুলোট কাগজের পাতায় মেয়ে ভূতের ছবি। কোমর পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে কোঁকড়ান চুলের বন্যা। বুকের রেশমী আবরণ থেকে উকি মারছে নিটোল দুই স্তনের ভাঁজ, এক টুকরো সবুজ রেশম কাপড় সুন্দর করে তুলেছে তার নজর নাভি দেশকে, পা দুটো অস্বাভাবিক। মনে হয় মায়ের পেটে থাকা কালীন ভূতুরে মেয়েটাকে পরানো হয়েছিল কাঠের জুতো। তিনদিনের বাসি দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে একভাবে ছবিটা লক্ষ্য করছিল ল্যাং।

হঠাৎ ছবিটা থিরথির করে কেঁপে উঠলো।

ল্যাংকে বিস্মিত করে ঘরের ভেতর ভেসে এলো টুকরো কুয়াশা, কাণে এলো জলের কলকলানি, নাকে ভেসে এলো চন্দনের মিষ্টি সুবাস।

মোম আলোটা দপ্‌দপ্‌ করে উঠলো।

ল্যাং নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। ভাল করে চোখ রগড়ে নাকের ডগায় লাগালো চশমা। ভুরু কুঁচকে তাকালো বইয়ের পাতার দিকে। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, তুলোট কাগজের পাতায় আর মেয়ে ভূতের ছবিটা আর নেই।

—এই যে আমি—রিনরিনে মেয়েলী কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

চশমাটা ল্যাং-এর নাকের ডগা থেকে খসে পড়ে। কাঁপা হাতে সেটা জায়গা মত স্থাপন করে সে তাকালো ঘরের মোমের আলোর দিকে। আঁধারির মধ্যে দেখা গেল একটি মেয়েকে, তুলোর মত নরম তার দেহ-বল্লরী, কালো কোঁকড়ান চুলের ঢাল নেমেছে তার কোমর অব্দি, তিরতির করে কাঁপছে আয়ত আঁখিপল্লব, বুকের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে নিখাদ স্তনদুটির ভাঁজ, এত শুভ্র যে তার বুকের সাদা কাপড়টিকে হার মানায়। নাভির নীচে এক টুকরো সবুজ রেশম লজ্জা ঢাকার লজ্জায় দুলছে। ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে এলো মেয়েটি, মেঝের পুরু ধুলোতে আঁকা রইলো তার পদচিহ্ন।

ল্যাং-এর তেলচিটচিটে ময়লা গন্ধ ভরা জোব্বর কাঁধে পড়লো মেয়েটির নিটোল দুটি হাতের পরশ। মুখ থেকে একগাল মুক্তো ঝরিয়ে মেয়েটি বললো—আমার নাম ভালবাসার ভূত—

—ভূ-ভু-ভূত! বিকট চীৎকার করে ওঠে শ্রীমান ল্যাং। তার পিলে কেঁপে পালিয়ে যেতে চাইছে। কোনরকমে কাঁপা কণ্ঠে বললো—আমি স্বপ্ন দেখছি না তো……

এবার বর্ণরঞ্জিত ডানহাতের নখ বাড়িয়ে দিল ল্যাং-এর নাকের দিকে, কাটলো চিমটি।

—বাপরে? নাকটা ঘষতে ঘষতে ল্যাং বললো—ভূতেরা চিমটিও কাটে নাকি?

—এবার তাহলে তোমার হুঁশ হয়েছে কি বলো। বুঝতে পারছে, তুমি খোয়াব দেখছোনা। দুম করে ভালোবাসার ভূত ল্যাং-এর কোলে বসে পড়লো। আব্দার ভরা কণ্ঠে বললো—আমার ভালো নাম ইয়েন. সবাই জুজু বলে ডাকে। আমি যার ঘাড়ে একবার চাপি, ভালভাবেই চাপি। জীবনে নড়ি না। ভূৎলিং, মানে আমাদের ভূতেদের রাজা তোমার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। দিনরাত বইয়ের মধ্যে ঘাড় গুঁজে পড়ে থেকে জাহান্নামে যাচ্ছো। তোমার মাথা সাফ করার দরকার, প্রয়োজন ভুতুরে ওষুধ।

ল্যাং-এর গলা আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে তার খোঁচা খোঁচা দাড়িতে একটা চুমু খেয়ে জুজু বললো---যাও, এবার লক্ষ্মীছেলের মত আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো। যথেষ্ট রাত হয়েছে।

ল্যাং কোন উচ্চবাচ্য না করে বাধ্য ছেলের মত আলো নিভিয়ে বিছানার কাছে এগিয়ে গেল।

বিছানার মাঝখানে পাশবালিশটা আগেই রেখে দিয়েছিল জুজু।

ল্যাং-এর দিকে পেছন ফিরে শুয়ে জুজু জানালো 'শুভরাত্রি।'

—শুভরাত্রি, কোনরকমে উচ্চারণ করলো ল্যাং

দেখতে দেখতে কেটে গেল আধঘণ্টা।

তারপর একঘণ্টা।

ততক্ষণে ল্যাং একটু স্বাভাবিক হয়েছে। ঘুম ঘুম ভাব এসেছে চোখে। হঠাৎ পাশবালিশের ওপাশ থেকে শোনা গেল জুজুর কণ্ঠস্বর—শুভরাত্রি।

—শুভরাত্রি। ল্যাং বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসে।

সত্যি, তোমার মগজে কিছু নেই, কিছু নেই, বোকা কোথাকার, রাগে গম গম করতে থাকে ভালবাসার ভূত। ভালবাসার জন্য লোকে যে কোন কাম করতে পারে, আর তুমি সামান্য পাশবালিশটা সরাতে পারছো না।

অগত্যা ভয়ে ভয়ে পাশবালিশটা সরিয়ে দেয় ল্যাং।

আবার চুপচাপ। কেটে গেল আধঘন্টা।

হঠাৎ আদুরে গলায় জুজু বলে ওঠে—আমার ভীষণ শীত করছে।

হুকুম তামিল করার জন্য মনে হয় ল্যাং তৈরী-ই ছিল। সে দ্রুতহাতে তোষকের নীচ থেকে কম্বলটা বের করে সযত্নে ভূত-মেয়ের গায়ে দিতে গিয়ে বাধা পায়।

—ওরে বাবারে, কি বিচ্ছিরি গন্ধ! ওয়াক থু! গন্ধের টানে পেটের নাড়িভূঁড়ি উঠে আসছে। নাক সিটকোয় ভূতকুমারী।

—তাহলে কি করবো? আমতা আমতা করে প্রশ্ন করে ল্যাং।

বিরাট এক আড়মোড়া ভেঙে জুজু বললো, ভূতের যখন আমার শীত করতো, একটা হাত তুললো তখন আমার মা চিনচিন আমায় জড়িয়ে ধরে শুতো—তার বুকের উষ্ণতায় আমি গরম হয়ে যেতাম।

—বেশ তো, কাল থেকে আমি নিচে শোবো। আর তুমি তোমার মাকে নিয়ে এসো এখানে। ঝামেলা মেটোনোর সহজ উপায়টি বলে দিল ল্যাং

—আহাম্মক, তোমার মস্তিষ্কে কি একটুও ঘিলু নেই, নাকি বুদ্ধির পাত্রটা শুকিয়ে গেছে। মা তো ভূতের দেশে আছে। আপাতত মায়ের পরিবর্তে তুমি—

ভূতদের না চটালেই ভালো। রাগের বশে কখন কি করে ফেলবে ঠিক নেই। নিরুপায় হয়ে ল্যাং জড়িয়ে শুলো জুজুকে।

কেটে গেল আধঘন্টা।

—উঃ, গরম লাগছে, আরও ন্যাকা ন্যাকা কণ্ঠে বললো জুজু। ল্যাং-এর দিকে পেছন ফিরে শুয়ে কাঁচুলির পেছনের ফাঁসটা দেখিয়ে বললো—একটু এটা খুলে দাও না।

হুকুম অমান্য করার উপায় নেই। অতএব কার্য সিদ্ধি হতেই জুজু কাছে টেনে নেয় ল্যাংকে—ভালোবাসার প্রথম পাঠ শিখলে।

ভোর হওয়ার আগেই, ল্যাং ভালবাসার দ্বিতীয়, তৃতীয় পাঠ সেরে ইস্কুলের সিঁড়ি ভেঙে কলেজে ঢুকে পড়েছে।

—এই বইগুলো বেচলে অনেক টাকাকড়ি পাবে। নাভির নীচে সবুজ রেশমের ফাঁস বাঁধতে বাঁধতে বললো জুজু।

—বই বেচবো? চোখ কচলে ল্যাং বলতে থাকে, 'সুং চেং সুং-এর জ্ঞানের কথা, মহাবোধিজাতক, কনফুসিয়াসের কথা, লাওসের তিনটি উপদেশ—এই সব বিক্রি করে ফেলবো?

জুজু মুখে কোন উত্তর না দিয়ে আলমারির দিকে ফিরে দু আঙুলে তুড়ি বাজালো—বইয়ের পাতা ফাঁক হল, ভোজবাজির মত ধীরে ধীরে উঠে এলেন স্বয়ং সম্রাট সুং চেং সুং, পরনে সোনালী জোব্বা, মুখে সাদা দাড়ি।

—সুপ্রভাত, কবি সুং চেং সুং। মিষ্টি হেসে শুধোয় ভালবাসার ভূত, আচ্ছা কাব্য পড়া ভাল না মন্দ বলুন তো?

—কি? কাব্যি? নাক কুঁচকে মুখ বিকৃত করে একদলা থুথু মেঝেতে ফেললেন কবি। যদি শ্রীমান ল্যাং চুপা পিছিয়ে না যেতো তাহলে তার গায়েই পড়লো থুথুর দলা। শোনো বাছা, যারা এসব কাব্যি টাব্যি পড়ে, স্রেফ তারা গর্দভ। আহাম্মক, মাতাল, পাগল ছাড়া এসব কেউ পড়ে না। ঐ কাব্যি আমাকে করেছে নিঃস্ব ভিক্ষু, হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে রাজ্য। আমি কি নামে পরিচিত ছিলাম জানো? পাগলা রাজা! শেষ পর্যন্ত আমার বৌ এক ছোকরা সেনাপতির সঙ্গে করলো প্রেম নিবেদন। আমার খাবারে মিশিয়ে দিল বিষ। ইচ্ছে ছিল······

—ব্যাস, এই পর্যন্ত থাক। আর বলার দরকার নেই। আবার তুড়ি বাজালো জুজু, আপনি এবার বিদায় নিন।

যেমন ধীরগতিতে উঠেছিলেন বই থেকে তেমনি ভাবে বইয়ের ভেতর অদৃশ্য হলেন কবি সুং চেং সুং।

এবার জুজু ইয়া মোটা মহাবোধি জাতকের বইটার দিকে তাকিয়ে তুড়ি দিল।

সুড়সুড় করে নেমে এলো বুদ্ধদেব মহাবোধি জাতকের পাতা—সোনায় মোড়া, হাত-পা মাথা স্বর্ণ নির্মিত।

—প্রভু, আপনার এ অবস্থা কেন? অধীর আগ্রহে লাং জানতে চাইলো।

—শোন বৎস, বেঁচে থাকা কালীন আমি সবাইকে নিষেধ করেছি, মূর্তি দিয়ে অথবা পট দিয়ে কেউ পুজো করোনা। কিন্তু আমার মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে পড়ে গেল আলোড়ন। দিকে দিকে তৈরী হলো আমার প্রতিমূর্তি। ওঁ মনি পদ্মে হুঁ, ধর্মচক্র, আমার নামে পতাকা ওড়ানো, 'তারা', নামে কোন দেবীর সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে তোমরা শুরু করেছ হৈ চৈ।

……মূর্তিটা সুন্দর হয়েছে, স্বীকার করতে হয়। আসলে ওরকম গ্লামার আমার চেহারায় কোনদিন ছিল না। বোধি গয়ার উপোস করে তপস্যা করে করে আমার শরীর হাড্ডিসার হয়েছিল, গাল ঢুকে গিয়েছিল। সুজাতার পায়েস খেয়ে আমি শান্ত হয়েছিলাম কিন্তু গায়ে মাংস হয়নি। তাই স্থির করেছি, ভক্তদের আহ্বানে যখন সাড়া দেবো তখন এই প্রেতমূর্তি হয়েই আবির্ভূত হবো।

—প্রভু, আপনি তো অনেক মোটা মোটা কেতাব পড়তেন, নিজের কাম গোছাবার ধান্দায় থাকে জুজু, বলুন তো বই পড়া কি ভাল না মন্দ?

—দেখো বাছা, সোনার দাঁত বের করে একগাল হাসলেন বোধিসত্ত্ব। বললেন, এককালে অন্যের দুঃখ দেখে দুঃখ অনুভব করতাম। তাই তো বেদ-পুরাণ উপনিষদের প্রতিটি পাতা সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করেছি, জরা মৃত্যু শোক থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার পথ ওরা বের করেছে কিনা। কিন্তু কিন্তু দেখি সব মিথ্যে ভাঁওতাবাজী, কেবল গ্যাস। ঐ যে বইটা, যেটা আমার লেখা বলে সবাই মানে, আসলে কি আমি লিখেছি। আমার

নামে যতসব আজে-বাজে গাল-গল্পো লিখে পাতা ভরেছে। 'আমার নামের কে এক গুণ্ডা জন্মে জন্মে আমাকে এমন মার দিয়েছে যে বাপের দেওয়া নাম সিদ্ধার্থ ভুলে গেলাম বুদ্ধ। আরে ধ্যাৎ, ঐসব গাঁজাখুরি লেখা তোমরা পড়ো।

—বোধিসত্ব, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। হাতে তুড়ি বাজিয়ে জুজু বললো, আপনি এবার আসতে পারেন ?

প্রশস্ত জাতকের আড়ালে অদৃশ্য হলেন বোধিসত্ব।

—এবার কাকে ডাকবো ? হেসে উঠলো জুজু। হাসি আর তার থামে না। হাসির চোটে কোমরের সবুজ রেশমের টুকরোটা খুলে যাওয়ার উপক্রম—বলো, কাকে ডাকবো—কনফুসিয়স না লাওসে ?

—আর কারো প্রয়োজন নেই। গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল লাং। আমি এখুনি বই কেনার লোকেদের ডেকে পাঠাচ্ছি।

বই বই আর বই।

এক একটা বইয়ের আকার একরকম, বিভিন্ন ওজন। দিস্তে দিস্তে মণ মণ টন টন বই।

প্রত্যেকটি বই চামড়ায় বাঁধানো তুলোট কাগজে লেখা স্বর্ণাক্ষরে লেখা কেতাবের নাম।

ময়রা যেমন সন্দেশ না খেলেও জানে ছানার স্বাদ, তেমনি বইয়ের ব্যাপারী বই না পড়লেও জানে কোন বইয়ের কি দাম হতে পাবে।

লাং-এর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে জুজু। পরণে শুভ্র কাঁচুলি, কোমরের নিম্নাঙ্গে লজ্জা ঢেকেছে সবুজ রেশমের ঘাঘরা। তাকে কিন্তু বই ব্যাপারীরা দেখতে পায় না একমাত্র দেখতে পায় লাংকে ভালোবাসার ভূতের, ভালোবাসার মানুষ।

তা কোয়াং তিং বইটার দাম ব্যাপারী দিল মাত্র পঞ্চাশ টাকা, অনেক-আগেকার গল্পের বই। পেছন থেকে যদি কানমলা না খেতো তাহলে বোধ হয় ঐ দামেই বিক্রী করতে রাজী হতো।

—বুদ্ধিহীন কোথাকার, জুজু তার কানটা মলে দিল। ওটার দাম চাও দু'শ টাকা।

—আঃ, লাগছে। পিছন ফিরে ল্যাং বললো। তারপর সামনে ফিরে বললো—ওটার দাম দুশো টাকা দিতে হবে। একপয়সা কমেও হবে না।

ল্যাংএর ভাবধারা দেখে ব্যাপারী প্রথমে অবাক হ'লো। ঘরে কেউ কোথাও নেই। অথচ ল্যাং কথা বলছে। পরক্ষনেই চিন্তাটা দূর করে ফেলে দিল—পড়ুয়া লোক তো, আধপাগলা গোছের।

ব্যাপারী দুশো টাকাই দিতে চাইলো।

'অদ্ভুত যতো ভূতের গল্প' বইটা বেচার ইচ্ছে ছিল না শ্রীমান ল্যাং-এর। পেছন থেকে জুজু তার মনোভাব বুঝতে পেরে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললো—দাও ওটা বেচে। যখন ওর মধ্যে থেকে সুড়সুড়ি ভূত, দেঁতো ভূত, নাকি সুরো ভূত বেরিয়ে ঘরময় লাফালাফি নাচানাচি করবে, তখন বুঝবে ঠ্যালা।

সব বই বিক্রি করে ল্যাং হাতে পেলো নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা। বহুকালের পুরনো আলমারি বুক শেলফ সব বিক্রি করে আরো দুই হাজার টাকা পাওয়া গেল।

ভালোবাসার ভূতের পরামর্শে বাড়ীটা নতুন করে রঙচঙ করে জীবন্ত করে তোলা হল। পাঁচ একর ধানী জমি কিনলো ল্যাং। ঘরে সাজালো হাল ফ্যাসানের আসবাব, দেয়ালে টাঙানো সুন্দরী মেয়েদের ছবি, দরজা জানালায় ঝুললো রেশমী পর্দা, আয়না, আতর, বাতিদানে বাড়ির ভোল একেবারে পাল্টে দিলো ভালবাসার ভূত।

জুজু আজ খুব খুশী—জেলার বড় বড় অফিসারদের নেমতন্ন করে ভোজের ব্যবস্থা করো।

অতএব নিমন্ত্রিত হ'লেন লি ফু ইয়েং, কুং সো, ওয়াং তু, চিংসে—গণ্যমান্য অফিসাররা। ল্যাং বিরাট ভোজের আয়োজন করেছিল। তাই দেখে সবাই খুশী—ক্যান্টনের দামী প্রকৃষ্ট মদ, সমুদ্রের চিংড়ি, চাউ-চাউ, নুড্‌ল ইত্যাদি।

—এতদিন আপনি গা ঢাকা দিয়ে কোথায় ছিলেন, মশাই? জেলার প্রশাসক কুং সো আর কৌতূহল চাপতে পারলেন না। এই অহ শহরে

এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাস করেন, তা তো ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি।

—শ্রীমান ল্যাং, আপনার সব থেকেও দুটো জিনিসের অভাব আছে। এক নম্বর বই এবং দ্বিতীয় ঘর, চিং পে রসিকতা করে বলে।

ল্যাং-এর পেছনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে তার ঘরনী জুজু। ভূতের মাসী ভূতের নাগর ছাড়া কেউ দেখতে পায় না। নয়তো লেগে যেতো দক্ষযজ্ঞ।

—বই জমিয়ে ঘরে রাখা মানে জঞ্জাল বাড়ানো 'কোন মানে হয় বলুন।' ল্যাং অকপটে গড় গড় করে বলে যায়।

—সেকি ? চ্যাং পে আৎকে ওঠেন—তাও কি সম্ভব ? আচ্ছা আপনি কি কোন অঙ্ক মুখস্থ করতে পারবেন ?

—নিশ্চয়ই, যাচাই করে দেখুন।

—আচ্ছা, বলুন তো, বাইশ হাজার একশো চব্বিশকে দশ হাজার তিনশো সাতানব্বই দিয়ে গুণ করলে কতো হয় ?

—কত হয় ? পেছনের দিকে তাকিয়ে ল্যাং প্রশ্ন করে ভালোবাসার ভূতকে। পরক্ষণেই সামনে তাকিয়ে বলে ওঠে, দুশো তিরিশ কোটি বাইশ হাজার দুশো আঠাশ।

নিমন্ত্রিতদের উত্তর শুনে চক্ষু কপালে উঠলো।

—আপনি চুপ করে বসে আছেন কেন ? সরকারী চাকরির পরীক্ষা দিন। সবাই সমস্বরে বলে ওঠেন।

অতএব আবার পরীক্ষায় বসলো ল্যাং। ঠিক তার পেছনের কানের কাছে মুখ এনে দাঁড়িয়ে আছে জুজু। সে আওড়ে যাচ্ছে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, আইন, দর্শনের বস্তাবন্দী সূত্রগুলো। আর এদিকে গড়গড় করে লিখে যাচ্ছে ল্যাং।

এদিকে গার্ডবাবাজীদের মেজাজ বিগড়ে গেছে। হাতে আসছে না একটা কানাকড়ি। তারা অথচ দেখতে পায় না জুজুকে আর শুনতেও পায় না কিছু।

পরীক্ষার ফল বেরোলো দেখা গেল প্রথম হয়েছে ল্যাং। আগে থেকে

অফিসারদের কায়দা করে রেখেছিল। তাই নিজের শহরেই ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেলো শ্রীমান ল্যাং।

—পরীক্ষার হলে নকল করতে হলে গার্ডের হাতে কিছু গুঁজতে হয় রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললো জুজু।

—জানি, কিন্তু তোমার জন্যেই উতরে গেলাম, থুথু দিয়ে চিঁড়ে ভেজালো ল্যাং। কি ভাগ্য বলো তো, ভূতের গল্প পড়তে তোমার দেখা পেলাম।

—থাক, আর জ্ঞান দিয়ে কাজ নেই। ল্যাং-এর হাতটা টেনে নিয়ে নিজের খোলা বুকে রাখে ভালবাসার ভূত বলে—এবার আমার ঘুষ দাও।

ভালোবাসার সুখ অর্থাৎ পুরোপুরি সব মিটিয়ে দিয়ে ল্যাং ক্লান্ত গলায় বলে—সবই ভাল, কিন্তু লোকে বলাবলি করছে, নতুন ম্যাজিষ্ট্রেট বিয়ে করেনি কেন?

সাবধান, তাহলে তোমার বউ জ্যান্ত থাকবে না। আমি তার ঘাড় মটকে দেবো। চোখ রাঙিয়ে মৃহু বললো, বরং এক কাজ করো, গোর স্থানে গিয়ে তোমার পছন্দ মত যে কোন তর তাজা মেয়ে মানুষের মৃতদেহ নিয়ে এসো। জানো তো ভূত ঘাড়ে চাপলে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে নতুন করে।

অতএব গোর স্থানের মরালাশের ওপর নজর রাখা হলো।

একটা ষাট বছরের বুড়ী দেখে মৃহু খিল খিলিয়ে হেসে বলে—এটাই ভালো।

—ওরে বাবা, এটা। কপাল কুচকে আৎকে ওঠে নতুন ম্যাজিস্ট্রেট ল্যাং বাবাজী।

এরপরে ছুটো মৃতদেহ দেখা গেল—একটা জোয়ান আর একটা বুড়ো ছুটো বেটাছেলে। অতএব বুকের ব্যথা বুকে নিয়ে—চুপ করে থাকা ছাড়া ল্যাং-এর কোন উপায় নেই।

এরপরে একটা লাস এলো, ঝকঝকে কফিনে সাদা চাদরে ঢাকা। চন্দনের গন্ধ চারদিকের হাওয়া মাতিয়ে তুলেছে। বুক চাপাড়ে কাঁদছে মৃতার

বাবা দাদারা। ……মরা মেয়ে জেগে উঠে কেমন সচ্ছন্দে হাকিমের পিছু পিছু যাচ্ছে।

কবরস্থ করার আগে ল্যাং একবার লক্ষ্য করলো—পরীর মত রূপ, সুন্দর টানা দুটি চোখ; ছোট কপালে ওপর কোঁকড়ান চুল, লম্বা নাক, সোনালী ঠোট। দুধে আলতা গায়ের রঙ।

--একে মনে ধরে চোখ টিপে বলেই জুজু হাওয়ার সঙ্গে ঢুকে গেল মৃত মেয়েটার ঠাণ্ডা শরীরে।

—ল্যাং। চোখ খুলেই বললো মেয়েটা। এবার ধরা পড়লো সুন্দরীর দেহের একটি খুঁত, মেয়েটি ট্যারা। তা হোক গিয়ে এখন আর আপত্তি করার উপায় নেই।

মেয়ের বাপ দাদার চোখও ততক্ষণে ট্যারা হয়ে গেলে। মরা মেয়ে জেগে উঠে কেমন স্বচ্ছন্দে হাকিমের পিছু পিছু যাচ্ছে।

একটু আশ্বস্ত হতেই সকলে গিয়ে হাজির হলো ল্যাং এর বাড়ী।

—হুজুর আমার মেয়ের সঙ্গে ওর মাসতুতো ভাই ট্যাং লীর বিয়ের কথা পাকা। মেয়ের বাবা মাথা চুলকে বললো, তাটম সিয়েন, দেরী করো না শগগির চলে এসো।

—না, আমি ঐ বেঁটে, খোঁড়া লোকটাকে বিয়ে করবো না' ফুলের মত দেহের মধ্যে লুকোনো ভালবাসার ভূত বলে, চ্যাংলী আবার আফিমের নেশা করে।

অগত্যা অটম মিয়নের বাপ দাদা এবার আদালতের দ্বারস্থ হলো।

আদালতে লোকে লোকারণ্য। প্রত্যেকের জানার ইচ্ছে, কি হয় কি হয়! নতুন হাকিম ল্যাং। নাকি অটম বিয়েনকে চুরি করে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে।

এই মামলাটা প্রথমে নিতে চাননি জেলার প্রশাসক। কিন্তু চীনের কড়া আইন অমান্য করার নয়।

—ল্যাং তোমাকে তার বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে বুঝলাম, কিন্তু, চেয়ার ছেড়ে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন কুৎসো. তুমি তো বাচ্চা মেয়ে নও। তোমার চোখ দুটো ট্যারা হলেও পা দুটো আছে। পালাতে

পারোনি তুমি ?

—আমি তো পালানোর জন্যে আসিনি ? মিষ্টি হেসে জবাব দিল অটম নিয়েন। তার পর কাঠ গড়ায় আসামী ল্যাং এর দিকে অঙ্গুলে উচিয়ে বললো কনফুসিয়সের আমলের খাঁটি চীনে ভাষায়—এইবন্দীই আমার সব, আমার হৃদয়েশ্বর।

—মামলা ডিসমিসড।

এবার কুৎসো চোখ বড় বড় করে তাকালেন ফরিয়াদীদের দিকে। সরকারী অফিসারদের সম্বন্ধে আজে বাজে কুৎসা রটানো। এরকম অন্যায় করলে সবকটার গর্দান নেবো—

ল্যাং বাড়ী ফিরে গেল। অটম নিয়েন ওরফে জুজু তার ছিপছিপে শরীর হেলে দুলে হাঁটছে। বউয়ের পেছনে হাঁটছে ল্যাং, ঠিক যেন জাহাজের পেছনে ল্যাংবোট।

ভালোবাসার ভূতের আর কোন দুঃখ নেই। তার মনোস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। মনের সুখে গলা ছেড়ে গান ধরলো—বইয়ের বদলে বউ পেলে, টাক ডুমা ডুমডুম।

শ্রীমান ল্যাং বাবাজী নীরব। সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে, এ ভূত কাঁধ থেকে কোনদিন্ন নামানো যাবে না।

———

—পু-সুং-লিং ঃ—

আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে চীনা সাহিত্যে একাধিক ভূতের গল্প লেখা হয়েছিল। চীনা ভূতেরা কিন্তু অশরীরী হয়ে আতঙ্ক জাগায় না মনে। তারা মিষ্টি মধুর কৌতুকে প্রেমের লুকোচুরি খেলায় পাঠক পাঠিকার মনের আকাশে রামধনু রঙ ছড়ায়।

আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাস থেকে ক্রমশঃ হারিয়ে যাওয়া তেমনই একটি চীনা ভৌতিক গল্পকে এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

পুং সুং লিং-এর লেখা হালকা মেজাজের এই গল্পে এক সুন্দর ভৌতিক গল্পের বিন্যাস আজকের আধুনিক চেতনাপুষ্ট পাঠককেও মিষ্টি-মধুর এক অলৌকিক স্বপ্নালি জগতের ইঙ্গিত দেয়। গল্পটির বিষয় বিন্যাসের অভিনবত্ব ও সূক্ষ্মরসবোধ ও চৈনিক নান্দনিক অনুভূতি আমাদের চমৎকৃত করে।

অলৌকিক কাহিনী
"রিডার্স ডাইজেস্ট"
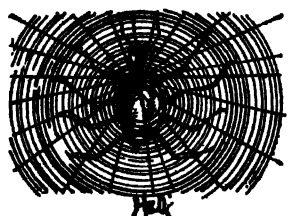
আফ্রিকার বিস্মৃত বিস্ময়

সভ্যতার আদিকাল থেকে আফ্রিকা তার জমাট দমবন্ধ ভৌতিক ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক অনুরণণে মানুষের মনকে বারবার ভয়ে বিহ্বল করেছে। শ্বাপদ অরণ্যের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা এক জনসমৃদ্ধ নগরের আকস্মিক অন্তর্ধানকে ঘিরে পৃথিবী জুড়ে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল তারই এ যাবৎ অপ্রকাশিত কাহিনী শোনানো হল "রিডার্স ডাইজেস্ট"-এর কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে।

আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়ার অন্তর্গত মোম্বাসার উত্তর উপকূলে অবস্থিত গেডি শহর, রহস্যে ঘেরা মৃত একটি নগর।

আস্ত একটি শহর মরে যাওয়া কি সম্ভব?

অসম্ভব বললে ভুল বলা হবে। গেডি শহর জনশূন্য হল। ইট কাঠ দালান, বাড়ি—সব একধার দিয়ে মৃত্যুর তালিকায় নাম লেখালো।

এই রকম মৃত শহর শতকরা একটা মিলবে কিনা সন্দেহ।

আজও গেডি শহর একই ভাবে পড়ে আছে। গেলে দেখা যাবে, নগরের এলাকার মধ্যে প্রাণের চিহ্ন নেই।

এখন সেটি পরিণত হয়েছে সরীসৃপ আর ভূতের রাজ্যে।

এই নগরের কেন এমন পরিণতি হলো, কি কারণ—সেটা অজ্ঞাত। কেবল আসে পাশের লোকেদের কাছে মৃত নগর দারুণ ভয়াবহ…দারুণ সাঙ্ঘাতিক…দারুণ ভয়ঙ্কর নামে পরিচিত।

এই গেডি শহরের কাছে এসে এই ধ্বংসস্তূপের কোন কিছুর ছবি আঁকলে বা এখানে অনধিকার প্রবেশ করলে আর রক্ষে নেই।

এই অপরাধে যারা অপরাধী তাদের চূড়ান্ত বিপদে পড়তে হয়। এ শহর পাহারা দেয় দুর্ধর্ষ প্রেতাত্মারা। নিয়ম লঙ্ঘন করলেই শাস্তি পেতে হবে। তারা অন্যায়েব উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়ে তবে ছাড়বে।

এমন আজব ব্যাপারও নাকি ঘটে।

এই বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত, সভ্য মানুষ কি এসব কুসংস্কারে কান দেবে?

একবাব এক জনৈকা ইংরেজ মহিলা এসব গুজব বলে উড়িয়ে দিয়ে জোর করে প্রবেশ করলে গেডি শহরে, উদ্দেশ্য ছবি আঁকবে।

মহিলার সঙ্গে নিজেব তরুণী মেয়ে আর দুই দম্পতি—দুজন স্বামী-স্ত্রী ছিল। সবাই তারা শিল্পী, আঁকায় ওস্তাদ। তাদের ইচ্ছা আঁকাও হবে, সেই সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করে বনভোজন করা যাবে।

তাদের অনেকে বারণ করলো স্থানীয় লোকেরা, ভয় দেখালো। কিন্তু ওসব কথা তারা গ্রাহ্য করলো না। তারা যাবেই, যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। কোন বাধা তাদেব আটকাতে পারবে না।

পাশের অন্য এক শহরের হোটেল থেকে প্রাইভেট মোটর গাড়ী চালিয়ে ওরা অকুস্থলের দিকে একদিন রওনা হয়ে গেল।

তারা প্রত্যেকে এক একটা জায়গা নিয়ে বসলো যেখান থেকে দালানের ধ্বংসাবশেষ এবং ঝোপঝাড় সব নজরে পড়ে। তারা অনেকগুলি ছবি আঁকলো, খাবার খেলো, ঠাট্টা-তামাসা করলো আবার আঁকায় মন দিল।

হঠাৎ একজন কালো বৃদ্ধ তাদের সামনে হাজির হলো। তারা কিছু বলার আগেই অদৃশ্য হল।

কেটে গেল কিছু সময়।

আবার আবির্ভূত হল আব একজন কৃষ্ণাঙ্গ বৃদ্ধ। সে তাদের সামনে এগিয়ে এলো। চিৎকার করে ধমকে বললো—আপনারা এসব কি করছেন? এর ফল কি পেতে হবে জানেন না? এই প্রেতাত্মাদেব নগরী কেন আঁকছেন? এরকম আরো অনেক কথা বললো।

সাহেব-মেমরা একটুও ঘাবড়ালো না। বরং তারা মজা পেলো,

কৌতুকের হাসি হাসলো। বৃদ্ধের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন দেখে তারা ভাবলো।

তারা যেসব খাবার নিয়ে এসেছিল, সেখান থেকে কিছু বৃদ্ধের হাতে দিতেই সে চলে গেল। পরক্ষণেই নামলো সন্ধ্যা, দিনের আলো বিদায় নিচ্ছে।

আলোর অভাব যখন, তখন তো আর ছবি আঁকা সম্ভব নয়। তাই গাড়িতে উঠে দূরের হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

গাড়ি চালিয়ে কিছু দূর আসার পর শেতাঙ্গ শিল্পীরা তাজ্জব বনে গেল। এই তো বিকেলের মিষ্টি আলো কেমন ফুটে আছে। অথচ চিন্তা ঢুকলো আঁকিয়েদের মনে।

এই ভাবে পর পর কদিন তারা একই উদ্দেশ্যে মৃত নগরীতে গিয়ে অনেক ছবি আঁকলো।

এবার সবাই ফিরে গেল যার যার বাড়ি, বিরাট বড় বড় শহরে।

বিপত্তির সূত্রপাত এবার দেখা দিতে লাগল।

ইংরেজ আর্টিষ্ট মহিলা শুকনো ডাঙ্গায় আছাড় খাওয়ার অবস্থায় পড়ে গোড়ালি ভেঙ্গে ফেললো। সেই সঙ্গে জীবনের মত খোঁড়া হল।

তার তরুণী মেয়ে পায়ের ওপর রাইফেল রেখে কি যেন করছিল। সেফটি ক্যাচ লাগানো, তবু অবাক হওয়ার কথা, কি করে একটা গুলি বেরিয়ে এসে আঘাত করলো মেয়েটির একটি পায়ে এবং গুরুতর আহত হল।

কিছুদিন পরেই অন্য শহর থেকে একটি চিঠি সংবাদ বয়ে আনলো স্বামী কি স্ত্রী শিল্পীর।

শ্বেতাঙ্গিনী চিঠি পড়লো, ফটো টাঙ্গাতে গিয়ে চেয়ার থেকে উল্টে আছাড় খেয়ে পড়ে স্ত্রীটি মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। ফলে ছমাস হাসপাতালে থাকতে হয়, প্লাস্টার করা ছিল পিঠ-বুক। সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছে।

তার স্বামী লিখেছে—বাগানের জঙ্গল কাটতে গিয়ে ডান হাতটিকে জীবনের মত খোয়াতে হয়েছে।

সাজ্ঘাতিক ভয় পেলো শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা। স্বামী ও স্ত্রীকে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে জরুরী চিঠি লিখে পাঠাল।

সবাই মিলে গেড়িতে গিয়ে এর একটা সুরাহা করা দরকার। কু-সংস্কার বলে উড়িয়ে দিলে হবে না, অবিশ্বাস করা চলবে না। নেটিভদের অগ্রাহ্য করা চলবে না।

এক রাত্রে ঘটলো একটা ব্যাপার।

মশারীর ভেতর থেকে আর্টিষ্ট মহিলা চোখ বড় বড় করে লক্ষ্য করলো, গাড়িতে দেখা সেই কৃষ্ণাঙ্গ বৃদ্ধটি এসে হাজির। সেই কালো মুর্তি কর্কশ গলায় বলছে—তোমরা কিছুতেই পার পাবে না। যদি ঐসব ছবিগুলো ওখানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলো তাহলে বাঁচবে। নয়তো 'মাননীয় প্রেতাত্মাদের' কোপদৃষ্টিতে তোমরা ধ্বংস হবে।

আর দেরী করে কাজ নেই।

ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে চারজনে হাজির হলো সেই অভিশপ্ত গেড়ি নগরে। তারপর ভয় চকিত নেত্রে দুরু দুরু বক্ষে বিমর্ষ চিত্তে শ্বেতাঙ্গ নরনারীরা সঙ্গের আঁকা ছবিগুলো পুড়িয়ে ফেলল।

সব আনা হলেও একটা ছবি আনতে ভুলে গেছে শ্বেতাঙ্গিনী। সেটা তার কাছেও নেই। বিক্রি করে দিয়েছে এক জনৈক মার্কিন ধনী ভদ্র-লোকের কাছে। সে তার বাড়ী আমেরিকায় নিয়ে চলে গেছে। এটা ভেবে মেমসাহেবের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। একটু খটকা লাগলো।

প্রেতাত্মারা কি এই অন্যায়টা মেনে নেবে?

না, তারা উপেক্ষা করলো না।

দিন কয়েক বাদে শিল্পী একটি খবরের কাগজের সংবাদ পড়ে ভয়ে কুঁকড়ে গেল।

তার ছবি ক্রেতা, সেই ধনী মার্কিন ভদ্রলোক সপরিবারে আগুনে পুড়ে মারা গেছে। অগ্নি কাণ্ডটি তার নিজের বাড়িতেই ঘটে।

শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলো না। তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো।

হৃৎস্পন্দন ক্রমশঃ বাড়ছে। চারদিক ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেছে…

জমাট অন্ধকার ··· নিঃসীম ··· অন্ধকার ··· উঃ কি ভয়াবহ গর্জনের শব্দ। প্রকৃতি কি প্রলয় নৃত্যে নাচছে। ধরাতলে তাথই তালে দানবিক নৃত্য। হঠাৎ ধপ করে বিকট আওয়াজ···তারপরই নিঃশব্দ। মরণ নীরবতা।

চেয়ার থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো শ্বেতাঙ্গিনীর স্পন্দনহীন নিষ্প্রাণ দেহটা।

মৃত গেডি শহরের প্রকৃত অধিবাসী, সেই সব ক্রুদ্ধ প্রেতাত্মারা তাদের অলিখিত অব্যক্ত আইন খেলাপকারী সাদা চামড়ার মানুষগুলির প্রতি তাদের প্রতিহিংসা বাস্তবে পরিণত করতে দ্বিধা করেনি এতটুকু।

অলৌকিক কাহিনী
"রিডার্স ডাইজেস্ট"

ইংল্যাণ্ডের ভূতুড়ে বাড়ী

সভ্যতার পীঠস্থান ইংল্যাণ্ডের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহানগর লণ্ডন শহরে আছে এমন একটি অলৌকিক ভূতুড়ে বাড়ি যা দিনে দুপুরে রহস্য রোমাঞ্চের কুহক ছায়ায় মানুষের মনে শঙ্কা শিহরণের ঝড় তোলে।

এক তুখর ব্রিটিশ সাংবাদিকের গোপন দলিল থেকে সংগৃহীত এই আশ্চর্য সত্য কাহিনী পাঠক পাঠিকাকে বিচিত্রতর অনুভূতির জগতে নিয়ে যাবে।

বিলেতের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আমার এ গল্প শুরু। ব্যাপারটা ঘটেছিল মূল লণ্ডন শহরে।

বৃদ্ধ হেনরী রবিনসন লণ্ডন শহরের ৮নং এল্যাণ্ড রোডের বাসিন্দা। তিনি ঐ বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন। বুড়ো তাঁর সাতাশ বছরের একমাত্র পুত্র ফ্রেডারিক ও তিন মেয়ে আর নাতি নিয়ে আছেন।

বড় দুই মেয়ে, লিলা আর কেটি অবিবাহিতা। ছোটটির বিয়ে হবার কিছুদিন পরেই বিধবা হয়। বিধবার একটি ছেলে পিটার। তার বয়স বছর চোদ্দ হবে।

এসব নিয়ে ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধ বেশ সুখেই আছেন। সম্প্রতি তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বিছানা থেকে উঠবার শক্তি হারিয়েছেন।

১৯২৭-এর ২৯শে নভেম্বর।

হঠাৎ ৮নং বাড়িতে শুরু হলো ঝামেলা। মেঘ নেই, গর্জন নেই, প্রবল বর্ষণ হচ্ছে বাড়ির পেছনের কনজারভেটারী বাড়ির ছাদে। সেকি

প্রাকৃতিক বৃষ্টিধারা। দমাদম, ঝমাঝম শব্দে তোলপাড় করে পড়তে লাগলো বড় বড় কয়লার টুকরো, সোডার বোতল, কিছু দস্তার মুদ্রা। এত সজোরে এসে ঐ সব বস্তুগুলো কাঁচের ছাদে আঘাত করছিল যে সেগুলো ভেতরে ঢুকে যেতে লাগলো।

এ আবার কেমন আজব কাণ্ড। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে হেনরী রবিনসন এই বাড়িতে আছেন। কোনদিন কোন কিছু হয় নি। বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই ছিলেন। অথচ আজ—

গোটা পরিবার ভীষণ ভয় পেল।

তারা মনে করলো, কোন বদমাইস লোকের কাজ। তারা পুলিশে খবর দিতেই কিছুক্ষণের মধ্যে এক পুলিশ কনস্টেবল এসে হাজির, মাথায় তার হেলমেট। কনজারভেটরী ছাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে সে অবাক হয়ে গেল। এমন কি জানলাদরজার কাঁচ ভেঙে কিছু নীচে পড়েছে, কিছু আটকে আছে।

কে করতে পারে? কোথা থেকে এলো এইসব বস্তুসামগ্রী? ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে পুলিশ কনস্টেবলটি যখন নাকানি-চোবানি খাচ্ছে উত্তর না খুঁজে পেয়ে তখন আচমকা একটা বড় কয়লার টুকরো তার হেলমেট লক্ষ্য করে ধাঁ করে ছুটে এলো। প্রবল বেগে ধাক্কা খেয়ে হেলমেটটা ছিটকে পড়ে গেল দূরে।

পুলিশ কনস্টেবলটি রেগে আগুন হয়ে গেল। চট করে বাড়ির পাঁচিলের ওপর উঠে চারদিকে নজর দিলো। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। অথচ কয়লা, ঢিল, কাঁচের টুকরো অবিরাম ধারায় পড়তে লাগলো।

আজব ঘটনা!

সেদিন থেকে দিনরাত্রি বাড়ির সামনে পুলিশের পাহারা বসলো।

ডিসেম্বর মাসে বাড়ির কাপড় কাচা ঝি এসে জানালো, চাকরি আর করবে না। তার মুখে রাজ্যের আতঙ্ক জমাট হয়ে আছে। কাপড়ে ধরে আনা একটা শিক দেখিয়ে বললো—এই লাল টকটকে গরম লোহার শিকটা ঠিক আমার সামনে এসে পড়েছে। অথচ কাছাকাছি কোথাও আগুন বা উনুনের নামমাত্র নেই।

এর কদিন পরেই শুরু হলো নতুন ধরনের উৎপাত। বিকট শব্দে জিনিসপত্রগুলো ঝনঝন করে ভেঙে পড়তে লাগলো। (বিনা কারণে কাঁচের জানলাগুলো ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে পড়লো।) এমনকি অলঙ্কারপত্রও তাদের স্থান পরিবর্তন করলো। এদিক ওদিক গড়িয়ে পড়লো। এমন তুর্কী নাচনের দাপটে সবাই অস্থির হয়ে উঠলো।

পক্ষাঘাতের রোগী রবিনসন বিছানায় শুয়ে আছেন ভয়ে তটস্থ হয়ে। এমন সময় তাঁকে চমকে দিয়ে উপর তলার ঘরের আসবাবপত্র নাচতে নাচতে ছিটকে গিয়ে ধাক্কা খেলো। সশব্দে সব ভেঙ্গে গেল। তিনি চীৎকার করে উঠলেন—বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

বাবার চীৎকার শুনে ফ্রেডারিক ছুটে এলো এবং তাঁকে শান্ত করলো। সে লক্ষ্য করলো, জানালা তুটো দমাদম শব্দে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, মনে হয় প্রবল ঝড় তুফানে পাল্লাগুলো আছাড় খাচ্ছে। অথচ বাইরে একটুও হাওয়া নেই।

রাস্তা দিয়ে এক ভদ্রলোককে যেতে দেখে ছেলে ছুটে গেল। বাবাকে উপরতলা থেকে নিচে নামাবার জন্যে তার সাহায্য নিল। তুজনে চ্যাংদোলা করে যখন বুড়োকে ঘর থেকে বের হচ্ছে এমন সময় ঘরের ভেতরের সবচেয়ে পুরনো বহুদিনের ভারী আসবাবটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

সেই সঙ্গে নিচ থেকে কানে ভেসে এলো অন্য একটি ঘরে বিরাটদেহি একটি আসবাব 'প্রাণ' ফিরে পেলো।

ফ্রেডারিক এবার ছুটে গেল বোনকে ডাকতে। হলঘরে ঢুকে লক্ষ্য করে দেখলো. টুপী, ছড়ি রাখার স্ট্যাণ্ডটি নাচতে নাচতে চলেছে।

ফ্রেডারিক ছুটে গিয়ে সেটা তুহাতের মুঠিতে চেপে ধরলো। কিন্তু সেটা তার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে তুখণ্ড হয়ে গেল। ফ্রেডারিক অনুভব করলো, কোন এক অদৃশ্য শক্তি তার হাত থেকে ওটা ছিনিয়ে নিল।

বোন লীলা রবিনসন কাণ্ড কারখানা দেখে বোবা হয়ে গেছে। সব

জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে যে অন্য জায়গায় চলে যাবে সে শক্তি আর বুদ্ধি তার নেই। সম্পূর্ণভাবে চলচ্ছক্তি লোপ পেল তার।

সেই থেকে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন বৃদ্ধ রবিনসন। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। তিনি ঐখানেই মারা গেলেন।

এসব রহস্যময় কাণ্ড কারো অজানা রইলো না। কাগজে কাগজে ছাপা হলো রহস্যময় বাড়ির কথা। পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লো।

এরপর একদিন হ্যারি প্রাইস নামে এক ভদ্রলোক সেখানে এসে হাজির হলো। মানসিক বিচিত্র ঘটনাদির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ এই লোকটি হল জাল জোচ্চুরি মার্কা ভূতের ব্যাপারে বা তুকতাক ওঝাদের যম।

মিঃ প্রাইস গোটা বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখলো। এদিক ওদিক ছড়ানো ছেটানো পড়ে রয়েছে পাথরের নুড়ি, কয়লার টুকরো, আলু, সোডার বোতলের টুকরো ইত্যাদি। জানালা ভাঙা, গোল গোল ফুটো, মনে হয় কে যেন গুলি চালিয়েছে, পাল্লাগুলি ভেঙে পড়েছে।

এছাড়া ৮ নং বাড়ির পাশের বাড়ি দুটোর জানালাগুলি ভেঙে খানখান। পেছনদিকে প্রায় ৮০ গজ দূরে একটা বাড়ি দেখিয়ে মিঃ প্রাইস জানতে চাইল—ঐ বাড়িতে কারা থাকে ?

—ওটা একটা 'প্রাইভেট পাগলা গারদ'। ফ্রেডারিক জানালো। ১৯১৪-১৮ যুদ্ধের গোলাগুলিতে বেশিরভাগই শক পেয়ে পাগল হয়েছে।

এমন সময় একটা কাঠের হ্যাণ্ডেল ওয়ালা লোহার শিক রান্না ঘরের দেয়ালে এসে গেঁথে গেল, আরেকটু হলেই ওদের যে কোন একজনের গায়ে লাগতো। এমন বিকট শব্দ কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম। আসে পাশে সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ করা হলো কিন্তু সব ভোঁ ভাঁ।

ফ্রেডারিকও অসুস্থ হয়ে পড়লো, তার মাথায় গোলমাল দেখা দিতেই হাসপাতালে পাঠানো হলো সুস্থ করার জন্য।

এদিকে বাড়ির ভুতুড়ে কাণ্ড কমা দূরে থাক, ক্রমশ বেড়েই চলেছে। উৎপাত চরমে পৌঁছেছে। কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি যা ইচ্ছা তাই করে চলেছে।

সেদিন সকালে ঐ বাড়িতে মিঃ প্রাইস এসে দেখে ছোট বোন ঠক ঠক করে কাঁপছে। আর একটু হলেই ভিরমি খাবে আর কি?

কোন রকমে খ্যান্ খ্যানে গলায় বললো—সেদিন শনিবার। হল ঘরের চেয়ারগুলি হঠাৎ সারিবদ্ধ হয়ে মার্চ করে চলছে। তিনবার সে ঠিক করে যথাস্থানে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আবার চেয়ারগুলি টেবিলের ওপর উঠে বসে কাপডিস গেলাসগুলো নীচে ফেলে দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

রোববার দিন আরও কয়েকটি ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটলো। চেয়ারের ওপর যে এটাচি কেসটা রাখা ছিল সেটা ধাঁ করে উপর দিকে উঠে গিয়ে একবার চক্রাকারে ঘুরে ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেল। ঘরের এক কোণ থেকে ছাতাটা নাচাতে নাচাতে বেরিয়ে এলো, বাড়ির শেষ প্রান্তে রান্না ঘরের টেবিলের ওপর গিয়ে সে ধরাশায়ী হলো। সেই মুহূর্তে ডাইনিং টেবিলটার যেন ব্যারামে ধরলো, কাঁটা চামচ খাদ্য সামগ্রী সব ফেলে দিয়ে ডাইনিং টেবিল কাত হয়ে শুয়ে পড়লো।

যেসব বস্তুর এরকম দশা হলো, সেগুলো আবার জায়গামত রাখার জন্য চেষ্টা করা হলো। কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। আগের চেয়ে দ্বিগুণ ভারী হয়ে গেছে প্রত্যেকটা।

বিশেষজ্ঞের ধারণা, এসব কুকীর্তি হলো 'গোলমালকারী' ভূতেদের কাণ্ড। এরা মানুষের ক্ষতি করার জন্য সর্বদা থাকে। লোককে জ্বালাতন করে, বিরক্ত করে এরা আনন্দ পায়। সব ছারখার করেই ওরা পায় মজা। এদের জব্দ করা মুশকিল। এদের দৌরাত্ম্যপূর্ণ স্থানে এদের ছোঁয়া প্রতিটি বস্তু অসম্ভব রকম ভারী হয়ে ওঠে।

এসব ঘটনা কিন্তু পিটারের মনে কোন রকম আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারেনি। সে উল্টে মজা পেয়েছে। তার ভয়-টয়ও কম। তার হাব-ভাব দেখে সাংবাদিকরা প্রথমে ভেবেছিল, এ সবের পেছনে ঐ ছেলেটির হাত আছে। কিন্তু তার আতঙ্কগ্রস্ত ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের সন্দেহের মেঘ কেটে গেল। ছেলেটি ঘোরাফেরা করা দূরে থাক, এক-

জায়গায় বসে থাকতেও ভয় পেতো। তাই নিরুপায় হয়ে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হল গ্রামের এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

বিশেষজ্ঞের মতে অনেক সময় এই দুষ্ট প্রকৃতির ভূতেরা কিশোর বয়সী ছেলেদের ওপর ভর করে। তাই সবাই ভাবলো, পিটার বাড়ি ছেড়ে যখন চলে গেছে তখন আবার ফিরে আসবে শান্তি। কিন্তু ভাবনাই সার। কাজে কিছু হল না। ফাঁকা বাড়ি তালাবন্ধ করে প্রায় সপ্তাহ খানেক রেখে দেওয়া হল। ভূত বিশেষজ্ঞা জনৈকা মহিলা মিডিয়ম এল ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত করতে।

বাড়িতে প্রবেশ করেই ভদ্রমহিলা অনুভব করলো অত্যাধিক ঠাণ্ডা। শীতে হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠবে বুঝি। তাই অগত্যা আগুনের চুল্লীর পাশে বসে গরম হতে লাগল।

এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এল ফ্রেডারিক। কনজারভেটারীর কাছে উড়ে উড়ে আসা বেশ কিছু কাগজের টুকরো পাওয়া গেল। এর কারণ ফ্রেডারিকের কাছে জানতে চাওয়ায় সঠিক উত্তর পাওয়া গেল না! ভাই বোন দেরী না করে অন্য বাড়িতে উঠে গেল।

প্রথমে সন্দেহ করা হয়েছিল, দূরের ঐ পাগলা গারদ থেকেই ছুঁড়ে মারে ঢিল, কয়লার টুকরো। কিন্তু ঘরের আসবাবপত্র নাচানো তো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়?

এরপর ফ্রেডারিক জানালো, যেসব কাগজের টুকরো উড়ে এসে পড়তো, ওগুলো আলোর সামনে ধরলে নজরে পড়ে সূক্ষ্ম লেখা ছিল। কিন্তু খালি চোখে দেখা যায় না। সে দেখেছে, লেখা ছিল—আমি ভীষণ অশান্তিতে আছি। শান্তি নেই, এতটুকু বিশ্রাম পাই না। উইলিয়াম দি কংকারার যুগে আমি জন্মেছিলাম। ইতি—টম ব্লাড।

বহু যুগের অস্থির অশান্ত প্রেতাত্মা ভর করেছে।

অলৌকিক কাহিনী
"রিডার্স ডাইজেস্ট"

হিমালয়ের রহস্য সন্ধানে

ভারতের উত্তরতম প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা রহস্য রোমাঞ্চে মাখা চির তুষারাবৃত হিমালয়ের অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে শতাব্দীর আশ্চর্য বীভৎস বিস্ময়। তারই রক্ত জল করা কাহিনী "রিডার্স ডাইজেস্ট"-এর সৌজন্যে শোনান হল।

হিমের আলয়। পৃথিবীরই উদ্ভট ধরনের অপার্থিব আবহাওযাপূর্ণ স্থান। কুয়াশার মধ্যে ভেসে চলেছে আবছা···অদ্ভুত···অস্বাভাবিক সব আকৃতি। বরফ পড়েছে বিরাট···বিশাল·· অসনাক্ত পদচিহ্ন···তার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর কোথাও না শোনা বিচিত্র আওয়াজ...বাতাসে ভর করে ভেসে বেড়াচ্ছে অনির্বচনীয় হাল্কা বস্তুরাশি। ভারতের উত্তর দিককেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই কাহিনী, নাম যার হিমালয়।

প্রায় ছেচল্লিশ বছর আগে এই রহস্যাবৃত বিস্ময়কর তথা ভয়ঙ্কর স্থানটি অর্থাৎ এরই একটি পর্বতের চূড়ার কথা আবিষ্কৃত হয়।

ঐ দেশের কুসংস্কারে বিশ্বাসী মানুষদের কাছে বরফে-ঢাকা অঞ্চলের অভাবনীয় কথা কাহিনী অজ্ঞাত ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন অভিজাত দেশের লোকদের মুখে প্রথম শোনা যায়।

যত সব অলৌকিক ঘটনা ঘটে এই রাজ্যে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে হিমালয়ের চূড়া মাউন্ট এভারেষ্টে ওঠার চেষ্টা করেছে মানুষ। কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত সক্ষম হয়নি। যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাদের বারবার বাধা দিচ্ছে। কেউ প্রাণ হারিয়েছে, কারো হাত-পা ভেঙেছে,

ক্ষীণ-দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে। বিজ্ঞানের যতরকম সাহায্য ছিল, সব প্রয়োগ করেও লাভ হয়নি। বার বার মানুষ উঠেছে ২৭০০০ ফিটেরও বেশী। ১৯৫২-তে সুইস অভিযাত্রী দল চূড়া থেকে মাত্র ৭৮৭ ফিট দূরে ২৮২১৫ পর্যন্ত উঠেছিল। কিন্তু শেষের কয়েকশো ফিট বুঝি সাংঘাতিক অগম্য, দুরতিক্রম্য স্থান।

এভারেষ্টের ওপর তিব্বতীদের ভীষণ আস্থা, শ্রদ্ধার চোখে দেখে। 'ঈশ্বরের সিংহাসন' নামে সেটি তাদের কাছে পরিচিত। তাদের ধারণা ঐ শীর্ষস্থল হল এমন সব আত্মা বা প্রেতাত্মাদের আবাসস্থল যারা ওখানে অনধিকার প্রবেশকারীদের কখনই সহ্য করে না। সর্বদাই নির্দয় ভাবে তাড়িয়ে দেয়।

এই মতকে ইউরোপীয় অভিযাত্রীদল অগ্রাহ্য করতে পারে না। যারা যারা ঐ বিশ্ব-চূড়ায় আরোহণ করেছে, তারা ফিরে এসে যেসব অবিশ্বাস্য কাহিনী বলেছে, সেগুলোকে অতি সহজেই অলৌকিক বলে স্বীকার করতে হয়।

কারো মুখে শোনা গেছে, শীর্ষের শেষ মাথায় বসে অনুভব করেছে "কোন এক অজ্ঞাত শক্তি।"

আবার কেউ কেউ স্বীকার করেছে, "অদ্ভুত ভয়াবহ সব ছায়ারা তাদের একভাবে তাড়িত করেছে, তাদের ভয় দেখিয়েছে। বিদ্রূপের হাসি হেসেছে। এক কথায় বলা যায়, এই সব অব্যক্ত প্রচ্ছন্ন শক্তি-দের কাছ থেকে প্রবল বাধা এসেছে।

প্রচ্ছন্ন শক্তি? কাদের শক্তি? প্রেতাত্মাদের? উত্তর মিলবে কার কাছ থেকে?

একটা উদাহরণের সাহায্যে দেখা যাক্, উত্তর পাওয়া যায় কি না।

১৯২২ সালে হিমালয় অভিযানে প্রথম মৃতব্যক্তি হলেন ডাঃ আলেক-জেণ্ডার কেলাস।

ডাগড়াই চেহরার সুস্থ সবল জোয়ান মানুষ। পাকা অভিযাত্রী। অভিযানে বেরোবার আগে বহু মাসের কঠোর অনুশীলন। পাহাড়ে আরোহণ করা কালীন তাঁরই উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তাঁর সঙ্গীরা ক্লান্তি

ও বিপদ অগ্রাহ্য করে দুরূহ পর্বতারোহণ করেছে। কিন্তু বিশ্ব-ছাদের কাছাকাছি এসে ঘটলো বিপদ। কোথাও কিছু নেই, ডাক্তার এক অজ্ঞাত রোগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং দেখতে না দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যান।

১৯২৪ সালে ম্যালোরী ও ২২ বছর বয়সের তরুণ আরভিন স্বচ্ছ পরিষ্কার মন ও তাজা শক্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পর্বত অভিযানে। শেষ ২০০০ ফিট আরোহণ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্যে। আকাশ তখন মেঘ-মুক্ত। পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া। সমস্ত বাধা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে তুষার আবৃত এভারেস্টের চূড়ায়। হঠাৎ তাদের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল একটা কুয়াশার প্রলেপ। কুয়াশা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেল পৃথিবী থেকে।

এ ঘটনার আগে তালিম দিয়ে যাবার আগে অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ওরা জানিয়ে দিল যে, 'সর্বদা কোন এক অশুভ শক্তি তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পেছন দিক থেকে আকর্ষন করছে। সে এক গা শির শির করা এক বিশ্রী অনুভূতি।

১৯৩৩-এ ফ্র্যাঙ্ক নিচনি স্মিদ ও এরিখ সিপটন ২৭০০০ ফিট উঁচুতে তাঁবু খাটায়। সেখান থেকে পর্বত শীর্ষে আরোহণ করার জন্য বেরিয়ে পড়ে। তারা একটানা ৫০০ ফুট বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে উঠে যায়। কিন্তু এক দুরারোহ বাধা এড়াতে গিয়ে সিপটন ভীষণ ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফলে স্মিদ একাই রওনা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারলো না। একটি একক অদ্ভুত মূর্তি তাকে হঠাৎ বাধা দেয়।

তবুও পা বাড়ালো সে। কিন্তু হাঁটা আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে থমকে দাঁড়ালো। ওপর দিকে চোখ পড়তেই আচম্বিতে নজর পড়লো দুটি কালো ছায়ার ওপর। বিস্ময়ে ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত হলো। আকাশের পটভূমিকায় দুটি গভীর কালো মূর্তি দাঁড়িয়ে। অনেকটা ঘুড়ি বেলুনের মত দেখতে—খুব ছোট্ট দুটি কালো কুচকুচে ডানা রয়েছে। তার একটির অন্যটির চেয়ে লম্বা চোখ, ঠিক যেন কেটলীর নল।

স্মিদ সচকিত হয়ে লক্ষ্য করলো, অদ্ভুত মূর্তি দুটির বিচিত্র ভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। হয়তো কোন বীভৎস আকৃতির জীব। প্রথমেই স্মিদ অনুভব করলো, সে ভীষণ ক্লান্ত...তার ওপর অসহ্য ঠাণ্ডা ...অক্সিজেন ক্রমশঃ কমে আসছে...হয়তো বা সাংঘাতিক তুষার ঝঞ্ঝায় ঘাবড়ে গিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছে। তাই নিজেকে স্বাভাবিক রাখার জন্য মূর্তিদুটোর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের স্পন্দনের সঙ্গে নিজেরটা মিলিয়ে দেখলো। না, তার তো স্বাভাবিক আছে। গ্লেসিয়ারগুলোর নামও তার স্পষ্ট মনে পড়ছে...চো-অয়ু...গিয়াচুঙ...কাঙ...পুমরি এবং রংবাক——

মূর্তি দুটো তখন শূন্যে ভর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। এভারেস্ট শীর্ষ থেকে তাদের মধ্যে কয়েক ফুটের দূরত্ব। হঠাৎ স্মিদকে অবাক করে দিয়ে পৃথিবী ঢেকে গেল গাঢ় কুয়াশায়, এতটুকু ফাঁক রইলো না কোথাও। অতএব এবার তাকে পেছু হাঁটতে হবেই। বুঝলো কোন মানবিক বা প্রাকৃতিক বাধা নয়। কোন প্রেতাত্মার অলৌকিক শক্তি। এ বাধাকে অগ্রাহ্য করা কল্পনাতীত !

এরপর বিরাট শক্তিশালী এক অভিযাত্রীদল এভারেস্ট জয়ের আশা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে বিপদ সংকুল পথে। কিন্তু, হায় তাদের ভাগ্যের পরিহাস। অভাবনীয় দুর্বিপাকে নাজেহাল হয়ে চূড়ান্ত হতাশার মধ্যে উক্ত অভিযাত্রীদলটি নেমে আসে।

১৮৫১ সালে এরিখ সিপটনের নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষক দল বেরিয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য, এভারেস্টের চূড়ায় যাবার সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কার। শেষ পর্যন্ত অনেক দরকারী সংবাদ-তথ্য ও কতকগুলো ফটো নিয়ে ফিরে আসে ইংলণ্ডে। সেই ফটোগ্রাফগুলি দেখে বিশ্বের মানুষ চমকে উঠলো।

'দি টাইমস' পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয় সেই ছবি। দেখা গেল রংবুক গ্লেসিয়ারের শুভ্র নরম বরফের ওপর আঁকা রয়েছে কতক-গুলো অজ্ঞাত প্রাণীর পায়ের ছাপ। কিন্তু ঐ গ্লেসিয়ারে বা ধারে কাছে তেমন ধরনের কোন জীবিত প্রাণী বাস করে না। তবে এই পায়ের ছাপ এলো কোথা থেকে ? কাদের এই রহস্যপূর্ণ পায়ের দাগ ?

জীবতত্ত্ববিদরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালো ফটোগুলো নিয়ে। কিন্তু কোন প্রাণীর পায়ের ছাপ, তার হদিশ মিললো না। তবে স্পষ্ট বোঝা গেল, এগুলো মৃত প্রাণীর পদচিহ্ন। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হল, নেপালী ও তিব্বতীয় উপকথায় যে সব ভয়ঙ্কর প্রাণীরা ঐ চিরতুষার অঞ্চলে বসবাস করে বলে ওদের বিশ্বাস। সরাসরি বলা যায়, সেই বিভীষিকাময় মানুষের পায়ের ছাপ। যাকে ওরা বলে 'ইয়েতি'।

তবে হিমালয়ের সর্বাধিক রহস্যময় ও সাঙ্ঘাতিক কাহিনী বুঝি সেই 'নামহীন আরোহীর' কাহিনী।

দ্বিতীয় দশকের শেষেব দিকে বিলেতের কোন এক শহরে বাস করতো আরোহী। এভারেস্ট তাকে আকর্ষণ করে। তাই সে ভাল চাকরি এবং ঘর সংসার ছেড়ে ভারতে চলে আসে।

পর্বতে চড়ায় তার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, এই প্রথম। তার ওপর অনুশীলন প্রাপ্তও নয়। আবার কপর্দকহীন। তবু কোন এক অজানা টানে সে বেরিয়ে পড়লো, সর্বদা তার কানে কানে কে যেন বলতো এভারেস্ট যাওয়ার জন্য। এই বলে তাকে তাড়া দিতো যে তার উপযুক্ত স্থান হল ঐ 'ঈশ্বরের সিংহাসন'।

সরকারী ছাড়পত্র তার কাছে ছিল না। তাই তিব্বতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাধা পেলো। কিন্তু সে ঘাবড়ালো না, বা নিরাশ হলো না। পরে ভারতীয় বণিকের ছদ্মবেশে নেপালের মধ্যে দিয়ে সেই অভিশপ্ত দেশে গিয়ে হাজির হল।

কাটমাণ্ডু অতিক্রম করার সময় তরুণ ইংরেজ অফিসারের হাতে একটি চিঠি লিখে রেখে সবিনয়ে জানায়—আমি দুমাসের মধ্যে যদি এখানে না ফিরে আসি, তাহলে যেন এই চিঠিটা খোলা হয়।

একাকী সহায় সম্বলহীন যাত্রীটি পর্বতের দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। তার পত্রটি খোলা হয়। প্রকাশ পায় তার জাতীয়তা ও মূঢ় অভিযানের বাসনা। চিঠিতে সবিস্তারে সবই লেখা ছিল, কিন্তু আরোহীর নাম ও পরিচয় ছিল অজ্ঞাত। সে তার বন্ধু-বান্ধব ও পরিজন বর্গকে ঝামেলায় ফেলতে চায়নি।

আজও এই সম্বলহীন অভিযাত্রীর নাম জানা যায়নি।

তবে এরপরে আরও অনেক দল পর্বত আরোহণ করেছে। তাদের একজনের কাছ থেকে জানা যায় 'মিত্রভূতের' কথা। ঐ অদৃশ্য ছায়া-মূর্তি নাকি তাদের পদে পদে সাহায্য করেছে। রংবুক গ্লেসিয়ার অতিক্রম করার পর থেকে প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তিতে সে পাশে পাশে থেকেছে। এমন কি, অদ্ভুত যে সব মূর্তি এভারেস্ট শৃঙ্গ পাহারা দিচ্ছে বলে বিশ্বাস তাদের অশুভ আক্রোশ থেকেও রক্ষা করেছে।

তবে ফ্রাঙ্ক সিডনি স্মিদের বিবরণ দারুণ লোমহর্ষক।

১৯৩৩ সালে, যখন সে একা পর্বতশীর্ষে উঠে যাচ্ছিল, তখন সে অনুভব করেছিল···কে একজন তাকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অনুসরণ করে চলেছে···এই অদৃশ্য শক্তি তার কোন ক্ষতি করেনি, বরং সাহায্যই করেছে। অশুভ শক্তি সর্বক্ষণ পাশে পাশে থাকায় স্মিদ কখনও সঙ্গীহীন অনুভব করেনি। এই অনুভূতি এত প্রবল ছিল যে, স্মিদ নিজে জানিয়েছে, সে যখন নিজের খাবার জন্য একটি বের করতো, অমনি অভ্যাসমত সেটিকে দুভাগ করে পাশে থাকা অদৃশ্য এক সঙ্গীকে দেবার জন্য হাত বাড়াতো।

এসব কাহিনী সত্ত্বেও 'নামহীন আরোহীর' কথা নেহাতই মনগড়া গল্প বলেই ধরে নেওয়া হতো যদি না ১৯৩৫-এ এরিখ সিপটন সেই তোলপাড় করা আবিষ্কারটি করতো।

রংবুক গ্লেসিয়ারের অঞ্চলে পর্যবেক্ষণের সময় তার দলের লোকেরা—জনৈক নিঃসঙ্গ ইউরোপীয়ান পর্যটকের পোশাক পরিচ্ছদের টুকরো এবং অন্যান্য অবশিষ্টাংশও নজরে পড়ে। খবরে প্রচারিত হয় নি, ঐ অঞ্চলে কোন 'সরকারী' পর্বতারোহী নিখোঁজ হয়েছে। তবে সেই দুঃসাহসী অপেশাদার 'যুবক শ্বেতাঙ্গ অভিযাত্রীর' কথা সংবাদে জানা যায়।

দেবতাত্মা হিমালয়। বার বার মানুষ ছুটে গেছে এভারেস্ট চূড়ায় আরোহণের আশায়। আর বার বারই বিফল হয়ে ফিরে এসেছে। বয়ে এনেছে অদ্ভুত বিস্ময়কর রহস্যময় সব ঘটনার অভিজ্ঞতা। সে সবই

অবিশ্বাস্য, অলৌকিক।

বহু বাধার পর হিমালয়ের বুঝি করুণা হয়েছে। দয়া করে তুলে নিয়েছে বাধা।

তাই তো সর্বপ্রথম এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করে টাইগার তেনজিং আর স্যার এডমণ্ড হিলারী।

কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন রয়ে গেল, যেসব উড়ন্ত ছায়ামূর্তি এভারেস্ট শীর্ষে দেখা গেছে, তারা কারা? রংবুক গ্লেসিয়ারে নরম তুষারের বুকে অজ্ঞাত প্রাণীর যেসব পদচিহ্ন সেগুলো করে? কে সে? তুষার মানব। অর্থাৎ তুষারে তৈরী যে মানব। না মোটেও তা নয়। তুষারে বাস করে যে, সে হল তুষার মানব। কিন্তু অত উঁচুতে বরফে ঢাকা জায়গায় কি ভাবে সম্ভব জীবিত মানুষের বাস করা? কেননা, সেখানে সে কি খেয়ে বাঁচবে? আর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেবে কিসে?

অতএব…সবই রহস্য…সবই অবিশ্বাস্য…অলৌকিক…ভুতুড়ে কাণ্ড আজও সেসব রহস্য মানুষের কাছে অজ্ঞাত।

এমন অলৌকিক কাহিনী আর কোন পর্বতকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। দেবতাত্মা হিমালয়ের অসীম রহস্যের জাল আজও ভেদ করা যায় নি।

অলৌকিক কাহিনী
"রিডার্স ডাইজেস্ট"
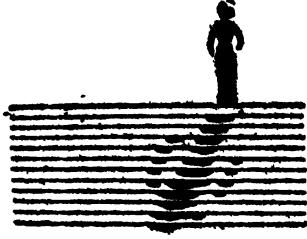
মধ্যরাতের বিভীষিকা

মধ্যরাতে যখন সমস্ত পৃথিবী নিদ্রায় মগ্ন থাকে তখন প্রেতাত্মার রাজত্বে শুরু হয় ভয় বিহ্বল নিশি অভিসার। ইউরোপ মহাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ আধুনিক দেশ অষ্ট্রিয়াতে একবার নিশি ডাকা প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটেছিল। সেই লোমহর্ষক কাহিনী এখানে বিবৃত হল।

অষ্ট্রিয়ার কোন এক গ্রামকে কেন্দ্র করে আজকের এই রোমহর্ষক কাহিনীর সূত্রপাত।

ঘটনাটি ঘটে আনুমানিক আড়াই শত বছর আগে। ফরাসী ও তুরস্কের সঙ্গে একনাগাড়ে চলছিল যুদ্ধ দাঙ্গা হাঙ্গামা। সম্প্রতি সেসব মিটে গিয়ে দেশে ফিরে এসেছে সাময়িক শান্তি।

সেই সময় গ্রামে গ্রামে এক-আধ জন করে মিলিটারী পোস্টেড হতো। তারা সেই সেই গ্রামের কোন গৃহস্থ বাড়িতে অতিথি হিসেবে বাস করতো।

অষ্ট্রিয়ার হাঙ্গেরী সীমান্তের হাইডাম গ্রামে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পোস্টেড হয়েছিল একজন তরুণ সৈনিক।

সে এক কৃষক পরিবারে পেয়িং গেস্ট হিসেবে সম্মান লাভ করে এবং দিনে দিনে সে তাদের ঘরের ছেলের মত হয়ে গিয়েছিল।

তখন গ্রীষ্মকাল।

রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে তরুণ সৈনিকটি এবং বাড়ির কর্তা রাস্তার ধারে খাবার ঘরে টেবিলে বসে গল্প গুজব করছিল, টেবিলের ওপর দুকাপ কফি। মেয়েরা বাড়ির ভেতরে বাসন পত্র মাজতে ব্যস্ত। চৌদ্দ বছরের কিশোর ছেলে তার বাবার পাশে বসে। বাইরের দরজার দিকে পেছন ফিরে বসেছিল সৈনিক এবং কিশোরটি।

অসম্ভব চাপা গরম। সারাদিন গরমে হাসফাস করতে হয়েছে। সন্ধ্যের পর হাওয়া গায়ে ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছে মিষ্টি পরশ। তাই রাস্তার দিকের দরজাটা হাট করে খোলা।

কর্তামশায় তার অতীত জীবনের মধুর ঘটনাগুলি রোমন্থন করছিল। হাসি গল্প বেশ জমে উঠেছিল। কাপের কফি শেষ হতেই আবার পট থেকে ঢেলে নেওয়া হচ্ছিল।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ কর্তা চুপ করে গেল। তরুণ সৈনিক তার দিকে তাকালো, থমথমে মুখে জমাট বাঁধা ভয়, খোলা দরজার দিকে তার দৃষ্টি আবদ্ধ। ততক্ষণে ডাইনিং টেবিলের ওপর দেখা গেল একটি লম্বা ছায়া মূর্তি। কিশোরটি মুখ ফিরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের মধ্যে তারও মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

তরুণটিও পেছন ফিরে ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকালো বলা বাহুল্য। ইতিমধ্যে ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে মূর্তিটি এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। এবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো মূর্তির আসল রূপ। বৃদ্ধের বলিরেখা কুঞ্চিত মুখাবয়ব। একমাথা অপরিপাটি সাদা ধবধবে চুল। জলভরা দুটি চোখে অর্থহীন দৃষ্টি। বৃদ্ধ এক সময় শীর্ণ বিবর্ণ হাত তুলে দেশীয় কায়দায় অভিবাদন জানালো।

কর্তা মশায় আর কিশোর ছেলেটি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আগন্তুক বৃদ্ধের দিকে। মোহমুগ্ধ আচ্ছন্নের মত বসে।

কি ব্যাপার—সৈনিক ভেবে কুল কিনারা পেলোনা। কি এমন ব্যাপার রয়েছে যার জন্যে পিতা পুত্রের আতঙ্কিত হবার কারণ রয়েছে।

বৃদ্ধ এবার শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এলো টেবিলের সামনে, টুক করে বসে পড়লো একটি চেয়ারে। কর্তার ভয়চকিত আচ্ছন্ন চোখের

কোন ভাবান্তর নেই। সাঙ্ঘাতিক ভয় পাওয়া মুখ। মনে হয় নিদারুণ বিস্ময় ফুটে উঠেছে মুখ…নাকি অসহ্য কোন দুঃখ বা শোক? চারজন নীরব, বোবার মত বসে আছে।বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। মাঝে মাঝে কানে ভেসে এলো ভেতর থেকে মেয়েদের বিভিন্ন কথা-বার্তার আওয়াজ, হাসির শব্দ। বাইরে রাত্রির নিঃসীম অন্ধকার। একটা নিশাচর পাখী ডাকতে ডাকতে আকাশের এদিক থেকে অন্যদিকে উড়ে গেল। দূর থেকে ভেসে এলো কুকুরের চীৎকার। রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি হুস করে চলে গেল। ঘরের চারটি প্রাণী তখনো মূক হয়ে বসে আছে। কেউ নড়তেও পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না। একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ। একসময় সৈনিকটি একটি কাপে কফি ঢেলে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিল। মৃদু হেসে বললো—একটু কফি পান করুন স্যার। বৃদ্ধ সে কথায় কর্ণপাতও করলো না। আরও এক মিনিট কেটে গেল। হঠাৎ বৃদ্ধ তার রোগা বিবর্ণ একটি হাত তুলে রাখলো কর্তার কাঁধে। এতক্ষণে কর্তা যেন তার নিষ্প্রাণ দেহে ফিরে পেল প্রাণের স্পন্দন। নাক কুঁচকে উঠলো। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো একটি অস্ফুট বিচিত্র আর্তনাদ, সেই সঙ্গে হৃদয় বিদারক দীর্ঘশ্বাস। পরক্ষণেই বৃদ্ধ চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেল খোলা দরজার দিকে। যেমন ধীরপায়ে অন্ধকার ভেদ করে এসেছিল, তেমনি ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল। কর্তার দুচোখ বেয়ে নেমে এসেছে অশ্রুধারা। সৈনিক তরুণ আর কৌতূহল চাপতে পারে না। প্রবল উত্তেজনা সহকারে বলে ওঠে—কি হলো স্যার? আমি তো আগামাথা কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কে? আর আপনারাই বা অমন হতবাক হয়ে গেলেন? কর্তা নিরুত্তর। কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর মাতালের মত টলমলে পা ফেলে ওপরে তার শোবার ঘরের দিকে চলে গেল। কিশোর সেদিকে একপলক তাকিয়ে বিকট চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে রান্নাঘরের দিকে ছুটে চলে গেল। হতভম্ব সৈনিকের কানে ভেসে এলো কিশোরের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, ভাসা ভাসা কথাতে শোনা গেল। তারপরেই বাসন পড়ে যাওয়ার প্রচণ্ড শব্দ ও মেয়েদের কান্না মাখা আর্ত চীৎকার। ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত মেয়েরা এ ঘরের মধ্যে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। মেয়েদের কান্না জড়িত কথা ভেসে এলো বিহ্বল তরুণ সৈনিকের কানে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠলো সৈনিক। তারপরেই মনে পড়লো, না, এসব পরিবারিক ব্যাপারে মাথা গলিয়ে কাজ নেই। হাজার হলেও সে বাইরের লোক। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াবার জন্য সৈনিকটি বেরিয়ে এলো বাইরে। কোন কফি খানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো। গভীর রাতে সে ফিরে এলো। নিস্তব্ধ ও অন্ধকার বাড়ি। সম্ভবতঃ সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। আচমকা মেয়েদের আকুল কান্নার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে সে বিছানায় উঠে বসলো। ত্রস্তপদে বেরিয়ে এলো বাইরে। দেখলো হাতে সাদা ফুলের মালা আর তোড়া নিয়ে কর্তার কিশোর ছেলে বাড়ি ঢুকে সিঁড়ির দিকে যাছে। —এসব কেন? কি…কি হয়েছে? সৈনিকের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল। —আমার বাবা, কান্নায় বন্ধ হয়ে এলো কিশোরের কণ্ঠস্বর, মারা গেছেন।—কে—কে মারা গেছে বললে? আকাশ থেকে যেন পড়লো সৈনিকটি। কর্তা মারা গেছেন? কি করে তা সম্ভব? রোগ-ব্যাধি কিছু নেই, সুস্থ সবল সুন্দর স্বাস্থ্য……গত রাত্রেও তাকে সুস্থ… অথচ অথচ……হঠাৎ তার চিন্তাধারা থমকে দাঁড়ালো। মনে পড়ে গেল গত রাতে সেই রহস্যপূর্ণ ঘটনার কথা। —তাহলে ঐ বুড়ো লোকটার ব্যাপার কি? মানে…তার জন্য কি…বুড়ো ভদ্রলোকই বা কে? কিশোর একটু ইতস্ততঃ করলো, মনে হয় বলবে কি বলবে না ভাবছে। চোখদুটো ছলছল করছে। কান্না রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—ঐ বুড়ো ভদ্রলোকটি হল আমার বাবার বাবা, আমার ঠাকুরদা। —তাই নাকি…তা হয়েছে কি? এর পরের ঘটনা যা শুনলো তাতে তরুণ সৈনিকের বাক্‌শক্তি রহিত হলো বিস্ময়ে। অপার্থিব ঠাণ্ডা গলায় কিশোর উত্তর দিলো, দশ বছর আগের কথা আমার ঠাকুরদা মারা গেছেন এবং যথারীতি কবর দেওয়া হলো… ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঝড়ের থেকে দ্রুতগতিতে গ্রামে এবং আসে-পাশের অন্যান্য গাঁয়ে এ সংবাদ—মৃত বুড়ো নাকি পুত্রকে কবরে নিয়ে যাবার জন্যে ডাকতে এসেছিল। এমন ঘটনা শুনলে গায়ের লোমগুলো খাড়া হচ্ছে

ওঠে। এ খবরে সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য দেশের মিলিটারী শাসনকর্তা অফিসারপাঠালেন ঐ গ্রামে। সামরিক বিভাগের ডাক্তারও এল। গীর্জার সামনের চত্বরে তাঁবু খাটানো হলো। ঐ তরুণ সৈনিকের কাছে সবিস্তারে জানলো তারা। ঐ বাড়ি মেয়েদেরও জেরা করা হলো। সবশুনে অফিসাররা থ' হয়ে গেল। কি যে করবে, বুঝে উঠতে পারলো না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে বসলো—এ কি বিশ্বাসযোগ্য কথা, স্রেফ বানানো। কবর থেকে উক্ত বৃদ্ধের মৃতদেহ খুঁড়ে বের করার আদেশ দিল উপরওয়ালা। সেদিন কবরখানায় উদগ্রীব জনতার ভিড। সকলের সামনে মাটি খুঁড়ে কফিন তোলা হল এবং খোলা হল। সামরিক ডাক্তার নিচু হয়ে শব পরীক্ষা করতে গিয়ে বিস্ময়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠলো।

তাজ্জব ব্যাপার। এও কি সম্ভব। দশ বছর আগে সমাহিত করা বৃদ্ধের মৃতদেহ দেখে মনে হয়: মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে কবরস্ত করা হয়েছে।

এসব খবর কখনো এক জায়গায় থাকে না। এতএব কানাকানি হতে হতে ভিড় বেড়ে গেল চারগুণ। সামরিক ডাক্তার ছুরি দিয়ে মৃতের বাহুর ধমনী কেটে দিল। ক্ষত স্থান থেকে বেরিয়ে এলো টাটকা তাজা লাল রক্ত। —আজগুবি। অবিশ্বাস্য। অ্যাবসার্ড, চিৎকার করে ওঠে সামরিক ডাক্তার। মৃত লোক, তার ওপর এক আধদিনের মরা নয়, দশ বছর আগে মারা গেছে। তবু যেন জীবন্ত....তাহলে কি...নিশ্চয়ই এটা ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেছে। অতএব ভ্যাম্পায়ারের মতোই বৃদ্ধের শবদেহকে সৎকার করা হল। ভ্যাম্পায়ার বিশ্বাসী তদন্তকারী লোকেরা রাজী হল। যে কোন কারণে বৃদ্ধের মৃতদেহ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এবার সৎকার করতে হবে এমনভাবে যে এমন ভয়াবহ ভয়ঙ্কর ঘটনা আবার না ঘটে।

মৃতদেহের বুকে একটা কাষ্ঠ শলাকা গুঁজে দিয়ে মুণ্ড কেটে ফেলা হল। তারপর আবার সেই শবদেহ কফিনে পুরে কবর দেওয়া হল। এখানেই ঘটনার শেষ নয়। সেই গ্রামে এরপর আরো এমন ঘটনা ঘটলো।

এমনকি দিনের বেলায় গাঁয়ের সমস্ত বাড়িঘরের দরজা জানলা বন্ধ থাকতো। রাস্তাঘাটে জনমনিষ্যির গন্ধ নেই। ঘরে বসেও সবাই ভয়ে কাঁপছে। চতুর্দিকে খালি ভয়ঙ্কর মৃত্যু ত্রাসের কাহিনী। জীবন্ত দুঃস্বপ্ন

গাঁয়ের বিভিন্ন পরিবারবর্গকে পাগল করে ফেলেছে। বেশীর ভাগ লোক গ্রাম ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

মৃত ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে তার আত্মীয়-স্বজনদের দেখা দিচ্ছে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই 'দর্শক' মানুষটি অচিরে মারা যাচ্ছে।

মৃতদেহের মিছিলে বুঝি অভিশপ্ত এই হাইডাম গ্রাম আক্রান্ত হয়েছে।

প্রতি সন্ধ্যায় শুরু হয়ে যায় মৃতদের উৎপাত। কবরখানা শূন্য করে সব উঠে আসে। সারা রাত ধরে চলে তাদের তাণ্ডব নৃত্য। রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সুযোগ পেলেই নিজের নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়ছে।

দরজা জানলা বন্ধ থাকায় তাদের অভিযান পূর্ণ হয় না অর্থাৎ ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। তারা ধরলো নতুন ফন্দি। বাড়ির বাইরে থেকে বিকট ভয়ঙ্কর চিৎকার করে তাদের প্রিয়জনের অথবা আত্মীয়-স্বজনের নাম ধরে ডাকছে। তাদেরকেও কবরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা সচেষ্ট।

এই ভাবে নিশি ডেকে এ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তিদের কবলে পড়েছে একুশ-জন মানুষ। একে একে সবাই স্থান করে নিয়েছে কবরের অন্ধ গহ্বরে।

যে সব লোকেরা 'নিশি ডাকে' আকৃষ্ট হয়ে প্রাণ দিয়েছে তাদের একটি নামের তালিকা তৈরী করলো তদন্তকারী অফিসাররা। তারপর সেই সব কফিন গুলো তুলে পরীক্ষা করার নির্দেশ দিল।

আশ্চর্য। প্রতিটি শবদেহ টাটকা তাজা, ঠিক প্রথমোক্ত বৃদ্ধের দেহের মত তাদের ধমনীতে টাটকা লাল রক্তের প্রবাহ। ভ্যাম্পায়ার! সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাম্পায়ার সৎকার করা হলো। প্রত্যেকটি শবের বুকে কাষ্ঠ শলাকা গেঁথে দিয়ে মুণ্ড কেটে নেওয়া হল। তারপর আবার সমাহিত করা হল।

সেদিন সন্ধ্যা নামার আগেই সবাই দরজা জানালা বন্ধ করে ভয়ে কুঁকড়ে বসে রইলো। চোখে মুখে তাদের ত্রাস। কিন্তু সেদিন আর কোন মৃত এলো না। মৃতদের মিছিল বুঝি ভঙ্গ হয়েছে।

অষ্ট্রিয়ার সেই গ্রামে আবার ফিরে এলো সুখ-শান্তি, ফিরে এলো লোকের চোখে ঘুম।

—* শেষ *—